প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

কর্কটক্রান্তি

মূলঃ হেনরি মিলার

ভাষান্তরঃ আবু কায়সার



প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

কর্কটক্রান্তি

মূলঃ হেনরি মিলার

প্যারিস। আলোর উৎসবে চারিদিক ঝলমলে। শ্যাম্পেন, সিগার আর আনন্দে রমরমা এর দিন আর রাত। অবিশ্রাম চলছে গান আর নাচের আসর এবং নারী-পুরুষের অবাধ উদ্দাম মেলামেশা। শুভম কিন্তু এরই ভেতরে জেগে উঠেছে আরেক অন্ধকারের জগত। যেখানে অসংখ্য উদ্যত নখের সামনে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে যন্ত্রণাকাতর নিরিহ ইহুদীরা। বিকৃত আর স্বাভাবিক যৌনতার পেছনে ছুটছে মানুষ। শয্যায় দেহ-ব্যবসায়িনীরা করছে অদ্ভুত আচরণ।

আরেক প্যারিস এটা। আর এখানেই বিচিত্র জীবন যাপন করছে এক যুবক। সে চাপা পড়ে গেছে পাশ্চাত্যের জাকজমকপূর্ণ ভোগবাদী সভ্যতার তলায়। আশ্চর্য এক বিদ্রোহী সে—অপরের টাকায় খাচ্ছে বিলাসবহুল হোটেলে, অন্য মেয়েকে নিয়ে ফূর্তি করছে স্ত্রীর টাকায়, অবিরাম গালি দিয়ে চলেছে নিজেকে এবং চারপাশের সবাইকে।

ফিরে আসার আর কোনো পথ নেই ওর।

তারাশঙ্কর ভার কারসার

বিশ টাকা



অধুনা

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

কর্কটক্রান্তি

হেনরী মিলার



প্রকাশকাল :
নভেম্বর ১৯৮৬

অনুবাদস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক :
অধুনা প্রকাশনের পক্ষে
ফরিদ আহমেদ
২০ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর ঢাকা—৫

মুদ্রণ :
সুরমা আর্ট প্রেস
আজিমপুর, ঢাকা—৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
হামিদুল ইসলাম

দাম :
২০ টাকা

পরিবেশক :

কারেন্ট নিউজ, ঢাকা কলেজ গেট, ঢাকা। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিশার্স, বিদ্যাপ্রকাশ, অনিন্দ্য প্রকাশন বাংলাবাজার ঢাকা।

এ-ছাড়াও দেশের সর্বত্র লাইব্রেরী, ম্যাগাজিন কর্নার ও বুকস্টল-সমূহে পাওয়া যায়।

নিবেদন

জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবিস্কার করেছেন হেনরী মিলার। জন্ম তার ব্রুকলিনে—১৮৯০ সনে। যদিও তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আমেরিকায়, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্মানের। টেলি-গ্রাফ কোম্পানিতে চাকরী করতেন তিনি। পার্সোনাল-ম্যানেজারের মতো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু এসব ছেড়ে তিনি লেখক হওয়ার জন্যে প্যারিস চলে আসেন মাত্র দশ ডলার পকেটে নিয়ে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' বেরুনোর সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বৃটেন-সহ আরো বেশ কিছু দেশে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয় না। দিনের পর তিনি অনাহারে কাটান।

ইউরোপ আর আমেরিকার আত্মাকে তাঁর মতো কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। কদর্যতা, নোংরামী, পচনশীলতাসহ বর্তমান পাশ্চাত্যজগত অবিকল উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। এ-জন্যে তিনি ব্যবহার করেছেন অশালীন শব্দ—ভঙ্গি নিয়েছেন আত্মজীবনীমূলক রচনার। কেননা আলাদা অনন্য কিছু হিশেবে নিজেকে তিনি দেখাতে চাননি। তাঁর রচনা-রীতিতে জেমস জয়েসের 'চেতনা-স্রোত' বা 'স্ট্রীম অব কনশাসনেস' এবং স্যুররিয়ালিস্টদের কৌশল আবিষ্কার করেছেন সমালোচকরা।

মিলার প্রকৃতপক্ষে কবি—শব্দ-মাতাল। র‍্যাঁবোঁর ওপর 'দ্য

টাইম অব দ্য এ্যাসাসিনস' নামের অসামান্য লেখাটি একটি কবিতা প্রায়। মালার্মে, র‍্যাঁবো, রামকৃষ্ণ, কাইজারলিং, লাওৎসে, জেন দর্শন পড়েছেন যথার্থ কবির মতো। অসম্ভব আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন ভ্যান নঘ, মিকেলেঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চি, রদ্যাঁর তেলরঙ, ম্যুর‍্যাল আর ট্যাপেস্ট্রি। আর তাঁর প্রভাব ঔপন্যাসিকদের চেয়ে বেশী পড়েছে কবিদের ওপর।

'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এ জড়িয়ে আছে হেনরী মিলারের প্যারিসী জীবনের অভিজ্ঞতা। এর চরিত্রগুলো উদ্ভট, বিকারগ্রস্ত এবং বিচ্ছিন্ন। ওরা সকলেই অসম্ভব যৌনতাড়িত। সমাজ ও পরিস্থিতির সঙ্গে ক্লিন্ন সম্পর্কসূত্রে তারা অধঃপতিত। এবং বাস্তবেই তারা মিলারের পরিচিত।

টি. এস. এলিয়ট, হার্বার্ট রীড, হাক্সলির মতো মনীষীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। লরেন্স ডুরেলের মতো সমালোচক বলেছেন—লরেন্স আর সেলিনের বই আমাদের মনে অসুস্থ বোধ সৃষ্টি করে; কিন্তু মিলারের ট্রপিক বইগুলো পুচণ্ড স্বাস্থ্যকর।

হেনরী মিলার চেয়েছেন যৌন বিপ্লব ঘটাতে। ব্লেক আর র‍্যাঁবোর মতো তুলে এনেছেন নরকচিত্র। যৌনতাকে জীবনের একটি নিহিত প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন শুচিতা আর ক্লেদের সাথে একাত্ম করে। দেখিয়েছেন—সমাজ এবং সংঘের ধারনা কিভাবে ব্যাক্তি-মানুষকে বিনষ্ট করছে।

তাঁর বিখ্যাত লেখার মধ্যে আছে ট্রপিক অব ক্যানসার, ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ন, ব্ল্যাক স্প্রিং এবং দ্য রোজি ক্রুসিফিক্সিয়ন (অর্থাৎ সেক্সাস, প্লেকাস ও নেক্সাস নামের তিনটি উপন্যাসের ট্রিলজি)।

'কর্কট ক্রান্তি' তাঁর 'ট্রপিক অব ক্যানসার'-এর অনুবাদ।

আমি থাকি ভিলা বোর্হেসে। এ-বাড়ির কোথাও কোনো জঙ্গল নেই। একখানা চেয়ারও অগোছালো নয়। আমরা সবাই এখানে একা। এবং আমরা মৃত।

গত রাতে বরিস আবিস্কার করে—সে নোংরা। আমি তার বগল শেভ করে দিই। কিন্তু বরিসের আক্ষেপ থামার নয়। এমন একটা চমৎকার জায়গায় মানুষ নোংরা থাকে কিভাবে! বরিস আমার কাছে সংক্ষেপে তার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছে। লোকটাকে বলা যায় আবহাওয়া-বিশারদ। তার মতে, আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হবে। ঘটবে আরো দুর্যোগ, আরো মৃত্যু। অবস্থা পরিবর্তনের এক চিলতে সম্ভাবনাও চোখে পড়ছে না। সময়ের কর্কট আমাদের খেয়ে ফেলছে। আমাদের বীরেরা নিজেদের হত্যা করেছেন অথবা করছেন। তাহলে বীর কে? সময়? না, সময়হীনতা! মৃত্যুর কারাগারে প্রবেশ করতেই হবে আমাদের। মুক্তির কোনো উপায় নেই। আবহাওয়া কিছুতেই বদলাবে না।

আজ দু'বছর আমি প্যারিসে আছি। আমার এখানে আসার একটা কারণও ছিলো। কিন্তু কর্তব্যের ধারে-কাছেও পৌঁছুতে পারিনি। আমার টাকা নেই, সম্পদ নেই, আশাও নেই। জীবিত মানুষদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সুখী। এক বছর বা ছ'মাস আগে ভাবতাম, আমি একজন শিল্পী। কিন্তু এখন আর

তা মনে করি না। সাহিত্য বলতে যা বুঝায়, তার কণা মাত্রও আর আমার মধ্যে নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এ-জন্যে যে, আর কোনো বই লেখার দরকার আদপেই নেই।

তাহলে এটা কি? এটা কোনো বই নয়। এ হচ্ছে কুৎসা ও চরিত্রহননের ইতিকথা। এ হচ্ছে এক প্রলম্বিত অবমাননা, শিল্পের মুখে এক দলা থু থু এবং ঈশ্বর, মানুষ, নিয়তি, সময়, প্রেম ও সৌন্দর্য—সে যেই হোক না—তার পাছায়, এ হচ্ছে এক দুরুষ্টু লাথি। আমি তোমাদের শোনাবো একটা গান। হতে পারে তা বেসুরো; কিন্তু গাইতে আমাকে হবেই। তোমরা যখন গোঙাতে থাকবে, তখন আমি গান গাইবো। আমি তোমাদের পচা শবদেহের ওপর নৃত্য করবো।

গান গাইতে হলে প্রথমে তোমাকে মুখ খুলতে হবে। তোমার থাকতে হবে এক জোড়া ফুসফুস এবং সঙ্গীত সম্পর্কে সম্যক ধারনা। একখানা অ্যাকোর্ডিয়ান কিংবা গীটার যে থাকতেই হবে—তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গান গাইবার আকাঙ্ক্ষা। তাহলে এটি হচ্ছে একটা গান। আমি গান গাইছি।

তানিয়া, এই গানটি তোমার জন্যে। আমার ধারনা, আমি আরো ভালোভাবে আরো সুরেলা গলায় গাইতে পারবো। কিন্তু জানি না, এ-গান তোমার কানে কখনো পৌঁছুবে কিনা। তুমি আরো অনেকের গানই শুনেছো, যারা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তারা খুবই ভালো গাইতে পারতো অথবা খুব একটা

ভালো গাইতো না।

অক্টোবরের বিশটিশ হবে। দ্যাখো, দিনতারিখের হিশেব-টিশেব রাখা ইদানীং আর পোষায় না আমার। তুমি হয়তো জানতে চাইবে, আমার ১৪ই নভেম্বরের স্বপ্নটা এখনো টিঁকে আছে কিনা? জবাবে বলবো, স্বপ্নের বিরতি আছে; কিন্তু তা শেষ হবার নয়। আমার চারপাশের পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে ওখানে সে রেখে যাচ্ছে সময়ের দাগ। পৃথিবীটা হলো সেই কর্কট, যে নিজেকে খেয়ে ফেলছে। ...আমি ভাবছি, যখন সমস্ত কিছুর ওপর নেমে আসবে সেই মহা নৈঃশব্দ, সঙ্গীত তখনো জেগে থাকবে। যখন সময়ের জরায়ুতে সবকিছু আবার প্রবিষ্ট হবে, তখন জেগে থাকবে বিশৃংখলা। বিশৃংখলা হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট স্থান যেখানে লেখা থাকে বাস্তবতা। তানিয়া, তুমি হচ্ছো আমার বিশৃংখলা। আমি তাই গান গাই। হয়তো আমি নই, পৃথিবীটাই মারা যাচ্ছে, সময়ের চামড়া বাঁচাতে গিয়ে। আমি এখনো বেঁচে আছি। পদাঘাত করছি তোমার জরায়ুতে। কেননা বাস্তবতাকে উৎকীর্ণ করা হবে ওখানেই।

যাই হোক, ভালোবাসার শরীর তত্ত্ব! তিমি তার ছ'ফুট দীর্ঘ শিশ্ন উদ্যত করেছে। বাদুড়—হায়, এরা উভলিঙ্গ!

শিশ্নে হাড়-সম্বলিত প্রাণীকুল। 'সুখের বিষয়!' বলেন গুরমন্ত। 'সুখের বিষয়', হাড়ের অস্তিত্ব মানুষে এসে বিলুপ্ত হয়েছে। সুখের বিষয়? হ্যাঁ, সুখের বিষয়! ভাবুন তো একবার,

মানবজাতি তার লিঙ্গের ভেতর একখানা হাড় নিয়ে চলা-ফেরা করছে! ক্যাঙারুদের শিশ্ন হচ্ছে দু'টি— একটি সারা সপ্তাহের জন্যে— অন্যটি ছুটির দিনের জন্যে। দূর ছাই! এক মহিলা চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন, যদি আমি তার বইটির শিরোনাম দিয়ে দিই। শিরোনাম? অবশ্যই তা হবে 'লাভলী লেসবিয়ানস'! সুন্দরী সমকামিনীরা!

মিঃ বরাওস্কি বলেন: 'আপনার জীবন যেন একটা উপাখ্যান।' বুধবারে তাঁর সঙ্গে আমার লাঞ্চ করার কথা। ওর বউটা যেন ঠিক শুকিয়ে যাওয়া গাই। ইদানীং ইংরেজী শিখছেন— তার প্রিয় শব্দ ফিল্‌দি। আপনারা শিগগীরই দেখতে পাবেন, বরাওস্কির পাছার বেদনা কতোটা গভীর। তবে অপেক্ষা করুন·····,

বরাওস্কি পরেন কর্ডুরয়ের স্যুট। বাজান অ্যাকোর্ডিয়ান। দুর্দান্তভাবে যা মানানসই। শিল্পী হিসেবেও তিনি আদপেই ফেলনা নন। তিনি বলেন, তিনি একজন পোল। কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি আসলে ইহুদী। ওঁর বাবা ছিলেন ডাকটিকেট-বিশেষজ্ঞ। সত্যি বলতে কি, মপারনাস এলাকাটা ইহুদীতে ভর্তি। কিংবা আরো জঘন্য আধা-ইহুদীতে। ওখানেই আছে কার্ল আর পলা। আছে ক্রনসত্রাদ, বোরিস, তানিয়া, সিলভেস্টার, মলডর্ফ আর লুসিলি। মোট কথা এক ফিলমোর ছাড়া আর সবকটাই ইহুদী। হেনরী জর্ডান অস-ওয়াল্ডও ইহুদী হয়ে গেছে। লুই নিকোলাস একজন ইহুদী।

ভ্যান নর্ডেন আর শেরিয়ে ইহুদী না হলেও ওদের রয়েছে এক ধরনের ইহুদীপনা। তবে ফ্রান্সিস ব্ল্যাককে একই সঙ্গে বলা চলে ইহুদী এবং ইহুদিনী। আর টাইটাস? হ্যাঁ, সে-ও একটা ইহুদী। তা, ওই ইহুদীরা আমাকে ইহুদীময় করে রেখেছে। আমি এ-কথা লিখছি আমার বন্ধু কার্লকে লক্ষ্য করে, যার বাবা একজন ইহুদী। ঘটনাবলী ভালোভাবে বুঝবার জন্যে এসব তথ্য জানার দরকার আছে।

তবে হ্যাঁ, সব ইহুদীর সেরা ইহুদী হচ্ছে তানিয়া। আর কেবল ওর জন্যেই আমি নিজেও প্রায় ইহুদী হয়ে পড়েছিলাম। কেন হবো না। আমি ইতিমধ্যেই ইহুদীদের মতো কথা বলি। আমাকে দেখতেও ঠিক ইহুদীদের মতোই কুৎসিত। আর, ইহুদী ছাড়া ইহুদীদের আর সবচেয়ে বেশী ঘৃনাই বা করে কে!

যে সব জিনিস আমি ভীষণভাবে উপভোগ করি, খাদ্য তার অন্যতম। কিন্তু এই ভিলা বোর্হেসে খাদ্যবস্তুর কোনো চিহ্ন নেই। আমি বহুবার বোরিসকে ব্রেক ফাস্টের রুটির অর্ডার দিতে বলেছি। কিন্তু সে সব সময় এটা ভুলে যায়। সে খায় বাইরে, রেস্তোরাঁয় গিয়ে।

আমি ভ্যান নর্ডেনকে পছন্দ করি। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার মতামতকে আমি সমর্থন করি না। সে নাকি দার্শনিক··· চিন্তাবিদ! আসলে লোকটা আগাপাশতলা যোনিতাড়িত। আর, কস্মিনকালেও সে লেখক হতে পারবে না। লেখক

হওয়া কপালে নেই সিলভেস্টারেরও—যার নামটা জ্বলজ্বল করে পঞ্চাশ হাজার মোমের আলোয়। লেখক হিসেবে আমি পাত্তা দিই মাত্র ওই দু'জনকেই—কার্ল আর বোরিস। এরা সত্যি ভালো লেখে। তারা পাগল। তারা দুঃখী।

কিন্তু মলডর্ফ? দুঃখী সে-ও; তবে তার দুঃখভোগ স্বরচিত এবং বিচিত্র। সে উন্মাদ নয়—শব্দমাতাল। তার রগ বা রক্তবাহী শিরা নেই। নেই হৃদপিণ্ড কিংবা মূত্রাশয়। সে একটি চলমান তোরঙ্গ, যার অসংখ্য খোপে শাদা, বাদামী, লাল, নীল, খয়েরী, পাটকিলে, ধূসর, কমলা, হলুদ, বেগুনী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি রঙে লেখা সংখ্যাহীন লেবেল রয়েছে।

টাইপ রাইটারটা আমি পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়েছি, যাতে টাইপ করার সময় সামনের আয়নায় নিজেকে দেখা যায়।

তানিয়ার স্বভাব অনেকটা আইরিনের মতো। সে পেতে চায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কিন্তু তানিয়ার রয়েছে আরো একটি রূপ। তানিয়া এক জ্বরের নাম। লে ভোয়া উরিনেরিয়ে, কাফে দ্য লা লিবার্তে, পলস দ্য ভাসেজ, মপর্ণাস বুলেভারের উজ্জ্বল নেকটাইগুলো, অন্ধকার স্নানাগারসমূহ, পোর্তো সেক, আবদুল্লাহ সিগারেট, সেনিটা-প্যাথেটিকি, রক্তের কার্পেট এবং নরম উরু। তানিয়া অন্য সবার মতোই বলে, 'আমি তাকে ভালোবাসি।' আর বোরিস যখন হুইস্কিতে নিজেকে ঝলসাতে থাকে, তানিয়া বলে, 'এখানে বসো, ওগো বোরিস

—রাশিয়া—আমি কি করবো? ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

এক একদিন রাত্রে তানিয়ার কথা মনে হলে আমি ক্ষেপে যাই যেন। ও রে তানিয়া, তোর উষ্ণ যোনিটা এখন কোথায়, কোথায় তোর সেই মস্ত, নরম উরু। আমার এই ছ'ইঞ্চি লম্বা লিঙ্গের মধ্যে হাড় আছে, আমি তোর যোনির সব কটা দরজা ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবো। তোকে পাঠিয়ে দেবো তোর সিলভেস্টারের কাছে। তোর সিলভেস্টার? হ্যাঁ, সে জানে কিভাবে আগুন জ্বালাতে হয়। আর আমি জানি সেই আগুন একটা যোনিতে লাগাতে। তোর সিলভেস্টার কি এখন আমাকে হিংসা করে? সে কি কিছু বুঝতে পারে? পারে কি? আমার ঢাউস নুনুর মহিমা কি সে বুঝতে পেরেছে! আমি যে তোকে ঢিলে করে ফেলেছি, সে কি রাখে সে-খবর! আমার পর তুই অনায়াসে ঢালাঢলি করতে পারিস ভেড়া, ঘোড়া—এমনকি ষাঁড়ের সঙ্গেও। তানিয়া, আমি তোকে ধর্ষন করছি—তুই ধর্ষিতা হচ্ছিস। তুই যদি প্রকাশ্যে ধর্ষিতা হতে না-চাস—আমি গোপনে ব্যক্তিগতভাবে তোকে ধর্ষন করবো। আমি তোর যোনির ওপর থেকে চুল তুলে নিয়ে বুনে দেবো বোরিসের গালে। আমি তোর মধ্যচ্ছদা কামড়ে কামড়ে ছিঁড়বো।

চারদিকে নীরবতা। নিরেট ইউরোপীয় নীরবতা। দোকানগুলো জনশূন্য। শাটারগুলো নামানো। এ-দিকটায় এলে মনে হয় এটা আরেক প্যারিস। মম, গগাঁ আর জর্জ মুরের

প্যারিস। মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর স্প্যানিয়ার্ডের কথা, রীতি থেকে রীতিতে যে পৌঁচেছে পাকা খেলোয়াড়ের মতো, এক একটা লম্বা লাফে। মনে পড়ে স্পেংলারের কথা। এইসব কথা আমার আসলে মনে এলো সীন নদী পেরোবার পর। আমার পেছনে আলোর মালা। মনে হলো, রহস্যময় ওই পানিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এক বিস্মৃত পৃথিবীর ছবি। নদীর তীর বরাবর গাছের সারি। সেই গাছের শ্রেণীবদ্ধ ছায়া পড়েছে পানির আয়নায়। বাতাস উঠলেই নড়ে উঠছে সেই বিশাল আয়না—ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে গাছের ছায়া। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সঙ্গে আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে ভাবনার একটি কণাও তুলে ধরতে পারি।···

আইরিনকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে এই, যোনির চেয়ে সে স্তনকে বেশী গুরুত্ব দেয়। সে চায়, সবাই তার স্তনের গুনগান করুক। আবার লোনার যোনি বেশ পুরুষ্টু। সে একবার খামে ভরে তার নিম্নাংগের চুল পাঠিয়েছিলো কয়েক গোছা। লোনার বন্য নাক হাওয়ায় মজা খুঁজে পায়। কখনো টেলিফোন বুথে, কখনোবা শৌচাগারে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাজ সেরে নেয়। একটা মগের মধ্যে সে ভরে রেখেছে নানা যৌন যন্ত্রপাতি। টোটেন হ্যাম কোর্ট রোডের এ-মেয়েটি দিনরাত ওই চিন্তা নিয়েই আছে। সে ব্যবহার করে মোমবাতি, এমনকি দরজার খিল। দেশে এমন একটা শিশ্নও নেই, যা তার

হাউস মেটাতে সক্ষম। একটাও নেই। বরং গোটা মরদটাই দিব্যি তার ভেতরে সেঁধিয়ে যায়। তার জন্যে দরকার বাড়তি মাপের পুরুষাঙ্গ, স্ব-বিস্ফোরণযোগ্য রকেট, ফুটন্ত মোমে তৈরী তেল। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে সে আপনার লিঙ্গটি কেটে আজীবন নিজের যোনির ভেতর ভরে রাখবে। অবশ্য হ্যাঁ,—স্বীকার করতেই হবে যে অমন দুর্দান্ত যোনি লাখেও একটা মেলে না। ওরকম একটি মিথ্যুক মেয়েও দেখা যায় না সচরাচর। তার বক্তব্য ভরপুর হয়ে থাকে দুটি শব্দে—উকুন আর আগামীকাল। স্বামীটি তার বুদ্ধু, সাক্ষী গোপাল। বেচারা ক্যারল। লোনা ওকে এক বোতল হুইস্কি ভেট দিয়েই চুপ করিয়ে রাখে। ভ্যাড়াকান্ত আর কাকে বলে!

লোনার জার্মান মুখ, ফরাসী কান এবং রুশ পাছা। আর যোনি; এটি আন্তর্জাতিক। লাখ যোনির এক যোনি। আর তার পাছার আয়নাতে ফুটে উঠে মধ্যযুগের ইতিহাস।

নানা দিক দিয়েই মলডর্ফ এক বিচিত্র মানুষ। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তার কী আশ্চর্য সাদৃশ্য! মনে হয়, ওকে নয়—ফাটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকেই দেখেছি।

আমার পাণ্ডুলিপিটি আমি মাঝে মধ্যে উল্টেপাল্টে দেখি। বারবার পড়তে পড়তে পাতাগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। আমার সাহিত্য! সাহিত্যের পৃষ্ঠা! ভাবতেও কেমন ভয় হয়।

মলডফের লেখার সঙ্গে কী বিস্ময়কর মিল। তফাৎটা কি? না, আমি ভদ্রলোক। আর ভদ্রজনদের দুঃখকষ্টও তো ভদ্রোচিত। তাদের কষ্ট সেবা না পাওয়ায়। যেমন সিলভেস্টার বলে, যার অনিদ্রা নেই, সে কষ্ট কাকে বলে জানে না। আমার কষ্টের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। এ যেন বিছানায় বাছুর নিয়ে শোয়া। মাঝে মধ্যেই তার লাথি খেতে হচ্ছে তোমাকে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলো তো। আসলে ভয়ের কিছু নেই। তুমি অনায়াসে আনতে পারো তাকে। ক্ষেপিয়ে তুলতে পারো, শিরচ্ছেদ করতেও বাধা নেই।

অনেক লোক আছে যারা বন্য পশুর খাঁচায় ঢোকার ইচ্ছে পরিত্যাগ করতে পারে না। এমনকি রিভলভার কিংবা চাবুক ছাড়াও অনেক ঢুকে পড়ে। ভয় তাদের নির্ভর করে তোলে।... ইহুদীদের জন্যে দুনিয়াটা হচ্ছে হিংস্র পশুতে ভর্তি একটা খাঁচা। খাঁচাটায় দরজায় বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। এবং তার হাতে কোনো চাবুক বা রিভলভার নেই। তার মনোবল এতোই উঁচু যে, খাঁচার কোণায় স্তূপীকৃত পশুর বিষ্ঠার গন্ধ তার নাকে লাগে না। দর্শকরা চীৎকার করছে। কিন্তু সে কিছুই শুনছে না। সে মনে করে নাটকটি খাঁচার ভেতরেই অভিনীত হচ্ছে। খাঁচাটাকেই সে মনে করে পৃথিবী। তালাবন্ধ খাঁচার ভিতরে একা এবং অসহায় বোধ করতে করতে সে ভাবে, সিংহগুলো তার ভাষা বোঝে না। একটা সিংহও স্পিনোজার নাম শোনেনি। স্পিনোজা? কেন

সিংহরাও দাঁত বসাতে পারে না এই নামটির ওপর; তারা বরং গর্জন করে: 'আমাদের মাংস দাও!' তখন কোনো মতাদর্শ বা দর্শনই তাকে বাঁচাতে পারে না। সিংহের থাবার আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ে। এবং নিশ্চিহ্ন হয় পরক্ষনেই।

কিন্তু সিংহরাও কি তৃপ্ত? তারা যেখানে আশা করেছিলো রক্ত, হাড়, মাংস, মজ্জা, সেখানে কেবল মরিচ। মরিচের ঝাল! বলা বাহুল্য মরিচ দুস্পাচ্য। হজম করা যায় না।

আমি স্থির করেছি, যা লিখেছি, তার একটি লাইনও আর পাল্টাবো না। নিজের চিন্তা এবং কাজকর্মকে নিখুঁত করার ইচ্ছে আমার নেই বিন্দুমাত্র। তুর্গেনিভ তো বটেই, আমার রচনায় আরোপ করা হয়েছে ডটয়েভস্কির বিশুদ্ধতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের জন্যে রয়েছে দু'ধরনের বিশুদ্ধতা। অবশ্য ভ্যানগগের বিশুদ্ধতা হলো শিল্পের ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট শিল্পীর জয়।

লিখতে বসে আমি এখন একটা তাগিদই গভীরভাবে অনুভব করছে যে, আমি সেইসব কথাই লিখবো যা কোনো বইয়েই লেখা হয়নি। বই আমাদের জীবনকে কতোটুকু প্রভাবিত করেছে, তা আমি জানি না। বোধ হয় কেউই কোনোদিন প্রভাবিত হয়নি। সম্ভবতঃ খুনীরাই কেবল জীবন থেকে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের বোধটাকে ছেঁকে নিতে পারে, যুগ দাবী করে প্রথা-বিরোধিতা। কিন্তু আমরা কেবল পাচ্ছি জন্ম-বিরোধী বিস্ফোরণ। বিপ্লব হয় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে অথবা সংঘটিত

হচ্ছে অপরিণত অবস্থায়। আবেগ থিতিয়ে যাচ্ছে অনতি-বিলম্বে। মানুষ চিৎপাত হচ্ছে চিন্তাধারার ওপর। কোনো প্রস্তাবই চব্বিশ ঘণ্টার বেশী টেকসই হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে একটি বিশেষ যুগের শয্যায় বা শূন্যতায়। হঠাৎ টেলিফোন। আমি যা ভাবছিলাম তা গোল্লায় যাবে এবার। পরে আর কিছুই মনে পড়বে না। এই বাড়িটা ভাড়া করার জন্যে কেউ এখানে আসছে।

অর্থাৎ ভিলা বোর্হেসে আমার বসবাসের পাট এবার চুকে যাচ্ছে। আমি পৃষ্ঠাগুলো তুলে নেবো এবং সরে যাবো এখান থেকে। ঘটনা ঘটবে সব জায়গাতেই। ঘটনা সব সময়ই ঘটছে। লক্ষ্য করার বিষয় আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই একটা নাটক। লোকেরা উকুনের মতো ছেঁকে ধরবে তোমাকে। এবং তোমার চামড়ার নিচে নিজেদের কবর দেবে। তুমি চুলকোচ্ছো তো চুলকোচ্ছোই। চুল-কোতে চুলকোতে তোমার চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে এলেও রেহাই নেই।

আমি যেখানেই যাই, সেখানেই আমার ভেতরে মানুষেরা বাসা বাঁধে। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে রয়েছে নিজ নিজ ট্র্যাজেডি। যতো অভাগা, বিমর্ষ আত্মঘাতীর দল। সব-খানেই নৈরাশ্য, দুর্ভোগ, হাহাকার, চুলকোনি আর চুলকোনি। এর প্রভাব আমার ওপর পড়ছেও যথারীতি। কিন্তু এতে ঘাবড়ে যাই না আমি। ভয়ও পাই না। বরং উপভোগ করি।

আমি আরো বড়ো দুর্ভোগ, আরো ভয়ংকর দুর্বিপাক চাই। চাই আরো বড়ো মাপের ব্যর্থতা। আমি চাই আস্ত দুনিয়াটাই কক্ষচ্যুত হোক। আমি চাই চুলোকাতে চুলকোতে প্রতিটি মানুষ মারা যাক।

আমি এতোটাই দ্রুত এবং ভয়াবহভাবে এখন বাঁচতে চাই যে এমন সুগন্ধী শব্দ-নির্মানের সময়ও আমার হাতে কম। টেলিফোন করার খানিকক্ষণ পরেই সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক এলেন। ভাড়ার ব্যাপারে যখন কথাবার্তা শুরু হলো, আমি ওপর তলায় চলে গেলাম। সেখানে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এর পরে আমার করণীয় কি? আমি কোথায় যাবো। বোরিস কিছুক্ষণ পর আমাকে নিচে ডেকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলো মিস্টার ওয়ারেন এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। কথা হচ্ছিলো মিঃ ওয়ারেনের লেখা একটি গল্প সম্পর্কে। ওঃ, ইনি তাহলে একজন লেখক!

'আমি তো ভেবেছিলাম, ইনি একজন পেইন্টার!'

ইনি 'পেইন্টারও। মূলত পেইন্টারই।'—বোরিস চোখ নাচিয়ে বললো—'তবে অবসর সময়ে ইনি লেখেন। এবং ভালো, খুবই ভালো লেখেন।'

মিস্টার ওয়ারেনের মুখে জানা গেলো, একটি শব্দের জন্যে তাঁকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। আমি ভেবে পেলাম না, তবে ইনি লেখেন কিভাবে, কতোকাল ধরে! লেখক হিসেবে তাঁকে পছন্দই হচ্ছে না আমার! অবশ্য

মিসেস ওয়ারেনও জানালেন, কর্তা একবার লিখতে বসলেই হয়ে গেলো। তরতর করে করে লেখা এগিয়ে যায়। তা, আলাপ করে মিঃ ওয়ারেনের মনোভাব আঁচ করা বেশ মুশকিল। ভদ্রলোক কথা বলেন খুবই কম। বেশির ভাগ সময়ই উদাসভাবে চেয়ে থাকেন। মিসেস ওয়ারেন বললেন, 'ওর এটা অভ্যেসই বলতে পারেন। মনে হয়, অনেক দূরের কি একটা কিছু নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে।' কথাটা মুগ্ধতা এবং বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রবন করলো বোরিস। কিন্তু একটু আগে ভদ্রলোকের লেখা ঘোড়ার গল্পের যে নমুনাটি পেয়েছি তাতে আমি বুঝে উঠতে পারলাম না, এমন উদাস হয়ে থাকার আছেটা কি? আহাহা, গল্পের কি ছিরি! ভাবুক বটে!

বোরিস মদ কেনার জন্যে আমার হাতে টাকা দিলো। আমি দ্রুত পা চালালাম বাইরের দিকে। আমি জানি, ফিরে এসে কিভাবে আমি আরম্ভ করবো। রাস্তায় যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম, মিসেস ওয়ারেনের ছাড়া ছাড়া হাসিটা যেন আমার ভেতরে গুঞ্জন করছিলো। কিছুটা ধার এখনো আছে মহিলার। আগেকার ধারটার কথা চিন্তা করে আমি রোমাঞ্চিত হলাম। ইচ্ছে হলো তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে মিসেস ওয়ারেনের কথা শুনি; তার হাসির ছাড়া ছাড়া শব্দ শুনি। ইচ্ছে হলো···

বোরিস আগের ঢঙেই হাত ঘষছে দালালদের মতো। মিঃ ওয়ারেনের কোনো ভাবান্তর নেই। আমার দু'পায়ের মধ্যখানে একটি বোতল। আমি কর্ক-স্ক্রু দিয়ে ছিপি খুলছি।

মিসেস ওয়ারেনের মুখে সেই হাসি। আমার দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে মদ ছল্‌কে পড়ছে—রোদ্দুর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে জানালা দিয়ে। আর আমার ভেতরে চলছে যেন একটা তাণ্ডব। আমি যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছি ওদের সামনে। আমার দুপায়ের ফাঁকে বোতল এবং ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়া সূর্যালোকের পাশাপাশি আমি যেন আবার আমার আগের অভিজ্ঞতার কাছেই ফিরে যাচ্ছি। ফিরে যাচ্ছি প্যারিসে আমার প্রথম দিককার সেই দুঃখময় দিনরাত্রির কাছে। যখন দুঃস্থ ক্ষুধার্ত একটি লোক সামান্য খাদ্যের জন্য নগরীর রাস্তায় রাস্তায় প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব স্মৃতি যেন একটি মুহূর্তের মধ্যে আমার চেতনায় আছড়ে পড়লো। সেই নষ্ট হয়ে থাকা পায়খানা, সেই রাজকুমার—যে আমার জুতো পালিশ করেছিলো, সেই রুদ্ধশ্বাস অনুভূতি, দেয়ালে বৃহদাকার আরশোলা···শূন্য উদর, যখন তখন একজন অদ্ভুত মানুষের পাল্লায় পড়া—যেমন মাদাম দেলোর্মে! নাহ, আমি আর ভাবতে পারি না! তবে হ্যাঁ, আমি সেখানে পৌঁছেছিলাম। একেবারে তাঁর অন্দর মহলে। আমায় হান্টিং-জেকেট আর ফ্লাইয়ের একটি বোতাম-ছাড়া কর্ডুরয়ের প্যান্টিসহ খানসামা আর দাসীদের পাশ কাটিয়ে ঢুকতে পেরেছিলাম সেই বিশাল প্রাসাদে। এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাই সেই জমকালো ঝলমলে কক্ষটির ছবি, যেখানে একটি সিংহাসনে বসে আছেন মাদাম দেলোর্মে। দেয়ালে প্রবীন পৃথিবীর মানচিত্র, কাচের

আধারে সঞ্চরণশীল গোল্ড ফিশ আর শেলফে চমৎকারভাবে বাঁধানো সেই বইগুলো। আমি অনুভব করতে পারি, তার একটি বিশাল হাত আমার কাঁধের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি শিউরে উঠছি তার বিপুল বৈচিত্রময় সমকামী আচরণে। আবার মুগ্ধ হচ্ছি সেন্টল্যাজারে সহযোগে সুপক্ক মাংস ভক্ষণে। দেখছি বারান্দায় বেড়াতে থাকা সমকামী গণিকাদের।···

কী অদ্ভুত সেই দিনরাত্রিগুলো! নেই কোনো পরিচয়, নেই কোনো আহ্বান বা আমন্ত্রণপত্র। নেই কোনো টাকা পয়সা। আসলে আমি যখন বন্ধুহীন ছিলাম, তখনই ছিলো আমার স্বর্ণযুগ। প্রতিদিন সকালে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসে গমন, প্রতিদিন কেরাণীর সানন্দ সম্বোধন, অতএব ঘুরে বেড়ানো কখনো জার্দিন দ্য তুইলারিসে বোবা স্ট্যাচুগুলোকে ঘুরে ঘুরে দেখা, রাত্রে সীন নদীতে নৌকা ভ্রমনে বেড়িয়ে তার অনিন্দ্য সৌন্দর্যে আত্মহারা হওয়া,···গাছগুলো ঝুঁকে পড়েছে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে প্রতিটি প্রতিবিম্ব, ব্রীজের লাল আলোর নিচে ছোট বড় ঘূর্ণি, বাড়ির প্রবেশপথে খবরের কাগজের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা মেয়েগুলো, বৃষ্টির মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েগুলো, যেখানে সেখানে বাণী-উৎকীর্ন গির্জা, ভিখিরি, উকুন এবং বুড়ো হাবড়াগুলো, রাস্তার ধারে সারিবদ্ধ ঠেলা-গাড়ি—ঠিক যেন মদের হাড়ি, বাজারে জামের ভ্রাণ, শাকসব্জী নীল আর্কল্যাম্প।···

প্লেস সাঁ সালপিসে কী নির্জন, কী নির্ভার! যেখানে

মধ্যরাতে ছেঁড়া ছাতা হাতে ময়লা পোশাক পরা এক মহিলা এসে দাঁড়ায়। প্রতি রাতেই ছাতাটাকে গুটিয়ে বালিশ বানিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। ছাতাটার শিকগুলো ঝুলে আছে, মেয়েটির পোশাকের রং জ্বলে গেছে, আঙুলগুলো শীর্ণ।

সাঁ সালপিসে! ঘরের ভেতরে মোমের আলো জ্বলছে। ফোয়ারার উচ্ছাস আর পায়রাদের বকবকম শব্দে মুখর এই চৌরাস্তাটা নাকি আনাতোল ফ্রাঁসের খুব প্রিয় জায়গা ছিলো।

এখানে দিনের পর দিন আমি বসে বসে ভাবতাম জার্মেইনের কথা। বাস্তিলের কাছাকাছি ছোট্ট নোংরা একটা রাস্তায় তার বাসা ছিলো। চারদিকে বাস চলাচলের শব্দ। রাস্তায় অ্যাশফল্টের প্রতিক্রিয়া।

বছর খানেক পরেই এর পার্শ্ববর্তী রু-বোনাপার্তে আমি আর মোনা অনেক হেঁটেছি। বরাওস্কির কাছ থেকে ছুটি নেবার পর প্রতি রাতেই আমরা দু'জন ওই রাস্তায় হেঁটে বেরিয়েছি। সাঁ সালপিসে নামের অর্থ, এমনকি গোটা প্যারিসই আমার কাছে তখন তাৎপর্যহীন। বাচালতা এবং একই মুখ বারবার দেখতে দেখতে আমার তখন হাঁফ ধরে গেছে। ক্যাথিড্রাল আর স্কোয়ার দেখতে দেখতে পচে গেছে চোখ। লাল রঙের শোবার ঘরে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে থাকা, কষ্টদায়ক বেতের চেয়ারে সারাদিন বসে বসে পাছা ব্যথা

করা, লাল ওয়ালপেপার এবং মানুষের অকারণ হন্তদন্ত চলাফেরা দেখে দেখে ক্লান্ত, বিরক্ত আমি। লাল বেডরুমে ট্রাঙ্কটা সব সময়ই খোলা। তার গাউনটা পরে আছে অচলতার প্রতীক হয়ে। বেতের চেয়ার, নোট বই—যে জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখি না। পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে শীতল এবং মৃত। প্যারিস! যার অর্থ কাফে সিলেক্ট, দোমেঁ, দ্য ফ্লিয়া মার্কেট, দি আমেরিকান-এক্সপ্রেস। প্যারিসের মানে হচ্ছে বরাওস্কির বেতের লাঠি, বরাওস্কির টুপি, বরাওস্কির গোয়াশ, বরাওস্কির প্রাগৈতিহাসিক মাছ, প্রাগৈতিহাসিক রসিকতা। '২৮-এর সেই প্যারিসের একটি রাত্রিই কেবল আমার স্মৃতিতে জাগরুক—আমেরিকা যাত্রার জাহাজে ওঠার আগের রাত্রিটির কথা। সত্যি এক দুর্লভ রাত্রি ছিলো সেটি। সেদিন বরাওস্কিও আমার সঙ্গে ছিলো। তবশ্য সবার সঙ্গে নাচানাচি, ঢলাঢলি করতে দেখে আমার ওপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত। কিন্তু ওই যে—'আমরা সকালেই এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি!' যে মেয়েটির সঙ্গেই দেখা হচ্ছিলো আমি তাকেই জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'সকালেই চলে যাচ্ছি!' স্বর্ণকুন্তলা মেয়েটিকেও একই কথা বলেছিলাম আমি। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে ল্যাভটরিতে ঢুকলো। আমি দাঁড়িয়েছি মলভাণ্ডের গা ঘেঁষে। মেয়েটি আমার একটি হাত নিয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে গুঁজে দিলো। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। শিশ্নটাকে একই সঙ্গে মনে হচ্ছিলো হালকা এবং ভারী।

যেন এটি একখণ্ড সীসে—যার পাখা আছে। কে জানে, হঠাৎ মোনা এখানে এসে পড়ে কিনা। কিংবা বরাওস্কিও ঢুকে পড়তে পারে আচমকা—তার সোনায় বাঁধানো বেত হাতে। কিন্তু সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে এবং আমি এখন বেপরোয়া। আমি মেয়েটিকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে বিদ্ধ করতে চাইলাম; কিন্তু হলো না। তারপর বসে পড়লাম দু'জনেই। তাতেও কাজ হলো না। অসুবিধে হচ্ছিলো। তা হোক, মেয়েটির এমন নিবিড়ভাবে আমার লিঙ্গটি ধরে আছে, যেন ওটি হাত ফস্‌কে গেলে তার মৃত্যু হবে। নাচের বাজনা তখনও বাজছিলো। ওয়াল্‌স। আমরা বাজনার তালে তালেই পায়খানা থেকে নাচতে নাচতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওর চমৎকার গাউনের আড়ালে আমি তখন প্রায় ঢাকা পড়ে আছি। গাউনের ভেতরে কি হচ্ছে—সে তো বলাই বাহুল্য। টেবিলের কাছে এসে দেখি বরাওস্কির মুখে থমথমে। দেখলাম, মোনার চোখে অভিমান বরাওস্কি বললো, চলো কালকে সবাই ব্রাসেল্‌স যাই!' আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী।

হোটেলে ফিরে যেখানে সেখানে বমি করতে শুরু করলাম আমি। বিছানা, স্যুট, গাউন, বেতের ছড়ি, কোনোদিন স্পর্শ-না করা নোটবই; শীতল ও মৃত পাণ্ডুলিপি—সব কিছুর ওপর ছড়িয়ে পড়ছিলো আমার বমি।

মাস কয়েক পর। সেই একই হোটেল একই কক্ষ। আমরা

২—

করা, লাল ওয়ালপেপার এবং মানুষের অকারণ হন্তদন্ত চলাফেরা দেখে দেখে ক্লান্ত, বিরক্ত আমি। লাল বেডরুমে ট্রাঙ্কটা সব সময়ই খোলা। তার গাউনটা পরে আছে অচলতার প্রতীক হয়ে। বেতের চেয়ার, নোট বই—যে জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখি না। পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে শীতল এবং মৃত। প্যারিস! যার অর্থ কাফে সিলেক্ট, দোমেঁ, দ্য ফ্লিয়া মার্কেট, দি আমেরিকান-এক্সপ্রেস। প্যারিসের মানে হচ্ছে বরাওস্কির বেতের লাঠি, বরাওস্কির টুপি, বরাওস্কির গোয়াশ, বরাওস্কির প্রাগৈতিহাসিক মাছ, প্রাগৈতিহাসিক রসিকতা। '২৮-এর সেই প্যারিসের একটি রাত্রিই কেবল আমার স্মৃতিতে জাগরুক—আমেরিকা যাত্রার জাহাজে ওঠার আগের রাত্রিটির কথা। সত্যি এক দুর্লভ রাত্রি ছিলো সেটি। সেদিন বরাওস্কিও আমার সঙ্গে ছিলো। তবশ্য সবার সঙ্গে নাচানাচি, ঢলাঢলি করতে দেখে আমার ওপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত। কিন্তু ওই যে—'আমরা সকালেই এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি!' যে মেয়েটির সঙ্গেই দেখা হচ্ছিলো আমি তাকেই জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'সকালেই চলে যাচ্ছি!' স্বর্ণকুন্তলা মেয়েটিকেও একই কথা বলেছিলাম আমি। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে ল্যাভটরিতে ঢুকলো। আমি দাঁড়িয়েছি মলভাণ্ডের গা ঘেঁষে। মেয়েটি আমার একটি হাত নিয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে গুঁজে দিলো। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। শিশ্নটাকে একই সঙ্গে মনে হচ্ছিলো হালকা এবং ভারী।

যেন এটি একখণ্ড সীসে—যার পাখা আছে। কে জানে, হঠাৎ মোনা এখানে এসে পড়ে কিনা। কিংবা বরাওস্কিও ঢুকে পড়তে পারে আচমকা—তার সোনায় বাঁধানো বেত হাতে। কিন্তু সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে এবং আমি এখন বেপরোয়া। আমি মেয়েটিকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে বিদ্ধ করতে চাইলাম; কিন্তু হলো না। তারপর বসে পড়লাম দু'জনেই। তাতেও কাজ হলো না। অসুবিধে হচ্ছিলো। তা হোক, মেয়েটির এমন নিবিড়ভাবে আমার লিঙ্গটি ধরে আছে, যেন ওটি হাত ফস্‌কে গেলে তার মৃত্যু হবে। নাচের বাজনা তখনও বাজছিলো। ওয়াল্‌জ। আমরা বাজনার তালে তালেই পায়খানা থেকে নাচতে নাচতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওর চমৎকার গাউনের আড়ালে আমি তখন প্রায় ঢাকা পড়ে আছি। গাউনের ভেতরে কি হচ্ছে—সে তো বলাই বাহুল্য। টেবিলের কাছে এসে দেখি বরাওস্কির মুখে থমথমে। দেখলাম, মোনার চোখে অভিমান বরাওস্কি বললো, চলো কালকে সবাই ব্রাসেল্‌স যাই!' আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী।

হোটেলে ফিরে যেখানে সেখানে বমি করতে শুরু করলাম আমি। বিছানা, স্যুট, গাউন, বেতের ছড়ি, কোনোদিন স্পর্শ-না করা নোটবই; শীতল ও মৃত পাণ্ডুলিপি—সব কিছুর ওপর ছড়িয়ে পড়ছিলো আমার বমি।

মাস কয়েক পর। সেই একই হোটেল একই কক্ষ। আমরা

২—

জানালা দিয়ে নিচের প্রাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে আছি। এক-দিকে রাখা আছে কয়েকটা সাইকেল। ওর ওপর দিকেই একটি ছোট রুম—যেখানে অ্যালেক নামে এক স্মার্ট যুবক অষ্ট প্রহর গ্রামোফোন বাজায়। মাঝে মাঝে গলায় যতোটুকু জোর আছে সবটুকু খাটিয়ে সে এক একটি রসালো শব্দ উচ্চারণ করে। মোনা অনেক দিন বাইরে ছিলো। আজ সকালেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা সাঁ লাজা-রেতে। সন্ধ্যা অবধি ওখানেই ওর জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় মোনা? পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করে আবার পড়লাম। তারপর বাসায় ফিরে এলাম এবং খেয়ে নিলাম। বাইরে গিয়ে দোমেঁর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছি, হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একখানা বিশাল ফ্যাকাসে মুখ। চোখ দু'টো অবশ্য রাগে জ্বলছে। পরণে সেই ছোট্ট ভেলভেট স্যুট। নরম ভেলভেটের নিচে গরম স্তনযুগল। দৃঢ়, পেশল মর্মরপ্রতিম দু'টি পা। অসংখ্য মুখের সমুদ্র থেকে তার মুখটি যেন ভেসে উঠলো এবং সে আমাকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার চোখ, নাক, আঙুল, পা, বোতল, জানালা, পার্স, সময়—সব কিছুই আলিঙ্গনাবদ্ধ আমাদের দু'জনের দিকে তাকালো। আমি তার পাশে বসলাম। তার মুখে কথার খৈ ফুটছে তখন। বিকার, ক্ষিপ্ততা এবং কুষ্ঠ-রোগের এক বন্য বর্ণনা। আমি কিন্তু একটি শব্দও শুনছি না। সে সুন্দরী। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি এখন ওর জন্যে

মরতেও পারি। সানন্দে।

আমরা রু দ্য সাতুতে গিয়ে ইউজিনিকে খুঁজতে লাগলাম। দু'জনে রেলব্রীজে উঠলাম এবং ট্রেনের আনাগোনা দেখলাম। কিন্তু কোথায় ইউজিনি? আমাদের বিরক্তির একেবারে এক-শেষ। তবুও মোনার পাশে হাঁটতে হাঁটতে এক ধরনের পরি-তৃপ্তিতে আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে যেন। ব্রীজের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটছি। ট্রেনের ধোঁয়া আমাদের পায়ের মাঝ-খান দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি ওর শরীরটাকে আমার সংলগ্ন বলে মনে করছি। সবই এখন আমার। আমি একটু থেমে নরম ভেলভেটের ওপর হাত ঘষলাম!

ফিরে এলাম সেই কক্ষে। আমি জানালা দিয়ে ওপরের ছোট রুমটার দিকে তাকালাম। না, এখন সেখানে আর গ্রামো-ফোন বাজছে না। ট্রাঙ্কটি খোলা। এবং ওর জিনিষপত্র আগের মতোই এলোমেলো। পোশাক-টোশাক সুদ্ধই সে বিছানায় শুয়ে পড়লো। একবার। দু'বার। তিনবার। চারবার। আমার ভয় হলো, মেয়েটি না পাগল হয়ে যায়। বিছানায়, কম্বলের নিচে নতুন করে ওর শরীরের স্বাদ নেয়া কতোই মধুর। কিন্তু তা কতক্ষনের জন্যে?

সে যেন প্রলাপ বকছিলো। 'আহা, যদি এই রাত আর শেষ না হতো!'

ঃ মোনা শান্ত হও, আমার দিকে তাকাও, কথা বোলো না!— বলতে বলতে আমি ওর শরীরের নিচ থেকে হাত টেনে বের

করে নিলাম। আমার চোখ ছু'টি বোঁজা। ওর শরীরটা পড়ে আছে আমার পাশে। আজ সারারাত অবশ্যই থাকবে। ···ওহ, সেই কবে ফেব্রুয়ারীতে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম বন্দরের বাইরে। প্রচণ্ড বাতাস আর তুষারপাত। আমি পেছন ফিরে জানালায় একটা হাত নড়তে দেখছিলাম। রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছিলো একটা লোক। তার টুপিটা চোখ পর্যন্ত নামানো। যেন আমাকে জরীপ করছে। ঠোঁটে তার চুরুট। মোনা জানালায় তখনো হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে আমাকে। বিশাল শাদা মুখ, হাওয়ায় উড়ছে বন্য চুলগুলো। আর এখন? এখন মস্ত বড় এই শোবার ঘরে সে আমার গা ঘেঁষেই শুয়ে আছে। ওর চুল আমার মুখে। আমার চোখ ছু'টি বোঁজা। ছু'জনের উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগছে পরস্পরের মুখে। ছু'জন আলিঙ্গনাবদ্ধ। আমেরিকা তিন হাজার মাইল দূরে। আমি ওকে আর কখনো দেখতে চাই না। আমার শয্যায় মোনার অস্তিত্ব যেন কল্পনাও করা যায় না। কেমন অবিশ্বাস্য, অলীক বলে মনে হয়। কিন্তু না, এ জ্বলন্ত বাস্তব। সেই সকাল পর্যন্ত।···

আমি আর একবার ওর মুখের দিকে তাকালাম। ঘরে একটা ঝাপসা আলো জ্বলছে। আমি ওর বন্য চুলগুলোর দিকে তাকালাম। অনুভব করলাম আমার গলা বেয়ে যেন কি নামছে। আমি আবার ওর দিকে তাকালাম। ওর চুলগুলো জীবন্ত। বিছানার চাদর গিয়ে বালিশে উঠেছে। আমি

সেগুলো টেনে টেনে ঠিক করলাম।

ভোর হয়েছে সবেমাত্র। আমরা তাড়াতাড়ি পোষাক পরে হোটেলের বাইরে বেরুলাম। কাফেগুলো এখনো বন্ধ। আমরা হাঁটছিলাম, গা চুলকোচ্ছিলাম। দুধের মতো ঝকমকে শাদা ভোর। আকাশে গোলাপী আভা। প্যারিস প্যারিস। এখানে সবকিছুই ঘটে। আমরা কোথায় যাবো? কেন যাবো? মোনার ক্ষিধে পেয়েছে। তার পাৎলা পোশাক। পারফিউমের ভুরভুরে গন্ধ। কানে জংলা দুল। অ্যাভেন্যু দ্যু মেইনের এক বিলিয়ার্ড পার্লারে বসে আমরা গরম কফির অর্ডার দিলাম। হোটেলের পায়খানা নষ্ট হয়েছে। অন্য হোটেলে গিয়ে ভার-মুক্ত হতে চাইলে আমাদের কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে আমরা পরস্পরের গা থেকে ছারপোকা বাছতে বসলাম। নার্ভাস মোনা এবার রেগে গেলো। গোসল না করলেই নয়। এটা না করলে নয়—ওটা না করলে নয়—হ্যানো ত্যানো—কতো কিই যে বকবক করতে লাগলো সে।

ঃ সঙ্গে কতো টাকা আছে?

ঃ টাকা? তা তো ভুলে গেছি।

হোটেল দ্য এতাত উনি। দিনের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে আমরা ঘুমোতে গেলাম। ঘুম থেকে জেগে দেখি, অন্ধকার হয়ে গেছে। জেগে উঠে আমার প্রথম কাজ, আমেরিকায় ক্যাবল্ পাঠা-বার মতো টাকার যোগার করা। তাছাড়া বুলেভার রাসপাই-লের স্প্যানিস মহিলাটির রান্না যা চমৎকার! সকালে কিছু

একটা ঘটবে। অন্ততঃ আমরা দু'জন এক সঙ্গে শোবো। ছারপোকার ভয় নেই!

২

ভিলা বোর্হেসে আমি শুরু করতে যাচ্ছি এক নতুন জীবন। সকাল দশটায় আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে বেরুলাম। এখন আমাদের সঙ্গে একজন এলসা আছে। 'ক'দিন একটু বুঝে সুঝে পা ফ্যালো হে ছোকরা।'—বললো বোরিস। 'একটু আস্তে সুস্থে চলা দরকার।'—তার মন্তব্য। দিনটি শুরু চমৎকারভাবে। উজ্জ্বল আকাশে, পরিস্কার বাতাস, বাড়িগুলোয় নতুন রঙ করা হয়েছে। পোষ্ট অফিসে যাবার পথে বইটি নিয়ে আলোচনা করি বোরিস আর আমি। সেই শেষ বইটি, যা লিখিত হচ্ছে।

একটি নতুন দিন শুরু হয়েছে। সকালটা এমন যে, মনে হচ্ছে আমরা দুফ্রেঁসের ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ত্রয়োদশ শতকের আঁকা একখানা জীবন্ত নগ্নিকা যেন; নিরেট এবং নখের মতো গোলাপী। একটি শরীরী সঙ্গীত, যার ত্বকে সকালের মরচে লেগে আছে। একটি স্থির জীবন; কিন্তু কিছুই স্থির নয়। কিছুই মৃত নয় এখানে। টেবিল

ভর্তি খাবার। এতো খাবার যে মনে হয় ছবির ফ্রেম থেকে তা পিছলে পড়বে। ত্রয়োদশ শতকের পুনরুচ্চারণ—যা শিল্পী নিখুঁতভাবে উপ-স্থাপিত করেছেন। সেই জঙ্গলের স্মৃতি ···জেব্রা-পরিবার পাম-গাছের পাতা খাচ্ছে।

আর এখন আমাদের আছে এলসা। ভোরবেলা আমরা যখন বিছানায় শুয়ে আছি, সে তখন বাজনা বাজাচ্ছিলো।··· 'একটু আস্তে সুস্থে চলা দরকার!'···চমৎকার! এলসা এক-জন দাসী আর আমি একজন অতিথি। আর বোরিস? সে তো একটা ডাগর পানির। একটি নতুন নাটক শুরু হতে যাচ্ছে। এই কথাটি লেখা শেষ হলে আমি হাসলাম একা একাই। বোরিস অবশ্য জানে, কি ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাটার নাক বড়ো সজাগ। টের পেয়ে যায়।···'একটু আস্তে সুস্থে।'

বোরিস দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সুঁচের ওপর। যে কোনো মুহূর্তে দৃশ্যে এসে দাঁড়াতে পারে ওর বউ। তা বউ বটে বোরিসের। মহিলার ওজন ১৮০ পাউণ্ড। আর বোরিস? রোগা পাৎলা-দুবলা মানুষ। কী অপরূপ সমন্বয়—ভাবুন একবার। রাতে বাড়ি ফেরার সময় বোরিস যখন তার দুঃখের পাঁচালি গাইছিলো, আমি না হেসে পরলাম না। বোরিস নিচু গলায় বললো: 'অতো হাসছো কেন? জানো, ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি বেঁচে যাই। ও যদি যায়, সত্যি যায়—যাবার সময় যা চায় তাই দেবো!'

কিন্তু সব কিছুর আগে বাড়িটা ভাড়া দেয়া দরকার। দলিল সইসাবুদ হওয়া প্রয়োজন। এবং এরকম আরো কতো কিছু যে গোছগাছ করা দরকার তার শুমার নেই। বোরিস ভয়ে ভয়ে আছে, কখন যে হঠাৎ এসে দুয়ারে দাঁড়ায় তার বউ। তাহলে কি উপায় আছে! বোরিস তো ভয়েই কাহিল।

যাই হোক, আমরা এলসার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলাম যথারীতি। অন্ততঃ কিছুদিন তো নিশ্চিন্তভাবে মওজ লোটা যাবে। অথচ এলসাকে রাখা হয়েছে সকালের নাশতা বানাতে আর ঘরদোর দেখাশোনা করতে। এলসা আমার ভেতরে একটু একটু করে অনুপ্রবেশ করছিলো। মেয়েটা জার্মান। আজ সকালে কী যে করুণ সুরে সে গান গাইছিলো। ওর সুরের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছিলো টাটকা কফির ঘ্রান। মনে মনে গুনগুন করছিলাম আমিও। যখন ব্রেকফাষ্ট করছি, ওপর তলায় বাথ বাজাচ্ছে সেই ইংরেজ ছোকরাটি। এলসা বললো, 'ছেলেটার একটা মেয়ে সঙ্গী দরকার।' এবং এলসাও যে কিছু চায়, আমি তা বুঝতে পারি। এ-ব্যাপারে বোরিসকে আমি কিছু বলিনি। কিন্তু সে যখন দাঁত ব্রাশ করছে—এলসা আমাকে বার্লিন সম্পর্কে কান ভারি করেছে। বলেছে—'মাগিদের পেছন থেকে দেখেই যা ধাঁধা লাগে—কাছে যাও—মাগো—সিফিলিস!'

দুপুরে আমরা লিখছিলাম। স্টুডিওতে আমরা বসেছিলাম প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। আমি বসেছিলাম সেই শেষ বই-

টির পাণ্ডুলিপি নিয়ে আর এলসা তার ইতালি-প্রবাসী প্রেমিকের কাছে চিঠি লিখলো। যন্ত্রে প্রায় জং ধরার যোগাড়! বোরিস গেছে বাইরে। বাড়িটা ভাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শস্তা ছোট রুম তার দরকার হবে। তাই সে গেছে ঘর খুঁজতে। ঘরটা অবশ্য দরকার কেবল ওই এলসাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার জন্যই। এলসাও তাই চায়। মেয়েটার জন্যে আমার দুঃখ হয়। ওর হস্তাক্ষর অবশ্য দুর্বোধ্য। কিন্তু ওই বিষাদমাখা জার্মান গান! মনটাকে যেন মুচড়ে দেয়। ছোট ছোট দু'টি চোখ। একই সঙ্গে এমন বিষণ্ন এবং এমন অগ্নি-বর্ষী! ভাবা যায় না।

লেখার পাট চুকলে আমি বললাম, 'এলসা, একটা গান গাও, শুনি।' এলসা একজন গায়িকা! যদিও তার গান শুনলে ভাঙা পেয়ালের ঠোকাঠুকি ছাড়া আর কোনো তুলনাই মনে আসার কথা নয়।

এলসা গাইছিলো। এবং আশ্চর্য—সেই সঙ্গে কাঁদছিলোও সে। আমি তাকে দোষ দিই না। সে বলে সব পুরুষই এক রকম। সব জায়গাতেই। পুরুষটির সঙ্গে আছো—হঠাৎ সে তাড়িয়ে দেবে তোমাকে। তখন গর্ভপাত এবং অন্য একজন পুরুষের সন্ধান। অন্য একটি কাজ, এবং অন্য একজন মানুষ। কিন্তু কেউ তোমাকে এমনি এমনি কিছু দেবে না। আগে তার সঙ্গে শোও, তবেই হোক একটা কাজ তুমি পাবে। যাই হোক, সবশেষে এলসা বাজালো শুমান। শুমান—দুর্দান্ত

জার্মান সুরকার। এমন আবেগবহুল সুর তৈরী করে গেছে লোকটা যে মনটাকে তা উদাস করে দেয়। ওই সুরে এলসার মতো আবেগাপ্লুত হই আমিও—কিন্তু আমার কাছে থেকেও তো ওর পাবার মতো কিছু নেই। বাজনা শেষ হবার পরেও শুমান যেন এলসাকে আমার রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো বারবার। কিন্তু আমার মন চলে গেছে অনেক দূরে। আমি তানিয়ার কথা ভাবছিলাম। মনে পড়েছে গ্রীন পয়েন্টের সেই অপরাহ্নের কথাও। যখন জার্মানরা বলাৎকার করছে নিরপেক্ষ দেশ বেলজিয়ামকে। আমরা তখন বিপন্ন মানবিকতার স্বপক্ষে কয় পয়সা খরচ করেছি? এখন আমরা কোনো কবির বাণী শুনিনি। সারা দুপুর এবং সন্ধ্যায়ও পরিবেশটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো জার্মান সঙ্গীতে। সারাটা পাড়া ভর্তি কেবল জার্মান আর জার্মান। জার্মানীর চেয়েও অধিক সংখ্যক জার্মান। আমরা বেড়ে উঠেছি শুমান আর হুগো উল্‌ফের সঙ্গে সঙ্গে। বিকেলে আমরা গোল টেবিলের চারদিকে বসে পড়তাম। ঘরের পর্দা থাকতো নামানো। পাশের মেয়েটির হাতের দু'টি আঙুল আমার ফ্লাইয়ের মধ্যে। শেষে আমরা পিয়ানোর পেছনে মেঝের ওপর শুয়ে পড়তাম। তখন হয়তো কেউ বেঘোরে গেয়ে চলেছে গান। পিয়ানোর পাদানী ওঠানামা করছে কর্কশ ও যান্ত্রিকভাবে। জিনিসটাকে মনে হচ্ছে গোবর দিয়ে বানানো ক্লক টাওয়ারের মতো যা তৈরী করতে সময় লেগেছে সাতাশ বছর, কিন্তু নিখুঁত সময় দেয়।

হঠাৎ আমার মনে হতো, এক্ষুনি যদি ভোর হয়ে যায়, তাহলে যেন দেখা যাবে বরফের ওপর পানি পড়ছে। ধোঁয়ার মতো জমে উঠেছে নীলচে কুয়াশা। পান্না সবুজ পানির মধ্যে ডুবে আছে গ্লেসিয়ার। চারদিকে বিচরণ করছে এন্টিলোপ আর সামুদ্রিক গাভীরা। আর্কটিক বলয়ের ওপর লাফিয়ে পড়ছে তুষার শৃগাল।···

এলসা বসে আছে আমার কোলের ওপর। তার চোখ জোড়া যেন ছোট্ট দু'টি বোতাম। আমি দেখছি তার বিরাট ভেজা মুখমণ্ডল। মুখটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি। সে গুনগুন করছে এস্ ওয়ার সো স্কন্ গুয়েজেন···! আহ এলসা, তুমি জানো না, এর অর্থ আমার ওপর কতোটুকু প্রযোজ্য। তোমার ট্রম-পিটার ভন শ্যাকিনজেন্···জার্মান গীতিকার গোষ্ঠি··· শোয়া-বেন হল, টার্ন ভেরিয়েন···লিংক্স উম, রেখ্ট উম্···এবং তার-পর দড়ির শেষ প্রান্তে পাছার নিচে দোলনার ছোঁয়া।

ওহ, জার্মানগণ! তারা তোমাকে আপাদমস্তক কব্জা করে নেবে। তারা তোমাকে দেবে বদহজম। একই রাত্রে তুমি কোনো লাশ কাটা ঘর দেখতে যেতে পারবে না। যেতে পারবে না চিড়িয়াখানায় কিংবা ফ্রয়েড আর স্টেকেলের চৌহ-দ্দিতে। নাগরদোলায় চড়লে কেউ অন্য কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু জার্মানদের সঙ্গে এক রাতে তুমি চলে যেতে পারো ভেগা থেকে লোপে ডে ভেগা। এবং তোমাকে ফিরে আসতে হবে বোকা পার্সিফলের মতো।

আগেই বলেছি, দিনটা শুরু হয়েছে চমৎকারভাবে। আজকেই যেন প্রথমবারের মতো শরীরী প্যারিসকে অনুভব করছি আমি। কারণটা বোধ হয় যে, আমার ভেতরে একটা বই বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। আমি একে বহন করে চলাফেরা করছি সর্বত্র। আমি বড়ো বড়ো রাস্তা পার হচ্ছি শিশু এবং ট্রাফিক পুলিশের হাত ধরে। মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে তাদের আসনে বসতে দিচ্ছে। আমাকে কেউ এখন আর রূঢ়ভাবে ধাক্কা দেয় না। আমি গর্ভবতী। আমার বৃহৎ উদরের ভার পৃথিবীর ওপর চেপে বসেছে। আমরা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করতে চলেছি। আমি আর বোরিস। এটি হবে এক নতুন বাইবেল। শেষ বই! যাদের কোনো কিছু বলবার আছে, তারা এখানে তা বলবে অকপটে। আমাদের-টার পর কোনো বই থাকবে না। অন্ততঃ এক জেনারে-শনের জন্যে। বস্তুটি আমাদের প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। এখন তা রাখবার মতো একটি পাত্রের দরকার। এ এক পরা-ক্রমশালী বোমা, যা ছুঁড়ে মারবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ধ্বংস হবে। এতে মজুত থাকবে ভবিষ্যতের লেখকদের জন্যে প্রচুর প্লট। থাকবে তাদের নাটক, কবিতা, কিংবদন্তী এবং বিজ্ঞানের জন্যে অঢেল উপকরণ। আগামী হাজার বছরের খাদ্য সংর-ক্ষিত থাকবে ওই পিপের মধ্যে। কথাটা ভাবতেই যেন রোমাঞ্চ হয় আমার।

একশো বছর কিংবা তার কিছু আগে থেকেই পৃথিবী, আমাদের

এই পৃথিবীটা মারা যাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি লোকও এগিয়ে আসেনি, সৃষ্টির উন্মুনের মধ্যে যে বোমা ফাটাবে। পৃথিবীটা ক্রমাগত পচছে। কিন্তু মৃত বিবর্তনকেও আমরা কবর দিইনি। সময়ের মুখমণ্ডলের ওপর আমরা সাঁতার কাটছি। কিন্তু অনেকে ইতিমধ্যে ডুবে গেছে। কেউ কেউ ডুবছে এবং বাকিরাও ডুববে। কেবল জেগে থাকবে এক বিশাল শূন্যতা। সেই মহাশূন্যতার মধ্যেই নাচ, গান, স্নান, ধর্ষণ, খুন, সব কিছু চলবে। কেবল একটি গির্জা। সেখানে গিয়েই মানুষ নিজের হারানো পরিচিতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। কিন্তু যে কোনো ভাষাতেই তুমি কাকুতি মিনতি করো, যে কোনো ভাবেই তুমি দেয়ালে মাথা কোটো, তারা তোমাকে তা দেবে না। গির্জাটির আয়ুষ্কাল হবে এক হাজার বছর। নির্মাতা তো মারা গেছে কবেই। এবং নীল-নক্শাটিও বিনষ্ট। আমরা এর ছবি দিয়ে পোস্টকার্ড তৈরী করবো এবং ভ্রমণে বেরুবো। আমরা এর চারদিকে ঘিরে নির্মাণ করবো এক শহর এবং সংগঠিত করবো একটি সর্বাঙ্গ-স্বাধীন গন গোষ্ঠী। আমাদের কোনো প্রতিভার দরকার নেই। প্রতিভারা পরলোকগত। আমরা চাই শক্ত হাত, চাই দৃঢ় মনোভাব, যারা রক্ত-মাংসের তৈরী এবং ভূতপ্রেতদের নির্বাসনে পাঠিয়েছে।...

দিনটা গড়িয়ে চলেছে মনোরম ভঙ্গিতে। তানিয়াদের ব্যাল-কনিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। নিচের ড্রইংরুমে অনিমীত

হচ্ছে একটি নাটক। নাট্যকারটি বিশেষভাবে অসুস্থ। তার চুলগুলো নাড়ার তৈরী। তার মগজ ভর্তি খড়। তাঁর বউটিও একটি শোলার বউ—যদিও কানে খাটো। পুরো বাড়িটাই যেন একটা খড়ের বাড়ি। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি বোরিসের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার শেষ সমস্যা, ব্রেকফাষ্ট চুকে গেছে। আমি সব কিছু সহজ করে নিয়েছি। নতুন কোনো সমস্যা আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, আমি খপ্ করে তাকে ধরে নিয়ে নোংরা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিই। আমি আমার পয়সা-কড়ি এদিকে ওদিকে ছুঁড়ে ফেলছি। টাকা পয়সা দিয়ে আমি কি করবো? আমি একটি লিখন-যন্ত্র। যন্ত্রের অন্তিম যন্ত্রাংশটি লাগানো হয়েছে। কাজ এগিয়ে চলেছে তরতর করে। আমি একটি যন্ত্র।···

ওরা আমাকে নতুন নাটকটির প্রতিপাদ্য কি তা বলেনি। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি। তারা আমার খপ্পড় থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদিও তারা যা ভেবেছে তার আগেই আমি রাতের খাবার খেতে এসেছি। আমি জানতে চেয়েছি, কোথায় কি করবো? খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করেছি, আমি কি তাদের বিরক্ত করছি? আসলে আমি বলতে চেয়েছি, তোমরা কি আমাকে বিরক্ত করবে? এবং এটা তারাও যে বোঝে না, তেমন নয়। কিন্তু না হে আরশোলারা, তোমরা আমাকে বিরক্ত করছো না। আমি দেখি, ওখানে তোমরা পাশাপাশি বসে আছো। কিন্তু তোমাদের ওই সংলগ্নতা মূলত দু'টি উপ-

গ্রহের সংলগ্নতা। আর আমি তোমাদের দু'জনের মাঝখানকার যোগসূত্র।

তানিয়া এখন ক্ষেপে আছে—আমি জানি। সে-ও যে আমার ধাঁচ জানে না, তেমন নয়। আমার রাগের কথা সেও জানে। আমার কাছে তার দাম যে শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁচেছে, তাও আর তার অজানা নেই। সে আরো জানে, আজও আমি তার গাছের গোড়ায় পানি দিতে আসেনি। আমার ভেতরকার ধুমায়িত ক্ষোভ যে তাকেও বিস্ফোরিত করবে; তাও সে জানে। অবশ্য এসব বুঝতে তার একটু দেরী হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছে ঠিকই। সিলভেস্টার আজ খাবার টেবিলে তাকে আলিঙ্গন করবে। এমনকি সে আমার পাণ্ডুলিপিও পড়ছে। বুঝতে পারছি, আজ সন্ধ্যায় সমাবেশটি হবে অদ্ভুত। মঞ্চ সাজানো হয়েছে। আমি গ্লাসের টুংটাং শুনতে পাচ্ছি। এক্ষুনি টেবিলে মদের বোতল আনা হবে। সুরার ফোয়ারা ছুটবে আজ। এবং অসুস্থ সিলভেস্টারও আজ রীতিমতো সুস্থ হয়ে উঠবে। গত রাতে ক্রুনসত্রাদের সঙ্গে বসে আমি একটি ছক এঁকেছি। ছকটা হলো, অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি হচ্ছে নারীরা অবশ্যই দুঃখ ভোগ করবে। ওপরে ওপরে রমণী অবশ্যই রমণীয়। কিন্তু মঞ্চের পেছনেই তার জন্যে থাকবে আরো দুঃখ, আরো নির্যাতন, আরো দুর্গতি ও বিভীষিকা।

আর প্যারিস? প্যারিস হচ্ছে সম্পূর্ণ কৃত্রিম একটি রঙ্গমঞ্চ। একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ যাতে সব অঘটনের এক একটি খণ্ডাংশ

দর্শকের চোখে ঝিলিক দিয়ে যায়। প্যারিস হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুকে তুলে এনে ইনকিউবেটরের মধ্যে রাখা হয়। প্যারিস হচ্ছে যান্ত্রিকভাবে জন্ম নেয়া শিশুদের দোলনা। যে দোলনায় দোল খেতে খেতে সবাই মাটিতে পিছলে পড়ে কিংবা ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখে বার্লিন, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ভিয়েনা, মিনস্কে। দোলনাটা খালি হবার সঙ্গে সঙ্গে তাতে এনে শোয়ানো হয় নতুন বাচ্চা। তুমি এখানকার দেয়ালে দেয়ালে দেখতে পাবে লেখন: এখানে জোলা, বালজাক, দান্তে আর স্ট্রিণ্ডবার্গের মতো ব্যক্তিরা বসবাস করে গেছেন। তবে কি? না, কিছুদিনের জন্যে। ওঁদের মধ্যে একজনও এখানে মারা যাননি।

নিচতলায় ওরা কথা বলছে। ভাষাটা প্রতীকধর্মী। যেমন 'কষ্ট' শব্দটা উচ্চারিত হচ্ছে থেকে থেকেই। রোগাক্রান্ত নাট্যকার সিলভেস্টার বলছে: আমি 'মেনিফেস্টো'-টা এই প্রথম পড়ছি। এবং তানিয়া জিজ্ঞেস করেছে: কার লেখা? হ্যাঁ তানিয়া, তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি। আমি ওপরে বসে তোমার কথাই লিখছি। আরো কিছু বলো, যাতে সেসব কথা আমি আরো বেশী বেশী করে রেকর্ড করতে পারি। খাবার টেবিলে বসে তো ভালোভাবে নোট নেয়া যাবে না। হঠাৎ তানিয়া মন্তব্য করলো, এ-জায়গায় কোনো বড় হলঘর নেই! আর এ-বক্তব্যর অর্থ কি?

ওরা এখন দেয়ালে ছবি টাঙাচ্ছে। এটাও আমার আকৃষ্ট হবার

মতো ব্যাপার। ওদের ভাবখানা যেন এই, দ্যাখো আমরা এখানে কতো ঘরোয়া। কেমন সুন্দর দাম্পত্য-জীবন যাপন করছি। বাড়িখানাকে করে তুলছি কেমন আকর্ষণীয়। আমরা এমনকি ছবিগুলো সম্পর্কেও যুক্তিতর্কের অবতারনা করবো, যাতে তুমি উপকৃত হও। তানিয়া আবার বললো: সত্যি, চোখ মানুষকে কীভাবে প্রতারনা করে! বপারে, কতো বড় সমঝদার ওই তানিয়া। বলো, বলো, চালিয়ে যাও তোমরা ওই প্রহসন। আমি আজ ডিনারে এসেছি তোমার আমন্ত্রনেই। আমি এই কমেডি দারুণ এনজয় করছি। এখন দেখছি সিলভেস্টারই আবার লীড দিচ্ছে। সে এখন বরাওস্কির করা একটা গোয়াশের ব্যাখ্যা করছে: 'এখানে এসো। দেখতে পাচ্ছো? একজন লোক গীটার বাজাচ্ছে—বুঝলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একজন একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছে।' সত্যি, সিলভেস্টার। খুবই সত্যি। বরাওস্কি আর তার গীটার আর কোলের ওই মেয়েটি? অন্ততঃ একজন লোক আদপেই জানে না যে, সে কী কোলে নিয়ে বসে আছে। অথবা লোকটা কি সত্যি কোনো গীটার বাজাচ্ছে। নাকি বাজাচ্ছে না।···

শিগগীরই মলডফ ঘটনাস্থলে পদার্পন করবে। বোরিস হাসবে অসহায়ের হাসি। খাদ্য আর পানীয়ের আয়োজন হবে ভালোই। আঁজু আর মোটা চুরুট থাকবে যথারীতি। আর কনস্ত্রাদ যখন শেষ সংবাদটি পাবে তখন কিছুটা কঠিন এবং উজ্জ্বল ভাবে পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে যাবে।

কিছুক্ষণ পর সে তার চিন্তাধারা সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকবে, এবং চাই কি, একটা কবিতারও জন্ম হয়ে যেতে পারে। কবিতার এক বিশাল স্বর্ণঘন্টা যা কখনো বাজে না।

প্রায় ঘন্টাখানেক বিরতির পর আবার দুয়ারে করাঘাত। বাড়ি ভাড়া নিতে আসা নতুন কোনো লোক। ওপর তলায় পাজি ইংরেজটা আবার বাথের চর্চা শুরু করেছে। বাড়ি খুঁজতে এসে ওপর তলায় উঠে পিয়ানোবাদককে থামিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা কেমন যেন আদেশমূলক মনে হয়।

এলসা ফোন করেছে খাবারের দোকানে। মিস্ত্রি পায়খানার গামলায় নতুন সীট লাগাচ্ছে। ডোর বেলের শব্দে চটকা ভেঙে গেছে বোরিসের। রাগের চোটে সে ফেলে দিয়েছে তার চশমা। সে এখন তার হাঁটু আর হাতের ওপর। তার কোট গড়াগড়ি খাচ্ছে ফ্লোরে। ব্যাপারটা বেন গ্র্যাণ্ড গুই-গনলে মতো—যে গরীব কবি মুচির মেয়েকে পড়াতে আসতো। যতোবার ফোন বেজে উঠে, ততোবারই জিহ্বায় পানি আসে কবির। মালার্মের শব্দ বাজে এক রকম, আবার ভিক্টর হুগো অন্য রকম। এলসা বোরিসের জন্যে চমৎকার সুস্বাদু লাঞ্চের অর্ডার দিচ্ছে। বলছে: পর্কের একটা রসালো চপ। আমার চোখে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে শাদা, চর্বিদার, গোলাপী শুয়োরের গোশত সাজানো রয়েছে মার্বেলের ওপর। বেশ জমকালো একটা ব্রেক ফাষ্ট খেয়েছি সামান্য আগেই। কিন্তু প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার। এলসা এখনো ফোনে কথা বলে

চলেছে। সে বেকনের অর্ডার দিতে ভুলে গিয়েছিলো। এখন আবার বলছে, 'হ্যাঁ, এক টুকরো বেকন চর্বি যেন কম হয়।' কিছু মিঠে রুটি ছুঁড়ে দাও; ছুঁড়ে দাও কিছু পাহাড়ী ঝিনুক। পাঠিয়ে দাও কিছু ভূনা-কলিজাও। আমি এখন এক বৈঠকে সাবাড় করে ফেলতে পারি লোপে দে ভেগার পনেরো শো গান!

অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে এসেছেন এক সুন্দরী মহিলা। একজন আমেরিকান, অবশ্যই। আমি অবশ্য তাঁর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে আছি। জানালা দিয়ে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু ফোঁটা-গুলো বড় বড়। আমি ভাবছিলাম, পাখির ডানা দু'টি ভিজে গেলে সে উড়তে পারে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, কীভাবে এসব ধনী মহিলারা প্যারিসে আসে এবং সবগুলো ঢাউস স্টুডিও খুঁজে বের করে। স্বল্প প্রতিভা, স্ফীত মানিব্যাগ! বৃষ্টি নামলেই এরা নিজেদের ঝকঝকে নতুন স্নিকার দেখিয়ে চমক লাগায়। খাদ্য তো কোনো ব্যাপারই নয়। কখনো এরা এতো ব্যতিব্যস্ত থাকে যে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত পায় না। এই হয়তো পুঁচকে একটা স্যাণ্ডউইচ; কিন্তু তার জন্যে ঢুকতে হবে 'কাফে দে লা পয়' কিংবা 'রিজ বারে'! পুরোনো স্টুডিও 'পিউভিস দে শভানেস'-এর ভাবখানা যেন এই রকম: 'কেবলমাত্র ভদ্রলোকদের মেয়েদের জন্যে।' ওখান দিয়ে যাবার সময় ঠিকই দেখা যাবে, পয়সাওয়ালী মার্কিন মাগিরা রাজ্যের রংতুলি ক্যানভাস নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। স্বল্প প্রতিভা

—স্ফীত মানিব্যাগ!

স্প্যারো পাখিটা খাবার খুটে খুটে খাচ্ছে। আমেরিকান মহিলা এ-বাড়ির পায়খানাটি পরীক্ষা করে দেখছেন। টয়লেটটি আমি এসে ভালোভাবে দেখাবো কি; হে ভেলভেটমোড়া মহিলা? বোরিস হাতে হাত ঘষছে বিনীত ভঙ্গিতে। ভাড়াটে ঠিক হয়ে গেলো! বাইরের আঙিনায় কুকুর ঘেউঘেউ করছে। কেমন নেকড়ের মতো আওয়াজ কুত্তাগুলোর। ওপর তলায় মিসেস মেলভারনেস আসবাবপত্র সরাচ্ছেন। সারাদিন এটাই তার একমাত্র কাজ। এই নিয়েই আছেন। একঘেয়েমীতে ভুগছেন তিনি। বড্ড শুচিবাইগ্রস্থও। কোথাও একটা কুটো পড়ে থাকলে সারা বাড়ি ধোয়া মোছা করবেন। টেবিলের ওপর একগুচ্ছ সবুজ আঙুর। আর এক বোতল মদ। বোরিস বলছে: 'হ্যাঁ, আপনার জন্যে একটা ওয়াশ্‌স্ট্যাণ্ড বানিয়ে দেবো। প্লিজ এখানে এসে দেখুন। হ্যাঁ, এই, এই তো টয়লেট। এটি দ্বিতল টয়লেট কিন্তু! হ্যাঁ, মাসে এক হাজার ফ্রাঁ! কি বলছিলেন? উত্রিলোকে আপনি খুব একটা পাত্তা দেন না? না না, ওটা নয়, এইটা। অবশ্য এখানে একটা নতুন ওয়াশার লাগাতে হবে। ব্যাস্‌!...'

মেয়েটি চলে যাচ্ছে আপাতত। কুত্তার বাচ্চা বোরিস মেয়েটার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত করিয়ে দিলো না। কোনো মহিলা ধনী হলেই বোরিস আমাকে তাঁর থেকে তফাতে রাখবে। অর্থাৎ পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে যাবে। কয়েক মিনিটের

মধ্যেই আমি আবার বসতে পারবো টাইপ-রাইটারের সামনে। বড়ো বিচ্ছিরি লাগছে আমার। দুশ্চিন্তা হচ্ছে, মহিলা যে কোনো সময় আবার ফিরে আসবেন—এবং আমার পাছার নিচ থেকে চেয়ারটিও আবার অপসারিত হবে। একটা লোক কী ছাইপাশ লিখবে, যখন তার জানা নেই, আধঘণ্টা পর সে কোথায় বসে লিখবে? বড়লোক মেয়েমানুষটা যদি ঘরটা নিয়েই নেয়, তাহলে লেখা তো দূরের কথা, আমার শোবার জায়গা পর্যন্ত থাকবে না! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, এমন বিদঘুটে পরিস্থিতিতেও মানুষ পড়ে? একটা লোকের কাজ করার জায়গা নেই, শোবার জায়গাও নেই! ভাবা যায়, অবশ্য একজন মানুষ যে কোনো জায়গায় শুতে পারে। কিন্তু কাজ করার জন্যে একটি জায়গার দরকার অবশ্যই রয়েছে। হতে পারে কাজটি, মানে লেখাটি, মাস্টারপীস নয়। আরে মিয়া, একটা বাজে নভেল লিখতে গেলেও তোমার বসার জন্যে একটা চেয়ার লাগবে, দরকার হবে কিঞ্চিৎ নিরিবিলি পরিবেশ। খানিকটা নিভৃতি। ওই ধনী যোনিটা অবশ্য এ-সমস্যার কিছুই জানে না। চিন্তাই করতে পারে না। এরা যখনি নিজেদের নরম পাছাটা কোথাও রাখতে চায়, তক্ষুনি একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে আসে।

কাল রাতে সিলভেস্টারের পরনে ছিলো পাজামা। মলডফের দু'ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। সিলভেস্টার কমলার খোসা ছাড়াচ্ছিলো। খোসাগুলো সে রেখে দিচ্ছিলো কোটের ওপরেই।

মলডফ´ তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইছিলো, একবার 'দ্য গেট্‌স অফ হেভেন' নামক প্যারোডিটা সে পড়বে কিনা। আমরা উঠি উঠি করছি। আমি আর বোরিস। অবশ্য রোগের গন্ধ ভরা ঘরটা আমাদের আনন্দিত করে তুলেছিলো। তানিয়া যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। তার খুশির কারণ সে আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছে। বোরিসের উৎফুল্লতার হেতু মলডফে´র ভেতরকার ঈশ্বরটির মৃত্যু ঘ'টছে। আর আমি খুশি এ-জন্যে যে, আমরা আর একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি।

মলডফ´ বললো, 'সিলভেস্টার, আমি কি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি? অন্ততঃ যদ্দিন তুমি সেরে না ওঠো?' মলডফ´ গত ছ'দিন ধরে সিলভেস্টারের কাছে আছে। ওষুধ কিনে আনছে, পথ্য জোগাড় করছে। হেথা হোথা ছোটাছুটি করে নানা রকম কাজে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তার অবস্থা সেই জংলীর মতো রাতে যার আরাধ্য দেবমূর্তির অঙ্গহানি ঘটেছে। আর তাই সে খাদ্য-পানীয় ফলমুল নিয়ে সেই মূর্তির পায়ে ভোগ দিচ্ছে। কথা বলছে যেন প্রার্থনার সুরে। তার শরীর ভেঙে পড়েছে। বসে গেছে গলার স্বর। তানিয়ার সঙ্গে সে এ-রকমভাবে কথা বলছে, যেন দেবীর সঙ্গে কথা কইছে।ব লছে: সিলভেস্টার হচ্ছে তোমার দেবতা। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছো। কথা বলতে বলতে সে ফেলছে দীর্ঘশ্বাস। বলছে: তুমি নিজেকে নষ্ট করছো। তার মুখ ছাইয়ের মতো শাদা। একই সঙ্গে খাওয়া এবং কষ্ট করার অভ্যেস তার আছে। আবার

হয়তো তানিয়ার চুল হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলবে : আমি আস্তে আস্তে তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। তুমি আমার ফ্যানির মতোই অনেকটা।

অন্যদিকে আজকের দিনটি ভিন্নদিক থেকে মলডর্ফের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। আমেরিকা থেকে একটা চিঠি এসেছে এইমাত্র। মোয়ে সব সাবজেক্টেই 'এ' পাচ্ছে। মারের সাইকেল চালানো শেখা প্রায় শেষ। মেরামত করা হচ্ছে ভিক্ট্রোলিটিও। তবে চিঠি পড়বার সময় ওর মুখভঙ্গিতেই মনে হচ্ছিলো, সংসারের সমাচার ছাড়াও তাতে এমন কিছু আছে যা একান্ত ব্যক্তিগত। নিতান্ত অন্যরকম। এটা প্রায় নিশ্চিত যে আজ দুপুরের মধ্যে মলডর্ফ তার ফ্যানির জন্যে অন্ততঃ ৩২৫ ফ্রাঁর গয়না কিনবে। আর চিঠির জবাবে বিশ ঘণ্টার একটি পত্র তো বটেই। যাকে বলে পত্রবিলাস। মলডর্ফ গলদঘর্ম হয়ে চিঠি লিখবে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এনে দিচ্ছে চাকর। বারবার কালি ভরে দিচ্ছে কলমে। যোগান দিয়ে চলেছে কফি আর চুরুট। অবশ্য এর জন্যে আছে চমৎকার বকশিস। মলডর্ফ নিশ্চয়ই তার ডায়েরীতে লিখবে : এর সবকিছুই আমার ফ্যানির জন্যে। হার এবং দুল কেনার জন্যে পকেটের শেষ পয়সাটিও খরচ করবে মলডর্ফ। তাই তো, খরচ করবে না কেন? জার্মেইন আর ওদেত্তির মতো ছুঁড়িদের পেছনে পয়সা ওড়ানোর চেয়ে ফ্যানির জন্যে খরচ করা অনেক ভালো। তানিয়াকে এই কথাই বলেছে। এমনকি তোরঙ্গ খুলে দেখিয়েও

দিয়েছে। ফ্যানি, মোয়ে আর মারের জন্যে নানা রকম উপহার-সামগ্রীতে বাক্সটি ঠাসা।

: আমার ফ্যানি পৃথিবীর অন্যতম বুদ্ধিমতী মহিলা। আমি তার ভেতরে বোকামির ছিটেফোঁটা খুঁজতে গিয়েও হয়রান হয়েছি।

: সে নিখুঁত! শোনো, তার কৃতিত্বের কিছু নমুনা বলি। সে ব্রীজ খেলতে পারে হাঙরের মতো। ইহুদীবাদ সম্পর্কে উৎসাহ আছে। তুমি তাকে একটা ছেঁড়া হ্যাট দাও এবং দ্যাখো তা দিয়ে সে কী করে? একটা ফিতে এবং একটু নাড়াচাড়া—ব্যাস্—খাসা জিনিস। ভাবতে পারো? পরম সুখ কাকে বলে, তা জানো? সত্যিকার সুখ? ফ্যানির পাশে বসে থাকায়। বাচ্চারা হয়তো তখন বিছানায়। রেডিও শুনছি। ফ্যানির মুখে কোনো কথা নেই। সে চুপচাপ প্রোগ্রাম শুনছে। ওর ও-রকম শান্তি ও স্বস্তিতে বসে থাকার জন্যেই তো আমার বেঁচে থাকা, আমার জীবন-সংগ্রাম। সন্ধ্যায় মপারনাস এলাকায় তোমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি আর একই সময় সেই বে রিজে ফ্যানির পাশে চুপচাপ বসে থাকার মধ্যে কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দুটোর মধ্যে কিছুতেই আমি মিল খুঁজে পাই না। তেমন কিছু নয়। সামান্য ক'টা জিনিস। কিছু খাদ্য, বাচ্চাগুলো, মৃদু আলো—আর ফ্যানি সেখানে বসে আছে। হয়তো কিছুটা ক্লান্ত, কিন্তু কতো উৎফুল্ল! আর কিছুই নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা ওই-ভাবে নিঃশব্দে বসে থাকা—এটাই পরম সুখ!

: আজ আমি ওর যে-চিঠিটা পেয়েছি, তা নিরস সাংসারিক রিপোর্ট নয়। সে অত্যন্ত সহজ ভাষায়, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে, বাচ্চারা অবশ্যই পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। কিন্তু খরচ যা বাড়ছে। চিন্তার ব্যাপার এটাই। ছোট্ট মারেকে ইশকুলে ভর্তি করতে দরকার হবে হাজারখানেক ডলার। অবশ্য মেয়ে তো একটা স্কলারশিপ পাবেই। কিন্তু মারে? মারেও তো আমার ফ্যালনা ছেলে নয়—বেশ ভালো ছাত্র সে। তার জন্য আমরা কী করছি? তবে হ্যাঁ, আমি ফ্যানিকে লিখে দিয়েছি, চিন্তার কিছু নেই। মারেকে ইশকুলে পাঠাও। হাজার ডলারের মামলাই তো? সে ম্যানেজ হয়ে যাবে। আমি এ-বছর এতো টাকা রোজগার করবো যা জীবনে কখনো করিনি। পুঁচকে মারের জন্যে এটা আমাকে করতে হবে। কেননা ছেলেটা জিনিয়াস।

ফ্যানি যখন ট্রাঙ্কটা খুলবে, আমি তখন নিশ্চয়ই হাজির থাকবো সেখানে। আমি হয়তো ভেতর থেকে একটা জিনিশ বের করে তাকে বলবো, দ্যাখো ফ্যানি, এটা কিনেছি বুদাপেস্টে—এক বুড়ো ইহুদীর কাছ থেকে।···এই চমৎকার পশমী জিনিসটা বুলগেরিয়ায় তৈরী হয়। খাঁটি উল। এটা ছিলো অমুক ডিউকের···তুমি রোদ্দুরে ব্যবহার করবে। আর অপেরায় যাবার সময় অবশ্যই এটা তোমাকে পরতে হবে। এবং এই যে জিনিষটা তুমি দেখতে পাচ্ছো, এটা দিয়েছে তানিয়া··· মেয়েটা অনেকটা তোমার মতোই।

৩

রোববার। দুপুরের একটু আগে আমি চলে এসেছি ভিলা বোর্হেস ছেড়ে। মনটা খুব দমে গেছে। কারণ ঠিক ওই সময়টাতেই যেতে বলেছে বোরিস। সে জানে, আমি খিদেয় চোখে সর্ষেফুল দেখছি। অথচ ও আমাকে খেতে ডাকলো না। কেন ডাকলো না, কে জানে। সে বলে, তার কুলোয় না। কিন্তু এটা একটা কৈফিয়ৎ হলো? যাই হোক আমি খুব দুঃখিত হয়েছি। আমাকে অভুক্ত বসিয়ে রেখে নিজে খাবার সময় হয়তো সে বেদনা বোধ করছে। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলে বেদনাটি আরো গভীর হতো। যা হোক, এটা সম্পূর্ণ তারই ব্যাপার।

কনসত্রাস্তদের বাসায় গেছি। ওরা সবাই খেতে বসেছে। মুরগির ঝোল আর ভাত। ওদের ধারনা, ইতিমধ্যে আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। বাচ্চাটির হাত থেকে ছিঁড়ে একটু মাংস নিয়ে নেবো কিনা, চকিতে এ-চিন্তাটা ঝিলিক দিয়ে গেলো মনের মধ্যে। আমি ভাবছিলাম। অবশ্য ওদের সঙ্গে বসে পড়ার জন্যে ইতিমধ্যে ওরা বার দুয়েক বলেছে আমাকে। কিন্তু

না না। এমনকি এক কাপ কফিও আমি খাবো না। অভিমানে আমার বুক ভরে গেছে। আমি বাইরে চলে এলাম। আসবার সময় মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে গিয়েছিলো বাচ্চাটার বোন্-প্লেটে রাখা হাড়গুলো। ইস্, এখনও কতো মাংস লেগে আছে।

উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি, কী চমৎকার দিনটি। তবুও রু দ্য বুসি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে নড়াচড়া করছে। বারগুলো খোলা! বাইরে সার দিয়ে রাখা সাইকেল। মাংস আর সব্জীর বাজারে বেচাকেনা জমজমাট। খবরের কাগজ দিয়ে বানানো প্যাকেটে অস্ত্র ভরে নিয়ে চলাচল করছে ট্রাক। একটি সুন্দর ক্যাথলিক-রোববার! অন্তত এই সকালে এ-কথাটি অনায়াসে বলা যায়।

মধ্য দুপুর। অথচ এখনো আমার পেটে কিছুই পড়েনি। আমি এমন কতগুলো সরু অলিগলি সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, যেখান থেকে বাতাসে ভেসে আসছে খাবারের ঘ্রাণ। আমার উল্টোদিকেই হোটেল দ্য লুইজিয়ানে। হোটেল, খাদ্য। আর আমি দাঁড়িয়ে আছি শূন্য উদরে। রোববারের এই রাস্তাগুলো যেন জ্বরে আক্রান্ত। এ-রকম আর কোথাও হয় না—কিছুটা হয় সম্ভবত ইস্ট সাইড কিংবা ব্যাথাম স্কোয়ারে। দ্য রু দে ল' ইসাউদে যেন উপচে পড়ছে। আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলোর প্রতিটি বাঁকেই তুমুল প্রাণচাঞ্চল্য। সব্জীর গোছা হাতে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘ কিউ। খাদ্য খাদ্য। চারদিকে

কেবল খাদ্য। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে সবাই।

স্কোয়ার দে ফ্রস্তেঁবুর্গ এখন কতো অন্যরকম। অথচ সেদিন রাতে যখন এখান দিয়ে যাই, জায়গাটা কী নির্জন, কী চুপচাপ। স্কোয়ারের ঠিক মধ্যেখানে চারটে ব্ল্যাক টি—যাতে এখনো ফুল ধরতে শুরু করেনি। পাথরে বাঁধানো চত্বরে দাঁড়ানো আঁতেলেকচুয়াল গাছ! টি, এস, এলিয়টের কবিতার মতো। ঈশ্বরের দোহাই, ম্যারিয়ে লরেসেঁ এখানে সদলবলে এস লেস-বিয়ানদের দুর্দান্ত একটা আখড়া বানাতে পারে। 'ত্রেস লেস-বিয়েনে ইসি!' শুষ্ক নিষ্ঠুর গাছ। বোরিসের হৃদপিণ্ডের মতো রসকষহীন! খোলা চত্বরের ওপর বৃদ্ধ, ইতর, খঞ্জ ইত্যাকার ফালতু লোকের জটলা। এরাও খাবে। ডিনার বেল বাজবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেতে ছুটবে সবাই। গ্যালেরি জ্যাক-এর পায়ের ওপরেই কোন শিল্পী যেন ভূ-মণ্ডল এঁকে রেখেছে। একজন আঁকিয়ের ছবিটা! উদ্ভট ছবি। মনে হয় বাঁ দিকটায় আঁকা হয়েছে একটা নোঙর। এবং—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ডিনার-বেল্। সালামালেকুম ভূ-মণ্ডল!

ঘুরছি এখনো। দুপুর গড়িয়ে যায়। বৃষ্টি শুরু হলো। নোতর-দেমের গম্বুজটা যেন পানির ভেতর থেকে ভেসে উঠছে। বেড়াল-গুঁফো এক বুড়ো হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতে এক গাদা বই। জ্যাওরস্কি বিরচিত। পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে বুড়ো আমাকে তার পেছনের বইয়ের দোকান দেখিয়ে দিলো। বৃষ্টির ছাটে ওর মুখখানাকে মনে হচ্ছে

ভেজা হলুদ বেলে-মাটির মতো। বইয়ের দোকান; কিন্তু রাউল ডুফির আঁকা ছবিও কিছু সাজানো সেখানে। বাবা, ছবিও বটে! গোলাপ-বন ভেদ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন মস্ত মহিলা হোয়ান মিরোর দর্শন অনুযায়ী গ্রন্থ ও চিত্রের যুগল-বন্দী? দর্শন! ভাবুন একবার।

একই জানালায়—'খণ্ডিত একজন'। প্রথম অধ্যায়: একজন মানুষ তার পরিবারের চোখে। দ্বিতীয় অধ্যায়: একই লোক তার রক্ষিতার দৃষ্টিতে। তৃতীয় অধ্যায়—না, তৃতীয় অধ্যায় আজ নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কী থাকবে, তা আগামীকাল এসে দেখুন। অর্থাৎ প্রতিটি দিন নতুন নতুন পৃষ্ঠার প্রদর্শনী। 'খণ্ডিত একজন!'···আপনি কি ভাবতে পারছেন, এ-মুহূর্তে নিজের ওপর আমি কীরকম খাপ্পা হয়ে উঠেছি? এই রকম একটা মোক্ষম শিরোনাম আমার মাথায় আসে না কেন, বলুন তো!

কোথায় সেই লিখিয়ে, যে লিখতে পেরেছে এমন বই? কে সে? কোথায় থাকে? আমি তার সামনে নতজানু হবো। যীশুর কাছে জানতে চাইবো, কেন তিনি আমাকে 'ক্ষিপ্ত শিশ্ন' বা এ রকম পচা কোনো শিরোনাম ছাড়া অন্য কোনো ভালো শব্দ নির্বাচনের বিদ্যে দেননি! লেখককে সত্যি অভিনন্দন জানানো উচিত। আমি তাকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

এখন সুন্দর শিরোনামের জন্যে আমি তার সৌভাগ্য কামনা করি। এটি তোমার আরেক অধ্যায়ের জন্যে। তোমার আরেক

বইয়ের জন্যে। যে কোনোদিন আমার কাছে ফোন কোরো। আমরা বসবাস করি ভিলা বোর্হেসে। আমরা সবাই মৃত। অথবা মারা যাচ্ছি কিংবা এক্ষুনি মরবো। আমাদের ভালো শিরোনাম দরকার। আমরা চাই মাংস—টুকরো টুকরো মাংস। রসালো টকটকে কিডনী, পাহাড়ী ঝিনুক আর মিষ্টি রুটি।

একদিন আমি দাঁড়িয়ে আছি ব্রডওয়ে আর ফরটি সেকেণ্ড স্ট্রীটের সঙ্গম স্থলে। সেদিনও আমি শিরোনাম মনে করবার চেষ্টা করছিলাম। আমার নুড্‌লে যা যা ব্যবহৃত হয় আমি সেই জিনিসগুলোর নাম পরপর সাজাচ্ছিলাম। ক্যাভিয়ার, বৃষ্টির পানি, চর্বি, সেমাই, যকৃতের টুকরো। এবং আমি কাউকেই বলবো না, হঠাৎ তক্ষুনি আমি বাড়ি ফিরে কেন আমার মেয়েকে কেটে দু'টুকরো করলাম!

একটা লোক অনাহারী হয়েও কিভাবে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। আর এ-অবস্থায় তখন তার লিঙ্গই বা উত্তেজিত হয় কি করে? রহস্যময় এই প্রশ্নটির জবাব দিতে পারেন অবশ্য একজন শারীরতত্ত্ববিদ! কেবল শারীরতত্ত্ববিদ নয়—'আত্মার শারীর-তত্ত্ববিদ!' রোববারের বিকেলে। দোকানপাটে শাটার নামানো। রাস্তাঘাট চলে গেছে প্রলেতারিয়ে তদের দখলে। বিদঘুটে এই জন-সমাবেশকে ক্যানসারে আক্রান্ত বিশাল শিশ্নের মতো মনে হয়। বিশেষ করে এই দু'টি রাস্তা—রু সাঁ্যা দেনি আর ফবুর্গ। ধরা যায় ফবুর্গ টেম্পলের কথাও। যা নাকি পুরোনো দিনের ইউনিয়ন স্কোয়ারের মতোই মানুষকে

আকর্ষণ করে। অথবা বাউয়ারীর একটি অংশ—যেখানে আবছা যাদুঘরের শো উইণ্ডোতে সাজানো থাকে মোমের তৈরী মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বিশেষ করে যৌন রোগীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যা বিনষ্ট হয়েছে সিফিলিসে। কিংবা অন্যান্য যৌন ব্যাধিতে নগরীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই রোগাক্রান্ত।

প্লেস দু কমবাৎ-এর কাছে সাইতে নোতিয়েরে আমি দাঁড়িয়ে আছি সামনের সম্পূর্ণ দৃশ্যটিকে পান করবার জন্যে। প্রাচীন প্যারিসের একটি বিচিত্র অংশ। চত্বরটির মাঝখানে একটি পুরোনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। একদিকে শুকনো আবর্জনার সমুদ্র। সূর্য দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। রং মরে আসছে সবকিছুর। উজ্জ্বল লাল পরিণত হচ্ছে শুকনো রক্তে, ধূসর রূপান্তরিত হচ্ছে পারাবত-বিষ্ঠায়। এখানে ওখানে প্যাঁচার মতো জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে কয়েকটা দানো। হাড় জিরজিরে ছেলেমেয়ে তারস্বরে চ্যাঁচামেচি করছে। প্রতিটি দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিষন্নতা। ইউরোপ। মধ্যযুগীয়. দৈত্যাকার! বি-মলে সুরের ঝংকার রাস্তার মোড়েই সিনে কমবাৎ তার দর্শকদের জন্যে উপার মেলে ধরছে—'মেত্রোপলিশ!' মনে পড়ছিলো একটা বইয়ের কথা শহর ভরে গেছে লাশে আর মুর্দাফরাসে। পোকা কিলবিল করছে চারদিকে। শহরতলির প্যাঁচারা উড়ে আসছে সেগুলোকে খুঁটে খুঁটে খাবার জন্যে। তাদের সঙ্গদান করছে কালো মৃত্যু। এমন সময় ইংরেজরা এলো কুচকাওয়াজ করতে করতে। তারা সমস্ত সমাধি জুড়ে স্তম্ভ তৈরী করে দিলো।...শার্ল দ্য সিলির

শাসনামলের প্যারিস।—দুর্দান্ত বই। এখনো যেন বইটি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রেনেসাঁর উদ্যাতাদের সম্পর্কে আমার ধারনা ক্ষীণ। কিন্তু মাদাম পিপারনাল, লে বেলে বুলাঁগেরে, মাইৎরে জেহাঁ কারপোরেৎ—লেগর কিভরে—আমাকে দখল করে রেখেছে এখনো পর্যন্ত। দ্য ভয়াণ্ডারিং জু-এর প্রতিভাবান শয়তান রদাঁর কথাও কি ভোলবার মতো? পুড়িয়ে মারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যে চালিয়ে গেছে নিজের কালো তৎপরতা! স্কোয়ার দু' টেম্পলের এক ধারে বসে আমি ভাবছিলাম শার্ল দ্য সিলির মর্মান্তিক পরিণতির কথা। রু দা লিয়োঁর পাথরের ওপরে তিনি পোষ্যদের খেতে দিতেন। ওদেতি দে শাম্পদিভার আর তার 'নিচু জাতের' সাঙ্গ-পাঙ্গরাই ছিলো শার্লের একমাত্র শত্রুগোষ্ঠী।

কোনো এক রোববারের বিকেলেই জার্মেইনের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার। বুলেভার বিওমার্কাইজে আমি ঘোরাঘুরি করছিলাম। পকেটে চকচকে একশো ফ্রাঁ। বউ পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া ছিলো। বিষাক্ত অসুস্থ বসন্ত—যাকে ম্যানহোলের ভ্যাপসা দুর্গন্ধের মতোই মনে হয়। রাতের পর রাত আমি বিচরন করেছি এই কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত, জরাজীর্ন রাস্তায়। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বেশ্যারা এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন মরা জীবজন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভক্ষনের আশায় গৃধিনীরা প্রস্তুত। যেই একটা লাশ মিলছে, তক্ষুনি সেটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে

যাচ্ছে বারান্দায়। এই খুনি খানকিরা কারবার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে। এমনকি প্যান্টের বোতাম লাগাবার সময়টুকুও দেবে না। বিচিত্র ব্যাপার। পায়রার খুপরির মতো ঘর। তাতে কোনো জানালা পর্যন্ত নেই। তারা তোমাকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়বে ত্বরিৎ গতিতে। বসাবে স্কার্ট ডাঁই করা বিছানার ওপর। এক পলকে জরিপ করে নেবে তোমার মুখ। ফ্লাই খুলে তোমার নুনুতে থুথু দেবে এবং তা সরাসরি সেট করবে জায়গা মতো। হয়তো যখন তুমি পেচ্ছাপ করছো—তখনি আর এক ক্যাণ্ডিডেট দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। লিঙ্গটা মুঠোর মধ্যে ধরা। তার যেন আর তর সইছে না।

অবশ্য জার্মেইনের কথা আলাদা। তার চেহারার বিশেষত্ব বর্ণনা করার দরকার নেই। কাফে দে এলিফ্যান্টে রোজ দু'বেলা যে মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়, জার্মেইনের সঙ্গে তাদের তফাৎ করা মুশকিল। বলেছি, সময়টা বসন্তের এবং আমার পকেটে বউয়ের পাঠানো ফ্রাঁগুলো ছটফট করছে। এমন সময়েই ওর সঙ্গে মোলাকাৎ। দরদস্তুর ঠিক করতে ঝামেলা হলো না। রু আমেলোয় একটা রুম নিয়ে নিলাম পাঁচ ফ্রাঁ ভাড়ায়। পর্দা নামিয়ে দিলাম জানালার। কাপড়-চোপড় খুলে ফেললাম। এই মেয়েটিও নির্ঝঞ্ঝাট। কোনো গ্যাঞ্জামে নেই। আমার নিকার বুকারের প্রশংসা করলো সে। সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে সে আমার সামনে দাঁড়ানো।

কিন্তু কথা বলছে খুব স্বাভাবিকভাবে। এক সময় সে হাতের তোয়ালেটা ফেলে দিলো এবং অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো আমার দিকে। সে তার পুষির ওপর হাত বুলোচ্ছিলো আদরের আদলে। মৃদু মৃদু চাপড় দিচ্ছিলো থেকে থেকে। বস্তুতঃ সে যেভাবে আমার সামনে একটা গোলাপ-ঝাড় তুলে ধরলো, তা অবিস্মরণীয়। সে এমন ভাবে কথা বলছিলো যেন এই সম্পদ কিনতে হয়েছে তাকে চড়া দামের বিনিময়ে। এ এমনি এক মহার্ঘ বস্তু, যার দাম ক্রমশই বাড়ে। এবং যার দাম তার কাছে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ।

তা, বাড়িয়ে বলেছে কি মেয়েটি? সত্যিই তার দেহখানা অমূল্য এক সম্পদই বটে একটা ধনাগার। একটা ম্যাজিক। একটি বিধি-দত্ত সম্পত্তি। যার বিনিময়ে সে অর্জন করছে রূপোর টুকরো। যাই হোক, জার্মেইন বিছানায় শুয়ে দুই পা ফাঁক করলো দু'দিকে। সে তার যোনির মধ্যে কয়েকটা টোকা দিলো। সর্বক্ষন আমি শুনলাম তার যৌন গুঞ্জন। তার কণ্ঠস্বরও কী ভয়ানক কামোদ্রেককারী। একটি ধনাগার। সত্যি একটি দৌলতখানা। তাঁর ছোট্ট যোনিটি কতো সুন্দর!

হোটেলের বাইরে পা দিতেই আবার সেই বিষাক্ত নিঃশ্বাস। বসন্তের হাওয়া। বেশ্যাটার দিকে তাকালাম। দিনের আলোয় আমার চোখে পড়লো তার সোনা বাঁধানো দাঁত। হ্যাটে জেরানিয়াম। গায়ে উগ্র ধরনের হাই হিল! সত্যি

বলতে কি, পাওনা মেটাবার পরেও তাকে চমৎকার একটা লাঞ্চ খাওয়াতে, সিগ্রেট অফার করায়, কিংবা ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়ায় আমি বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিনি। বরং এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহই ছিলো তার চেয়ে বেশী। আমি ওর সঙ্গলাভে এতো বেশী তৃপ্তিলাভ করেছিলাম যে, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আবার ওকে হোটেলে নিয়ে আরো একটা শট্ লাগালাম। সেই জার্মেইন, সেই গোলাপের বাগান! এবারের সহবাসে ছিলো যেন 'ভালোবাসার ছোঁয়া!' আমি গোলাপ এবং জার্মেইনকে আলাদা আলাদা-ভাবে ভালোবাসলাম। আবার ভালোবাসলাম এক সঙ্গেও। সত্যি, সে, জার্মেইন ছিলো অন্যরকম। পরে যখন সে আমার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলো, তখন গভীর মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলো। নিজের পয়সায় মদ খাইয়েছে। বাকিতে লাগাতে দিয়েছে। ওর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে—আরো কতো কি! রাতের পর রাত আমি ঘুরে বেড়িয়েছি বুলেভার বিউ মার্কাইজে। কতো প্রতিক্ষা করেছি, যাতে ওর মূল্যবান সময়ের একটুখানি ফাঁক পেয়ে ও আমাকে খানিকটা সঙ্গ দিয়ে ধন্য করে!

কিছুদিন পর আমি যখন ক্লদ সম্পর্কে লিখতে বসেছি, তখন ভাবছিলাম কিন্তু জার্মেইনের কথাই। অবশ্য দু'জন এক রকম নয়। তবে আমি ক্লদেরও অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। মাঝে মাঝে তো এরকমই মনে হতো যে আমি তাকে ভালোও

বুঝি বাসি। ক্লদের মনটা ছিলো পরিষ্কার! কিছুটা মার্জিতও ছিলো মেয়েটি। একজন বারবনিতার জন্যে যেগুলো খুব দোষের ব্যাপার। অমন বিষন্নতা কি কোনো বেশ্যার মানায়? লুই ফিলিপের সেই মারাত্মক বর্ণনা যেন ক্লদের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠতো:—'আর রাত্রি নেমে আসতো সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর। যখন অসংখ্য চোয়াল বন্ধ হয়েছে আমাদের ওপর। আমাদের যখন উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। এবং আমাদের মাংসগুলো ঝুলছে আমাদের দেহের ওপর···!' বস্তুতঃ ক্লদ তার নিজের জন্যে একটা আলাদা জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলো।

জার্মেইনকে কি আমি সত্যি ভালোবাসতাম? না, তা নয়। তাকে ভালোবাসার কথা মনে করলেই আমি কল্পনায় দেখতে পেতাম একটা অতিকায় মাকড়শাকে। আমি তো আসলে জার্মেইনকে ভালোবাসিনি। ভালোবেসেছিলাম একটা গোলাপের ঝোপকে। সে সময় আমি যে কোনো মেয়ের দিকে তাকালেই দেখতে পেতাম যেন জার্মেইনকে। ক্লদ তার খদ্দেরের জন্যে প্রতীক্ষা করতো বসে বসে—মুখে চকোলেট। কিন্তু জার্মেইন তার মক্কেলকে বগলদাবা করে নিয়ে হোটেলে ঢুকতো। জার্মেইনের মোজা ছিঁড়ে গিয়েছিলো। জুতো জোড়ায় তালি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, বারে ঢুকে কী সাহসের সঙ্গে সে বড়া মদের অর্ডার দিচ্ছে। এক চুমুকে তা শেষ করে আবার চলে যাচ্ছে বাইরে। তার নিঃশ্বাসের

সঙ্গে বাইরে ভেসে বেড়াতো কফি, কনিয়াক আর পারনদের ঘ্রান। বারবার নতুন নতুন খদ্দরকে সঙ্গ দেবার শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের জন্যে জার্মেইন অনবরত পান করতো যতো ছাই-পাঁশ। কিন্তু ক্লদের কারবার সম্পূর্ণ উল্টো। যখন তুমি তাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছো—তখনো তার সঙ্কোচ। একবার ন্যাংটো হবার সময় যখন সে সলজ্জভাবে আমাকে অন্য দিকে তাকাতে বললো, আমি তো হতভম্ব! কিন্তু এক-জন বেবুশ্যের জন্যে এটা মারাত্মক ভুল। খরিদ্দার যখন মাল কেনে, তার মন্দ-ভালো ঠিকঠাক বাজিয়ে দেখে। সব ঠিক মতো তলিয়ে দেখে। এমনকি একটা নটির যৌনাঙ্গ কী-ভাবে ভিজে ওঠে, তা-ও অনেক মক্কেল দেখতে চায়। কিন্তু বিছানার ব্যবসাতে কোনো বেশ্যার মুখে নীতিবাক্য সম্পূর্ণ বেমানান। যেন লাশের মুখে জীবনের জয়গান! তবে জার্মেইনের ব্যাপার আলাদা। দেহ-ব্যবসাতে সে সমর্পন করেছিলো তার দেহমনপ্রাণ!

৪

ইস্টার এলো হিমায়িত খরগোশের মতো। অবশ্য শয্যার উষ্ণতা এ-সময় সত্যি অনন্য। কালো চোখের হুরীদের আনাগোনায় সাজেলিজেঁ এখন অপরূপা। পালাইস দু' লুভর থেকে এতোয়েল পর্যন্ত এলাকাটা যেন এক টুকরো সঙ্গীত। গত পাঁচ দিন যাবৎ আমি একবারও টাইপ-রাইটারের সামনে বসিনি। ওল্টাইনি কোনো বইয়ের পাতা। আমেরিকান-এক্সপ্রেসে যাতায়াত ছাড়া এ-কয়টাদিন অন্য কিছু ভাববারই সুযোগ মেলেনি আমার। আজ সকাল ন'টায় যখন ওই ব্যাঙ্কের দরজাটি কেবল খোলা হচ্ছে, তখন এবং দুপুর একটায় একবার—মোট দু'বার গিয়েও কোনো কায়দা হয়নি। কোনো খবর নেই টাকা পয়সার। বিকেল চারটের সময় ভাবলাম, আর একবার ঢুঁ মেরে দেখলে কেমন হয়?

সাজেলিজেঁ-তে পা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাজারো আইডিয়া কিলবিল করে ওঠে মগজের মধ্যে। কিন্তু আমি এমন বড়-লোক নই, যে তার সঙ্গে সব সময় একজন সেক্রেটারী রাখবো। আশপাশের দৃশ্যাবলি দেখে দেখে তার মনে যেমন

ভাবের উদয় হবে, সে মুখে মুখে অনর্গল তা বলে যাবে, আর তার সেক্রেটারী চলমান অবস্থাতেই তা টুকে নিতে থাকবে ক্ষিপ্র হাতে। মুশকিল হয়েছে এই, যখন আমি লেখার টেবিল থেকে অনেক দূরে থাকি, লেখার মুড আমার তখনি চাগিয়ে ওঠে।

আমার স্বাস্থ্যটি ভালো। যদিও স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। আমার স্বাস্থ্য যে ভালো, সে-ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই। আমার থাকবার মধ্যে আছে তো এই একটি জিনিষই। কিন্তু কার্ল ইদানীং খুব হতাশ। প্রায় ভেঙে পড়েছে সে। তার মতে, সে অসুস্থ! কথাটা আমি বিশ্বাসও করি। কিন্তু সত্যি বলতে কি—এ-ব্যাপারে আমার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। আমার কিছু যায় আসেও না। আমি ওর কথা শুনে কেবল হাসি। তাতে কার্ল রাগ করে। অবশ্য আমার সব কিছুতেই তার রাগ। আমার হাসি, আমার ক্ষুধা—সমস্ত কিছুতেই কার্লের রাগ। একদিন তো সে রীতিমতো ক্ষেপে গেলো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো: তোর ইউরোপের গুষ্টি মারি! কালকেই আমি ভাগছি এই নোংরা গর্ত থেকে। সোজা অ্যারিজোনায় চলে যাবো!

: যাও না!—বললাম আমি।—যা ইচ্ছে করো। কিন্তু হারাম-জাদা, আমার সুস্থ চোখকে বাষ্পাচ্ছন্ন করিস না। তোর ওই বিষন্নতা আমার মনটাকে যে মুচড়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই! ইউরোপে কেউ কিছু করতে পারে না। বসে

থাকতে থাকতে তোমার পাছা পচে যাবে। কিচ্ছুটি তুমি করতে পারবে না। মূলত কার্ল একটা স্নব। একজন ক্ষুদে অভিজাতও বটে। দেশে বেশ ভালো সম্পত্তির মালিক। সে বলে: 'আমি প্যারিসকে ঘেন্না করি। রাজ্যের স্টুপিড লোকগুলো সারাদিন তাস খেলে,···দ্যাখো না ব্যাটাদের আলসেমী! আর কি? না, লেখা। সাহিত্য চর্চা! আরে বাপু, শব্দের সঙ্গে শব্দ জোড়া দিয়ে লাভটা কি? একটা বই লেখা আর তেমন কি বাহাদুরির কাজ বাওয়া? আমি কি পারি না? কিন্তু তাতে ফায়দাটা কি? ঢের বই লেখা হয়ে গেছে। আর কোনো বইয়ের দরকার নেই!'

এ-রকমটা অবশ্য আমিও যে এক সময় ভাবিনি, তা নয়। কিন্তু সে তো বহু বছর আগের কথা। সেই বিষন্ন শৈশব কবে আমি পার হয়ে এসেছি! এরপর আর আমার সামনে বা পেছনে কী আছে, তা আমি গ্রাহ্য করিনি। অস্বাস্থ্যকরভাবে স্বাস্থ্যবান। না আছে আমার দুঃখ, না আছে কোনো অতীত কিংবা ভবিষ্যত। আমার জন্যে বর্তমানই যথেষ্ট। দিনের পর দিন। আজকের এই দিন!—লে বেল আজুর উই!—

তার সাতদিনে একদিন ছুটি। কিন্তু ওই দিনটাই যেন কার্লের বিষন্নতম দিন। অবশ্য আমার জন্যে তার মনের এক কোণে একটু জায়গা আছে!

আর এক চিড়িয়ার নাম মার্লো। আজ পাঁচদিন ধরে ব্যাটা অনর্গল মদ টানছে। তার কাজই দাঁড়িয়েছে এক বার থেকে

অন্য বারে দৌড়োদৌড়ি! ওর শীর্ণ মাথাটা দেখলে করোটির কথাই মনে আসে। সারা পিঠ করাতের গুঁড়োয় ভর্তি। কোটের পকেটে আগামী সংখ্যার সমালোচনার প্রুফ। তার মানে, কেউ মদ খাইয়াছে তাকে প্রেসে যাবার পথে। সে এমন ভাবে সে-কথা বলছিলো যেন ঘটনাটা কয়েক মাস আগের। সে প্রুফের তাড়া মেলে ধরলো বারে বসেই। কাউন্টারটা কফির দাগে ভর্তি। সে একটি কবিতা লিখেছে গ্রীক ভাষায়। কিন্তু প্রুফটা বড্ড ঝামেলা করছে।

মার্লোর ইচ্ছে জাগলো ফরাসীতে এক চোট বক্তৃতা দেবে। কিন্তু বাধা পড়লো তাতে। মার্লোর আশা আছে এমন ফরাসী শিখবে, যা ফ্রান্সের চাকর-বাকররাও বুঝতে পারে। অবশ্য প্রাচীন ফরাসী ভাষার সে একজন মাস্টার। সুররিয়ালিস্ট্‌দের বেশ কিছু লেখার অনবদ্য অনুবাদ সে করেছে। 'কিন্তু 'গোল্লায় যা বান্দীর পুত্‌'—ধরণের শাদামাটা বাক্য উচ্চারণ তার সাধ্যের অতীত। মার্লোর ফরাসী জবান কেউই বোঝে না—এমনকি বেশ্যারাও নয়। যখন তুঙ্গে থাকে, তখন তার ইংরেজি বুলিই বা কে বোঝে। অনর্গল থুথু ফেলতে ফেলতে যে বিচিত্র বাক্য সে উচ্চারণ করে, তা থেকে কেবল, 'তুমিই দামটা দিয়ে দাও' —এটুকুই বোধগম্য। মদের আসরে দাম শুধবার ব্যাপারে সন্দিহান হলে, হঠাৎ সে এমন আচরণ শুরু করে যাতে মনে হয় সে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই এখন যেই না মার্লো কপালে করাঘাত করতে শুরু করেছে, কার্ল ধমকে উঠলো। কেননা

সে ঘটনাটা জানে। মার্লোর পাছার ওপর সবুট একটা লাথি মেড়ে সে বললো আমার সঙ্গেও বদমাশী ? শালা, পিটিয়ে লাশ ফেলে দেবো তবে। আমার খুব আশ্চর্য লাগতো, যখন দেখতাম, মার্লো পরে কার্লের প্রতিটি পাই পর্যন্ত শোধ করে দিচ্ছে।

মাঝে মধ্যেই ঝগড়া বেঁধে যেতো তাদের মধ্যে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মার্লো তর্জনি তুলে বলতো : 'তোমার চাকরিটা এই গেলো বলে ! আমি প্রায় নিশ্চিত।' কার্ল তো সবই জানে। সে মুখখানাকে করুণ করে বলতো 'অ্যাঁ, তাই নাকি ? তাহলে উপায় ? আর কি আমার চাকরি জুটবে ? বছর খানেকের জন্যে হয়ে গেলো আর কি !' মার্লো তো এ-রকমটাই শুনতে চায়। সে নামানো গলায় বিড়বিড় করে বলবে : 'ছাড়িয়ে দেবার পর মজাটা টের পাবে ! হুঁ হুঁ বাবা, বড় কঠিন অবস্থায় পড়তে হবে। চাকরি যাওয়া যে কি জিনিস !' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাড়-সর্বস্ব খলিটাও যেন শীতল বৈদ্যুতিক-আলোয় চিকচিক করে।

ফেরার পথে মার্লো জানায়, সে ফিরে যাবে সান ফ্রানসিসকোতে। মনে হয় কার্লের অসহায়ত্ব সত্যি সত্যি তাকে স্পর্শ করেছে। সে প্রস্তাব দেয়, তার অনুপস্থিতিতে কার্ল আর আমি কাগজটা চালিয়ে যেতে পারবো। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি কার্ল !' হঠাৎ সে প্রচণ্ড কাশতে শুরু করে। কাশতে কাশতে সে উবু হয়ে বসে পড়ে। প্রায় অজ্ঞান

হবার মতো অবস্থা। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাধরি করে বুলেভার এডগার কুইনেতের একটা বিস্ত্রোয় নিয়ে তুলি। এখন সত্যি সত্যি তার ভয়ানক মাথা ধরেছে। আক্ষরিক অর্থেই অন্ধ হবার মতো অবস্থা। তাকে বেশ কয়েকটা ফেরনেৎ -ব্রাঙ্কা খাওয়ানো হলো। তারপর বেঞ্চের ওপর চিৎ করে শুইয়ে মাফলার দিয়ে ওর চোখ দুটো ঢেকে দিলাম। সে অল্প কিছুক্ষন গোঙালো। একটু পরেই শুনি, হতভাগার নাক ডাকছে।

ঃ ওর প্রস্তাবটা তো শুনলে!—কার্ল বললো—কাগজটা আমরা সত্যিই নিয়ে নেবো নাকি? ও বলেছে ফিরে এসেই আমাকে এক হাজার ফ্রাঁ দেবে। কী দেবে, তা আমি বেশ জানি। তুমি কী ভাবছো এ-ব্যাপারে? বলতে বলতে সে বেঞ্চের ওপর চিৎপাত শুয়ে থাকা মার্লোর দিকে তাকালো। মাফলারটা চোখের ওপর থেকে তুলে আবার রেখে দিলো যথাস্থানে। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কার্ল বললো, 'শোনো জো, আমরা বরং নিয়েই নিই পচা কাগজটা। তার পর ফুঁকে দিয়ে ক্ষান্ত হবো না হয়!'

ঃ তার মানে?

ঃ প্রতিটি কনট্রিবিউটারকে হাঁকিয়ে দিয়ে আমরা নিজেরাই ওসব গু-মুত লিখবো। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা?

ঃ কিন্তু কী ধরনের গু-মুত?

ঃ যে কোনো ধরনের···এর বিহিত করার মুরোদ আছে ওর?

ওকে চমৎকারভাবে বাঁশ দেবো এবার। অবশ্য একটি দুর্দান্ত সংখ্যা বের করবো আমরা। কিন্তু সেইটিই হবে শেষ সংখ্যা ওই ম্যাগাজিনের। কি, তুমি রাজী ?

এইসব কথা বলতে বলতে আমরা মার্লোর ঘুমন্ত দেহটা তুলে নিলাম। এবং চ্যাংদোলা করে নিয়ে চললাম কার্লের ঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে বাতি জ্বালাতেই দেখা গেলো, একটি মেয়েমানুষ কার্লের বিছানার ওপর তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঃ ওহ্ হো—ওর কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।—বললো কার্ল। আমরা মালটাকে ঢিলে করলাম এবং মার্লোকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। মিনিটখানেক সময় কেবল গেছে ; হঠাৎ দরজায় করাঘাত। ভ্যান নর্ডেন এসেছে। বেচারার অবস্থা কাহিল। তার বদ্ধমূল ধারনা, এক-পাটি নকল দাঁত সে হারিয়েছে ব্যাল নেগ্রেতেই। যাহোক, আমরা চারজন ঘুমিয়ে পড়লাম এক বিছানায়। বেচারা মার্লো সারারাত কাটা কই-মাছের মতো ছটফট করলো।

সকাল বেলা মার্লো আর ভ্যান নর্ডেন গেলো বাঁধানো দাঁতের পাটি খুঁজতে। তোতলাচ্ছিলো মার্লো—যেন দাঁত হারিয়েছে তারই।

৫

নাট্যকারের বাসায় আজ আমার শেষ নৈশভোজ। ওরা এইমাত্র একটা নতুন পিয়ানো ভাড়া করে নিয়ে এলো। সিলভেস্টার বয়ে নিয়ে আসছিলো একটা রাবার-চারা। আমার হাতে চারাটা দিয়ে সে গেলো চুরুট আনতে। এক-টার পর একটা বিনি পয়সার ভোজ আমি এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলাম প্ল্যান-মাফিক। একের পর এক স্বামীরা চলে যাচ্ছিলো আমার বিরুদ্ধে—অথবা স্ত্রীরা। রাবার-চারাটি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে আমার মনে পড়ে গেলো ক'মাস আগের একটি ঘটনার কথা। আমার বিয়ে আংটিটা বিক্রী করবো—তাই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো রেস্তোরাঁর এক বেয়া-রার সঙ্গে। ছোকরা মোটে ছ'ফ্রাঁ দিতে চাইলে আমি তো মহাখাপ্পা! কিন্তু ক্ষিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে তখন। মোনাকে ছেড়ে আসার পর থেকেই আংটিটা আছে আমার অনামিকায়। এটা আমার শরীরের একটা অংশেই যেন পরিণত হয়েছিলো। এটিকে বিক্রী করতে হবে—এ-রকম কখনো ভাবিনি আমি। চমৎকার ঝকঝকে সোনার আংটি—ঝেড়ে ফেললেও দেড় ডলার! বেশীও হতে পারে। অথচ—? একটু পরে অবশ্য

পাশের বেঞ্চে বসা দম্পতি আংটিটা কিনে নেন।

তিন বছর পর আমি যখন মোনার সঙ্গে দেখা করতে জেটির দিকে যাচ্ছি—তখন মেইডেন লেনের এক জুয়েলারীর সামনে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মস্তো শো-কেস ভর্তি কেবল বিয়ের আংটি আর বিয়ের আংটি। কিন্তু জেটিতে গিয়ে আমি মোনাকে দেখতে পেলাম না। জাহাজের শেষ যাত্রীটি নেমে এলো। কিন্তু কোথায় মোনা? শেষে যাত্রী তালিকার ওপর চোখ না-বুলিয়ে পারলাম না। না, কোথাও তার নাম নেই। আমি তক্ষুনি এই আংটিটা পরে নিয়েছিলাম আমার আঙুলে। তখন থেকেই ছিলো আংটিটা। একবার পাবলিক-বাথে হারিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু ফিরেও পেয়েছিলাম আবার। তা, এবারে গেলো!

আমি মাথা নিচু করে বসে বসে ভাবছিলাম ওই আংটিটার কথাই। এমন সময় পিঠে যেন কার হাতের স্পর্শ। সংক্ষেপে বলি: আমি এক পেট খেতে পেয়েছিলাম। এবং কয়েকটা ফ্রাঁ। আর ঠিক তক্ষুনি বিদ্যুচ্চমকের মতো আমার মনের মধ্যে ঘা মারলো একটি সম্ভাবনা। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, সাহস করে যদি কেউ কারো কাছে এক বেলা খাবার আবদার জানায়—সে কিছুতেই প্রত্যাখ্যাত হবে না। আমি তক্ষুনি ছুটে গেলাম একটা কাফেতে। এবং ডজনখানেক চিরকুট লিখলাম এ-রকম: 'আপনি কি সপ্তাহে একবার আমাকে একটা ডিনার খাওয়াবেন? কবে আপনার সুবিধে হয়, বলবেন

কি?' ব্যাপারটা কাজ করলো একটা চমকের মতো। আমি কেবল খেতেই পেলাম না—ভূরিভোজ করলাম রীতিমতো। প্রত্যেক রাতেই আমি ডেরায় ফিরতাম মাতাল হয়ে।

এক এক রাতে এক এক জন খাওয়ায়। ব্যাস। এই পর্যন্তই। তবে এদের মধ্যে এরকম দু'একজন ছিলো, যারা আমাকে সিগারেট দিতো। কিংবা দিতো কিছু পয়সাকড়িও। তারা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো এজন্যে যে, সপ্তাহে এক দিনের বেশী তাদের সামনে উদয় হতাম না আমি। তারা আরো বেশী স্বস্তিলাভ করতো, যখন আমি বলতাম, 'আর দরকার হবে না!' তারা কখনো জিজ্ঞস করতো না কেন? বরং অভিনন্দন জানাতো। ব্যাস, এইটুকুই। আর কিছু নয়। অবশ্য আর একজন ভালো মক্কেল পাবার পরেই আমি কাউকে নিষ্কৃতি দিতাম। আর প্রতিটি মক্কেলের পাছা ব্যথা হতে শুরু করায় আগেই নতুন একজন জুটে যাওয়ায় তারা বিরক্ত হবার সুযোগই বলতে গেলে পেতো না। বস্তুতঃ আমার প্রোগ্রাম ছিলো স্টেডি এবং সলিড। যাকে বলে ফিক্সড শিডিউল। আমি জানতাম, বিয়্যুদবার কী রকম খাবার হবে। জানা ছিলো, শুক্কুরবারের ফিরিস্তিও। বুঝতে পারতাম, ক্রনিসতাদের ওখানে রয়েছে শ্যাম্পেন আর ঘরে বানানো আপেল-পাই। কার্ল অবশ্য নিয়ে যাবে এক একদিন এক এক রেস্তোরাঁয়। খাওয়াবে দুস্প্রাপ্য মদ। আহার শেষে নিয়ে যাবে কোনো নাটক দেখতে অথবা সার্কি

মেদ্রোনায়। একজন আমাকে কি খাওয়ালো, তা অন্যজন জানতে চাইতো আগ্রহের সঙ্গে। বেশ মজার ব্যাপার। কেউ জিজ্ঞেস করতো, কবেকার খাবার সবচেয়ে ভালো হয়েছে কিংবা কোথায় বেড়িয়ে আনন্দ হলো বেশী। আমার ধারনা ক্রনসতাদের ওখানে খেয়ে বা বেড়িয়েই বেশী তৃপ্তি পেতাম আমি। যা চমৎকার রাঁধে ওর বউটা!···

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি তানিয়াদের মলডর্ফ ওখানে যথারীতি আছে। বসে আছে তার দেবতার পায়ের তলায়। ভক্তিতে তার দু'চোখ অশ্রু-সজল। তানিয়া বাজাচ্ছে তার পিয়ানো। পিয়ানোটা যেন স্পষ্ট বলছে, 'আর ভালোবাসা নয়!' আমি আবার ঝর্নায়। সিলভেস্টার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে এইমাত্র এসেছে ব্রডওয়ে থেকে। সারারাত আমি ছিলাম মলের বাইরে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে। তখন ভূ-মণ্ডলের ওপর আছড়ে পড়ছে কচ্ছপের প্রস্রাব··· অশ্বরা লাফিয়েছে পাগলের মতো, যদিও মাটিতে তাদের পা পড়েনি। সারারাত আমার নাকে এসেছে লাইলাকের ঘ্রান। এই ঘ্রান বাতাসে ভেসে এসেছে ছোট্ট অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে। লাইলাকগুচ্ছ সে জড়িয়েছিলো তার চুলে। যখন সে সিলভেস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যায়, ওই লাইলাক তখন আমিই তাকে কিনে এনে দিয়েছিলাম। ঘরটা যেন প্রেম, উষ্ণ লাইলাক আর কাছিমের মুতে সাঁতার কাটছে। আর ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠছে পাগলের মতো।

সকাল বেলা। মলে যাবার ছোট্ট তোরনটি তালাবন্ধ। লোকজন কাজে যাচ্ছে। শাটারগুলো খুলে যাচ্ছে সশব্দে। উল্টোদিককার বইয়ের দোকানে চাদ হুদের গল্প, নিঃশব্দ টিকটিকি। তার কাছে লেখা আমার চিঠিগুলো। সিলভেস্টার একদিন চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অবশ্যই বলবে, 'সত্যি, তুমি চমৎকার লেখো! দেখা যাচ্ছে, তুমি একজন পরা-বাস্তববাদী। তাই না?'

রাবার-চারাসহ ব্যালকনিতে আমি। নিচে পিয়ানো বেজেই চলেছে। তার চাবিগুলো কালো এবং শাদা। তুমি জানতে চাও, আমার জন্যে কিছু বাজাবে কিনা! হ্যাঁ, বাজাও। তোমার ওই বিশাল হাত দিয়ে বাজাও, যা তুমি ভালো বাজাতে পারো। বাজাও এবং তারপর কেটে ফ্যালো তোমার বড় বড় হাত দু'টি।

ওই পিয়ানো! আমি জানি না, সব সময় ওই বাজনাটা সে কেন বাজায়। অমন পুরোনো পিয়ানো কি তাকে মানায়? তার জন্যে দরকার একটি ঝকঝকে বাদ্যযন্ত্র। আমি যখন আমার কোলে রাবার-চারা নিয়ে পিয়ানোর রীডে তার হাত চলতে দেখি, তখন নিজেকে মনে হয় নর্থের সেই পাগলাটার মতো যে ন্যাংটো হয়ে বসে বসে জমাট বাধা সমুদ্রের পানিতে বাদাম ছুঁড়ে ফেলতো। এই করুণ স্মৃতি কথাটুকু যেন লাভার হরফে লেখা—যার রঙ সীসে আর দুধে মেশানো। আর সিলভেস্টার?

৫—

নিলামওয়ালার মতো মাথাটা একদিকে বাঁকিয়ে বলছে: ওই বাজনাটা বাজাও, যেটা তখন প্রাকটিস করছিলে। একটা চমৎকার স্মোকিং-জ্যাকেট পরে চুরুট টানতে টানতে স্ত্রীর পিয়ানো বাদন শোনাতে যে কী আনন্দ! বাজনার বিরতিতে তুমি হয়তো একবার বাইরে গেলে খানিকটা নির্মল বাতাস সেবন করার জন্যে। তানিয়ার আঙুলগুলো সুন্দর। সত্যি সুন্দর। সে বাটিকের কাজও ভালো জানে। একটা বুলগেরিয়ান সিগারেট খেয়ে দেখবে? এ-ছাড়া আছে মটরের সুপ। আমরা কি শুক্রবার রাতেই মটরের সুপ খাই। তাছাড়া লাল ওয়াইনটা একবার চেষ্টা করে দেখবে না? হ্যাঁ, আমি আমার কাজ ভালোবাসি। কিন্তু আমি এর মধ্যে কোনো গুরুত্ব আরোপ করি না। আমার আগামী নাটকটি লেখা হচ্ছে বিশ্বের বহুবাচনিক স্বরূপকে ভিত্তি করে। ক্যালসিয়াম আলোয় সাজানো রিভলভিং-ড্রাম। ও' নীল মরে গেছে। আমার মনে হয়; আরো স্বতস্ফূর্তভাবে পাদানীটায় তোমার পা রাখতে হবে। হ্যাঁ, চরিত্রগুলো এখন মাইক্রোফোনগুলোর সামনে দাঁড়াচ্ছে। পটভূমি এশিয়া। তুমি কি অল্প একটু আঁজু খাবে? আমরা বিশেষ করে তোমার জন্যেই এটা আনিয়াছি···

বক্তৃতা চললো খাবার এময়েও। এমনকি শোবার সময়ে পর্যন্ত। নাটক থেকে প্রেমরসে সিক্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসবার পর থেকে আবেগ ময় প্রণয়গুঞ্জনে তানিয়াকে ভরপুর করে তুলছিলো সিলভেস্টার। তানিয়া ক্লান্তিতে ভেঙে পড়-

ছিলো। কিন্তু তবুও কি রেহাই আছে? অথচ তখন নাকি তানিয়ার ভীষণ পেচ্ছাপ পেয়েছিলো! তলপেট ব্যথায় টনটন করছিলো। তার মনে হচ্ছিলো, মূত্রাশয় ফেটে গেছে। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম, তানিয়া বিছানার মধ্যে বিচরণ করেছে তার ফাটা মূত্রাশয়টি নিয়েই। আমি ভীষণ রেগে গেলাম। ভাবতে খুবই খারাপ লাগলো যে একটা বাজে নাটুকে লোক আমার ভালোবাসার মেয়েমানুষের ওপর প্রস্রাব করবে। তোর রেড ওয়াইন আর মটর সুপের গুষ্টি মারি। ইচ্ছে হচ্ছে, ফার্নেসের পাশে শুয়ে থাকা ওই ইতর-টার শরীরে আমিই এখন পেচ্ছাপ করে দিই। কী? না, কোনো জিনিষকে দু'রকম ভাবে দেখা। গোল্লায় যাক দু'রকম-ভাবে দেখা, নিপাত যাক বহুবাচনিক ব্রহ্মাণ্ড আর এশীয় পটভূমি। তোর লাল মদের গ্লাস আমার হাত থেকে নিয়ে ওর হাতে তুলে দে ব্যাটা বদমাশ। কেননা সে তো আমার। তুই যা, ফোয়ারার পাশে গিয়ে বসে থাক, আর আমি ঘ্রান নিই লাইলাকের। ওই পচা পিয়ানোটা ঢেকে রাখ তোর ফ্লানেলের প্যান্ট দিয়ে। আমার সঙ্গে ওর নিবিড় মধুর সম্পর্কের কথা তুই কি জানিস? তুমি তো মিয়া ধরেই নিয়েছো, আমি কষ্ট পেতে পছন্দ করি। কষ্ট পাবার লোক। তা, ওকে একটু জিজ্ঞেস করো না, কীভাবে আমি কষ্ট পাই। আমার কষ্ট পাবার ধরণটা কী রকম! যেমন একবার সে টেলি-ফোনে আমাকে সম্বোধন করেছিলো, প্রলাপকারী-কর্কট বলে।

তুমি কি জানো, প্রলাপ মগ্ন সেই কাঁকড়াটিকে সে কোথায় তুলে নিয়েছে? তোমার ঝাপসা কথা শুনতে শুনতে মেয়েমানুষটার অবস্থা কাহিল। তার স্নায়বিক-বৈকল্য চরমে পৌঁচেছে এখন। তুমি যতোই প্রস্রাব করো, সেই কুটোগুলো তো বন্ধ করতে পারবে না। তা মিস্টার ওয়ারেন কি বলবেন? না, 'শব্দরা হচ্ছে নিঃসঙ্গতা!' আমি তোমার টেব্‌ল-ক্লথের ওপর কয়েকটি শব্দ রেখে এসেছি গতরাত্রে। তুমি তোমার কনুইয়ের নিচে তা চেপে রেখেছিলে!

সে সব সময় ওকে একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। একবার সে যদি সাহস করে বলতে পারতো, 'ওকে নাও?' বোধ হয় একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ঘটে যেতো। কিছুই না—কেবল দু'টি শব্দ: 'ওকে নাও!' আমি শপথ করে বলতে পারি, তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেতো। তাছাড়া, সম্ভবতঃ আমি তাকে গ্রহণও করতাম না। যার জিনিস তারই থাকতো। অথবা আমি তাকে এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে ফিরিয়ে দিতাম। উন্নততর অবস্থায় ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু চারপাশে বেড়া তুলে দিলে এসব হয় না হে! অথবা একটা মানুষের চারপাশে তুমি বেড়া দিতে পারো না। এ-রকম ঘটনা ঘটেনি কখনো···।

অভাগা-তুমি মনে করেছো আমি তার উপযুক্ত নই—নই মঙ্গলজনক! আমি তাকে বিনষ্ট করবো মৈথুনে। কিন্তু তোমার জানা উচিত, দলনে পেষণে আরো সুন্দরী হয়ে ওঠে

একজন নারী। তার রূপ পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয় ধর্ষিতা হবার পরে। কেবল প্রেমপূর্ণ হৃদয়কেই তুমি ভালোবাসার মানদণ্ড বলে বিবেচনা করে বসে আছো। তা হৃদয় যদি সত্যি প্রেমপূর্ণ হয় তাহলে একটা কথা। কিন্তু বৎস, তোমার হৃদয় কোথায়? পুরোটাই তো কিডনি। পুরোটাই মূত্রাশয়। এক বিরাট বিশাল মূত্রাধারের আধার তুমি! আর তার ভেতরটাও শূন্য। সে বলে—তুমি এক সময় কবি ছিলে। কিন্তু এখন তোমার পরিচয় কি? সাহস চাই সিলভেস্টার, সাহস। তোমার কাপড়ের তলা থেকে মাইক্রোফোনগুলোকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দাও। তোমার লুকোনো পা মাটিতে ফ্যালো। বন্ধ করো যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা। ওই যে বলেছি, সাহস চাই। কেননা সে ইতিমধ্যেই তোমার ভেতরে গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। আর হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে ওই বেড়াটিও তুলে ফেলতে হবে। আমাকে মোলায়েমভাবে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, কফিটা কার্বোলিক-অ্যাসিডের মতো লাগছে কিনা। ওতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। প্রথমে কফির ভেতর একটু ইঁদুর মারার বিষ ফেলে দাও। তারপর দাও কয়েক ফোঁটা ফুটন্ত প্রস্রাব।···

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমি জীবন যাপন করছি যেন একটা কমিউনে। সবকিছু সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। আমরা কয়েকজন। প্রধানত ক'জন ক্ষ্যাপা রাশিয়ান, এক মাতাল ডাচম্যান আর ওলগা নামে এক বিপুলদেহী বুলগেরীয় মহিলার

সঙ্গে। আর রুশদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ইউজেনি আর আনাতোলির কথা। ওলগা ক'দিন আগেই ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। একটা অপারেশনের পর তাকে খানিকটা বিষণ্ণ মনে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু খুব একটা কাহিল হয়েছে বলে মনে হয় না। আগের মতোই দাবড়ে বেড়াচ্ছে সে যত্রতত্র। তার চিবুকে উদয় হয়েছে দু'গাছি লোম—নাকের নিচে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেন গোঁফের রেখা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরের দিনই দেখা গেলো, সে যথারীতি জুতো বানাতে বসেছে। ভোর ছ'টার সময়েই সে বসে গেছে তার ওয়ার্ক-বেঞ্চে। সে দিনে দু'জোড়া জুতো বানাতে পারে। ইউজেনি বলে, ওলগা একটা বোঝা। যদিও দিনে দু'জোড়া জুতো বানিয়ে দিয়ে ওলগা তাদের যথেষ্ট সহায়তা করছে। ওলগা হাত উঠিয়ে বসে থাকলে ইউজেনি আর তার বউকে না খেয়ে থাকতে হবে। কাজেই ওলগাকে সময় মতো চারটে খাওয়ানো, শুতে দেয়া আর বাইরে বেড়ানোর ব্যাপারে কেউ খুব একটা গাঁইগুইও করে না।

খেতে বসলে প্রথমে একটা সুপ থাকবেই। তা সে-সুপ টম্যাটো, শাকসব্জী, পেঁয়াজ বা যা কিছুরই হোক না কেন—খেতে সবগুলোই এক রকম। এর গন্ধ বেশির ভাগ সময়েই ডিশ মুছবার ময়লা ন্যাকড়ার মতো। কিছুটা নোনতা। এবং তেলতেলে একটা বোঁট্‌কা-গন্ধ। এ-বাড়ির সুপ এবং মাখন অন্ততঃ দিন তিনেকের পচা হয়। রান্নাঘরটা গুহার মতো—

গুমোট এবং জানালাহীন। আমার সাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেচারা ইউজেনি চট্ করে পর্দার দায়িত্ব পালনরত বিছানার চাদরটা খাটের ওপর মেলে দ্যায়। বিছানার ময়লা চাদর আর নোংরা পানিতে ভর্তি ওয়াশ বেসিনের দিকে তাকিয়ে ইউজেনি বলে: 'আমি একটা ক্রীতদাস!' প্রতিদিন সে এই কথাটি বলবে। এবং একবার নয়—বারবার। অন্ততঃ বারো চৌদ্দ বার। তারপর সে দেয়ালে ঝোলানো তার গিটারখানা টেনে নেবে এবং গান গাইতে শুরু করবে।

পচা মাখনের গন্ধটা নাকে এলেই আমার মনে হয়, আমি দাঁড়িয়ে আছি এবড়ো-খেবড়ো এক আঙ্গিনায়। শাটার খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বাইরে বেরিয়ে আসছে চাদর গায়ে মহিলা, বামন, ইঁদুরমুখী বেশ্যা, কুঁজো ইহুদী, দাঁড়িওয়ালা ইডিয়টের দল। কেউ আসছে পানি তুলতে, কেউ বা আসছে ময়লা আবর্জনা ফেলবার জন্যে। একদিন ইউজেনি আমাকে ময়লা ফেলে আসতে বললো সেখানে। আমি জঞ্জালগুলো নিয়ে আঙিনার এক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালাম। উঠোনটার মাঝখানে একটা গর্ত। একরাশ ময়লা কাগজ পড়ে আছে তার চারিদিকে। কুয়োটার ভেতরে যেসব জিনিস পড়ে আছে তাকে এক কথায় বলা চলে—গু। আমি নোংরাগুলো ছুঁড়ে ফেললাম। দুটো মুরগি ছুটে এলো, এবং সেখানে পিচকারী ছাড়লো স্বতস্ফূর্তভাবে। ফিরে এসে দেখি, সুপ শেষ। খেতে খেতে সর্বক্ষন আমি ভাবছিলাম, আমার

টুথব্রাশটা অকেজো হয়ে গেছে। এমন করুণ অবস্থা তার দাঁড়িয়েছে যে, ব্রাশের একটা আঁশ সেদিন আমার দাঁতের ফাঁকে ঢুকে গিয়েছিলো।

আমি সব সময় জানালার ধারে খেতে বসি। টেবিলের অন্য প্রান্তে বসতে আমায় ভয়। কেননা, খাটটা ওই পাশে এবং সেটি সর্বক্ষণ হামাগুড়ি দিচ্ছে। আমি যদি ওদিকে তাকাই, তাহলে রক্তের ছিটে লাগা বিছানায় চাদরটা আমার চোখে পড়বেই। কিন্তু সচরাচর আমি ওই দিকে তাকাই না। আমি বরং জানালা দিয়ে বাইরের আবর্জনাময় আঙিনার দিকেই চেয়ে থাকি। গান বাজনা ছাড়া ভোজপর্ব কখনো শেষ হয় না। পনিরের টুকরো মুখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইউজেনি দেয়ালে ঝোলানো গিটারটা পেড়ে নেবে। এবং বহুবার গাওয়া গানখানিই আবার গাইতে শুরু করবে। খুব সম্ভব, তার স্টকে পনেরো থেকে ষোলোটা গান আছে। কিন্তু তিনটির বেশী আমি কখনো শুনিনি। তার সবচেয়ে প্রিয় গান—'শারমাঁৎ পোয়েমে দ্য আমুর!' অ্যাগোয়েসে আর ত্রিস্তে-য়েসে—এই দুটি শব্দে গানটি ভরপুর। দুপুরে আমরা গেলাম সিনেমা দেখতে। হলটি ঠাণ্ডা, অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইউজেনি কিনলো দামী টিকেট। আমি বসলাম সামনের দিকে—কম পয়সার বেঞ্চে। হলটা জনশূন্য। ইউজিন গাইতে শুরু করলো গান। যেন ইউরোপের মুকুটপরা মাথাগুলোকে দেখার মতো দর্শকদের তরফ থেকে সে প্রতিনিধিত্ব করছে। বাগানের

দিকের দরজাটা খোলা। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বৃষ্টি-ভেজা পাতার ঘ্রান। আমি বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশ্য আমার সামনে জ্বলছিলো প্রবেশ-পথের লাল আলো। কিন্তু তাতে আমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটলো না। আমি আমার চোখের ওপর কৃত্রিম চোখ লাগিয়েই সাধারণত ঘুমোই।

আমি আঙিনার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম কাচের চোখ লাগিয়েই। পাথরগুলো ভেজা এবং শ্যাওলা পড়া। সেলারের প্রবেশমুখে মস্ত একটা দরজা। জায়গাটা পিচ্ছিল এবং বাদুড়ের বিষ্ঠায় ভর্তি। দরজাটি বড়োই পুরোনো। যাকে বলে জবুথবু অবস্থা। কিন্তু তার পাল্লায় লাগানো এনামেলের পাতখানা অটুট। যাতে লেখা: দরজাটি অবশ্যই বন্ধ রাখবেন। কেন বন্ধ থাকবে দরজা—আমার মাথায় আসে না ব্যাপারটা। আমি এখন ওই দরজাটির দিকে চেয়ে দেখি, এনামেলের পাতটি আর নেই। ওখানে এক ফালি রং-করা কাচ লাগানো হয়েছে। আমি আমার কৃত্রিম চোখটি খুলে নিলাম। তারপর থুথু দিয়ে ভিজিয়ে রুমালে মুছে সেটি পরিস্কার করলাম। ডায়াসের ওপর বসে আছে একজন মহিলা—যার গলায় প্যাঁচানো আছে সাপ। পুরো ঘরটা বইয়ে ভর্তি। রঙিন গোল বোয়মের ভেতর সাঁতরে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত মাছেরা। দেয়ালে ঝুলছে ম্যাপ আর চার্ট। প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবার আগেকার প্যারিসের মানচিত্র। প্রবীন

পৃথিবীর ম্যাপ। কার্থেজের নতুন ও পুরোনো ম্যাপ। ঘরের কোণায় একখানা লোহার খাট, যার ওপর শোয়ানো আছে একটা লাশ। মহিলাটি অন্যমনস্কভাবে লাশটা তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে দিলো। তারপর মন্থর গতিতে বিশাল কারুকার্যময় ডেস্কের কাছে গিয়ে বোয়মের ভেতর থেকে একটি গোল্ডফিশ তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে শুরু করলো। কক্ষটি আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলো এবং একটার পর একটা মহাদেশ ছিটকে পড়তে শুরু করলো সমুদ্রের মধ্যে। কেবল স্থির দাঁড়িয়ে রইলো সেই মহিলাটি তার ভৌগোলিক অবয়ব নিয়ে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমি দেখলাম, আইফেল-টাওয়ার আকাশের দিকে পিচকারীর মতো ছুঁড়ে দিচ্ছে শ্যাম্পেন। টাওয়ারটা পুরোপুরি কতগুলো সংখ্যা দিয়ে তৈরী এবং কালো ফিতে দিয়ে জড়ানো। নর্দমার মধ্যে প্রচণ্ড কলকল শব্দ হচ্ছে। চারিদিকে কেবল জ্যামিতিক ঢঙের ছাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। পৃথিবীর বুক থেকে একটা কার্তুজের মতো আমি ছুটে বেড়িয়েছি। গাঢ় কুয়াশায় ছেয়ে গেছে সব জায়গা। জমাট চর্বিতে থিক-থিক করছে দুনিয়াটা। শহরটা যেন যন্ত্রনায় ছটফট করছে। যেন তার গরম শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার হোটেলের বিধবারা আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করছে। কোথায় যেন কীসব কেমিক্যাল পুড়ছে। তার বিকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। সীন নদীর দিকে তাকিয়ে আমি সেখানে দেখছি

কাদা এবং বিচ্ছন্নতা। স্ট্রিট-ল্যাম্পগুলো ডুবে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মারা পড়ছে রুদ্ধশ্বাস হয়ে। ব্রীজগুলো বসত-বাড়িতে ঢাকা পড়েছে। ভালোবাসা... কসাইখানা সব! দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক—যার দু'টো হাতই কনুই অব্দি কাটা। আর তার পেটের ওপর ঝুলছে ফিতেয় বাঁধা একখানা অ্যাকোর্ডিয়ান। মনে হয় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সাপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বসে পড়েছে। কেবল জেগে আছে একটা প্রলম্বিত রেখার আভাস। তাতে নক্ষত্র নেই, বৃক্ষ নেই, নদী নেই। এখানে যারা বসবাস করে তারা সবাই মৃত। এখানে চেয়ার বানায় তারাই; কিন্তু তাতে উপবেশন করে ভিন্ন স্বাপ্নিকেরা। রাস্তার মাঝামাঝি দেখা যাচ্ছে একটা চাকা। এবং চাকার মাঝ বরাবর একটা ফাঁসির দড়ি লাগানো। ইতিমধ্যেই মারা পড়া লোকেরা সেই রজ্জু গলায় পড়তে যাচ্ছে; কিন্তু চাকাটা ঘুরছে অত্যন্ত দ্রুত।...

আমাকে ধাতস্থ করার জন্যে কারো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করছি। গতরাতেই আমি আবিস্কার করেছি, উত্তমপুরুষ 'প্যাপাইনি' এটা পারে। ব্যর্থ লোক হিশেবে তার তুলনা হয় না। আঠারো বছর বয়েসের মধ্যেই সে যাবতীয় গ্রন্থ গুলো পেয়েছে। কেবল হোমার, দান্তে, গ্যেটে নয়; কেবল অ্যারিস্টটল, প্ল্যাটো, সার্ভেন্টিস, সুইফ্‌ট নয়; কেবল ওয়াল্ট হুইটম্যান, এডগার এলান পো, বোদলেয়ার, ভিলোঁ, কার্দুচ্চি, মানজোনি, লোপে ডে ভেগা নয়; কেবল

নিটশে, শোপেন হাওয়ার, কান্ট, হেগেল, ডারউইন, স্পেনসার, হাক্সলি নয়—মাঝারি আর ছোট আরো বহু জ্ঞানীগুনীকে সে গলধঃকরণ করে বসে আছে।…'হ্যাঁ, অ্যালর্সকে পাওয়া যাবে ১৮ পৃষ্ঠায়। ২৩২ পৃষ্ঠাতে সে ভেঙে পড়েছে এবং স্বীকারোক্তি দিচ্ছে।' ধেৎ, তোর স্বীকারোক্তি। ওর তথ্য আমার মগজেই ঢুকতে চায় না। আমি অতো জানলে তো! আমি বড়ো জোর, কি বলে, বইগুলোর নাম বলতে পারি। আমি জীবনীকোষ সংকলন করেছি। আমি লিখেছি সমালোচনামূলক রচনা।…আমি পাঁচ মিনিট বলতে পারি কিংবা বলতে পারি পাঁচ দিনও। তবে বলার শেষে আমার অবস্থা কাহিল!

এইটে অনুসরন করুন 'সবাই আমাকে দেখতে চায়। সবাই চায় আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে। আমি কী করছি, কেমন লোক ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি আবার? আমি কি এখনো গ্রামে গিয়ে হাঁটাচলা করার উপযুক্ত? আমি কি লিখছি? আমি কি আমার বইটি শেষ করেছি? আমি কি শিগগীরই আরেকটা শুরু করতে যাচ্ছি!'

'একজন চিমসে জার্মান আমাকে দিয়ে তার বইটি অনুবাদ করাতে চায়। এক বিশালাক্ষী রুশ যুবতী আমাকে তাড়া দিচ্ছে আমার আত্মজৈবনিক রচনার জন্যে। একজন আমেরিকান মহিলা জানতে চান আমার সর্বশেষ খবর। এক আমেরিকান

ভদ্রলোক ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়ে গাড়ি পাঠাবেন আমার সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গ ও গোপনীয় আলাপ করার ইচ্ছায়। আমার স্কুলজীবনের এক সঙ্গীর আবদার, আমি যখনি যা কিছু লিখি, সঙ্গে সঙ্গে তাকে তা পড়ে শোনাতে হবে। আমাকে পোজ দেবার জন্যে অনুরোধ করছে এক চেনা আঁকিয়ে। এক সাংবাদিক চেয়েছে আমার বর্তমান ঠিকানা। একজন সাধক জানতে চান আমার আত্মা এবং, তার চেয়ে বেশী, আমার টাকা পয়সার খবর। আমার ক্লাবের সভাপতি বড্ড খুশী হবেন যদি ছেলে-ছোকরাদের সামনে আমি অল্প দু'চার কথা বলি। এক মহিলা, যিনি আধ্যাত্মিকতা নিয়েই মগ্ন, সম্ভব হলে তাঁর বাসায় গিয়ে চায়ের নেমন্তন্ন রক্ষার অনুরোধ করেছেন। যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে আমার কী অভিমত, তা তিনি জানতে চান। তাছাড়া ওই নতুন মাধ্যম সম্পর্কেই বা আমি কী ভাবি!···

'উরিব্বাস্—এ কি যন্ত্রণা? এ আমি কী হলাম? ব্যাটাদের কী অধিকার আছে আমার আদ্যোপান্ত খুঁড়ে দেখার? আমি কি তোমাদের ভাড়াটে ভাঁড় যে, অষ্ট পহর তোমাদের নোংরা নাকের ডগায় প্রহসন করবো? আমি কি কারো কেনা গোলাম, যে প্রভুর পায়ের তলায় নতজানু হয়ে কেরামতী দেখাবো? আমি কি পাড়ার বেশ্যা, যে জেল্লাদার পোষাক পরা খদ্দের দেখলেই স্কার্ট উঁচু করবো? ফেলে দেবো শেমিজ?

'আমি এক মুক্ত পুরুষ। আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতা চাই। চাই

একাকীত্ব। আমি চাই, সূর্যালোক আর চত্বরের পাথর নিঃসঙ্গ থাকুক। নির্বাক থাকুক। কেবল তারা থাকুক আমার মুখোমুখি। তাদেরকে সঙ্গ দেবে কেবল আমার হৃদয়ের সঙ্গীত। আমার কাছে তোমরা কি চাও? আমি যখন কিছু বলবো, তা লিখেই বলবো। দেবার সময় হলেই আমি দেবো। তোমাদের কৌতূহল আমার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলতে চায় যে! তোমাদের প্রশংসায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তোমাদের চা যেন আমার কাছে বিষ। আমি কারো ধার ধারি না—কেবল ঈশ্বর ছাড়া—যদি তিনি থেকে থাকেন!'

অবশ্য প্যাপাইনি যখন নিঃসঙ্গ হতে চায়—আমার মনে হয়—তখন সে কিছুটা হারিয়েও ফেলে। তুমি যদি দরিদ্র এবং ব্যর্থ হও, তাহলে তোমার নিঃসঙ্গ হতে বাধা নেই। একজন শিল্পী সব সময়ই একা—অবশ্য, সত্যিই সে যদি শিল্পী হয়। না, না, ঠিক তাও নয়—একজন শিল্পীর যা দরকার, তা হচ্ছে নিঃসঙ্গতা।

যেমন নিজেকে আমি বলি—শিল্পী। আজ দুপুরে এতো আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে, যা তিনদিন কাজে লাগবে। আজ আমি কর্মোদ্যমে ভরপুর, কিন্তু সেই উদ্যম নিয়ে করার কিছুই নেই। অগত্যা বেড়াতে বেরোলাম। রাস্তায় এসে ঠিক করলাম, সিনেমা দেখবো। কিন্তু টিকেটের দামে কিছুটা ঘাটতি থাকায় ছবি দেখা হলো না। আবার পদচারনা। প্রতিটি ছবিঘরের সামনে আমি দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। এবং

চোখ বোলাচ্ছিলাম টিকেটের মূল্য-তালিকার ওপর। খুবই শস্তা! অথচ আমার পকেটে পয়সা সামান্য কম আছে। সময় থাকলে এক্ষুনি ফিরে গিয়ে একটা খালি বোতল বিক্রী করতাম।

রু আমেলিতে পৌঁছে অবশ্য সিনেমা দেখার কথা আমি ভুলে গেলাম। আমার প্রিয় রাস্তা গুলোর একটা এই রু আমেলি। সৌভাগ্যক্রমে, আরো কয়েকটির মতো মিউনিসিপ্যালিটি এ রাস্তাটিও পাকা করতে ভুলে গেছে। প্রচুর পাথরের টুকরো রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছড়ানো ছিটানো। কেবল একটি জায়গায় খানিকটা স্তুপ করে রাখা আছে। এই রাস্তাতেই হোটেল-প্রেটি। একটা ছোট গির্জেও আছে। দেখে মনে হয়, এদেশের প্রেসিডেন্ট আর তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্যেই একদা নির্মিত হয়েছিলো। কখনো সখনো একাধখানা সুন্দর ও ক্ষুদে গির্জা দেখতে ভলোই লাগে। ঢাউস ঢাউস জাঁকালো গির্জায় ভর্তি প্যারিস।

ব্রীজের মুখেই হাওয়া ভরা একটা বিশাল ফাঁকা জায়গা। পঁৎ আলেকজান্দার থ্রী। সারি সারি গাছ। কবিতার লাশ কাটা ঘর। মহান পূর্বপুরুষ। তাঁকে জনগন সেখানেই পেয়েছে, যেখানে চেয়েছিলো। ইউরোপের শেষ-বীর। তিনি আজ শান্তিতে শুয়ে আছেন গ্রানাইটের শয্যায়। আর তাঁর কবর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ার ভয় নেই। দরজার কবজা গুলো খুবই মজবুত। ঘুমিয়ে থাকো, নেপোলিয়ন! ওরা

তোমার মতাদর্শ চায়নি, চেয়েছিলো কেবল তোমার লাশটাই। নদীটা কাদাটে পানিতে ভরা। তাতে আলো পড়েছে। আমি জানিনা, ওই অন্ধকার নদীর তীব্র স্রোত দেখে আমার এমন বিচিত্র অনুভূতি কেন হচ্ছে। সেইসঙ্গে যেন প্রবলতর হচ্ছে, কোনোদিনও এই দেশ ছেড়ে না-যাওয়ার ইচ্ছেটাও। সেদিন তো এই রাস্তা দিয়েই আমি আমেরিকান এক্সপ্রেসে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নামে কোনো ডাক নেই। না-চেক্, না ক্যাবল্— কিচ্ছু না কিচ্ছু না। বীজের ওপর গুম গুম করছিলো গ্যালেরিজ সাফায়েতের ট্রেন। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। মেঘ-ভাঙ্গা রোদ্দুরে চিকচিক করছে ছাদগুলো। আমার মনে আছে, ট্রেনের ড্রাইভারটা পর্যন্ত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেই অপরূপ শোভা এক পলকে উপভোগ করে নিয়েছিলো। কী সহজ, কী সুন্দর, কী স্বাস্থ্যকর সেই দৃশ্য—যেন মনে মনে বিড় বিড় করে বলেছিলো সেই ট্রেন-ড্রাইভার। "বলেছিলো: আজ—এই তো বসন্ত আসছে!" আর কে না জানে, বসন্তকালে যে কোনো নুয়ে থাকা মানুষও প্যারিসকে সাক্ষাৎ স্বর্গ বলে মনে করে। নিজেকে মনে করে বেহেশতের বাসিন্দা। এবং এটা সে আন্তরিকতার সঙেই মনে করে—যেরকম আন্তরিকতার দৃষ্টিতে সেদিন ট্রেন ড্রাই-ভারটা তাকিয়েছিলো ইঞ্জিনের জানালা দিয়ে। প্যারিসের সঙ্গে একাত্মতার এই অনুভূতি সত্যি তুলনাহীন।—'আমার প্যারিস!' একটা লোক হতে পারে নির্ধন কিংবা বহিরাগত;

কিন্তু তাতে কি? প্যারিস তার। প্যারিস গরীব লোকে ভর্তি। আমার মনে হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব ভিখিরী আর সবচেয়ে অহঙ্কারী লোকরাই প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এবং সবাই অহঙ্কারী এ-জন্যে যে তারা প্যারিসীয়। এই মনোভঙ্গিই প্যারিসবাসীদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য নগর-চারিত্র থেকে পৃথক রয়েছে।

অবশ্য নিউইয়র্কের ব্যাপার অন্যরকম। সেখানে মস্ত বড় ধনীরও কানাকড়ি দাম নেই। নিউইয়র্ক হচ্ছে ঠাণ্ডা, চকচকে এবং ছিটগ্রস্থ। সেখানে ভাবনা নয়, ভবনেরই প্রাধান্য। নিউইয়র্কে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। সেই ম্যানহাটান—হুইটম্যান যা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেই শাদা জেলখানাগুলো, রুটির লাইন, প্রাসাদোপম সিনেমা হল, ভীড়, রাস্তা, পা, ঘরবাড়ি, স্কাইস্ক্র্যাপার, খাবার, পোস্টার, অপরাধ, প্রেম···সব মিলিয়ে বিশাল শূন্যতা। বিশাল অর্থহীনতা। আর ফরটি সেকেণ্ড স্ট্রীট? তারা বলে, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা রাস্তা। সবচেয়ে খারাপ তাহলে কোনটি?

ধনী-গরীব সবাই সে-শহরে পেছনে মাথা হেলিয়ে হাঁটে। কেননা, শাদা কারাগারগুলো বেশ উঁচু। মাথা হেলাতে হেলাতে তাদের ঘাড় ভেঙে যায়। তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় অন্ধ রাজহাঁসের মতো। তাদের ফ্যাকাশে মুখের ওপর আছড়ে পড়ে সার্চ লাইটের তীব্র আলো।

৬

'জীবন,' এমারসন বলেছেন, 'হচ্ছে মানুষের দিবারাত্রির ভাবনা-সমষ্টি।' যদি তা ই হয়, তাহলে আমি বলবো, আমার জীবনটা হচ্ছে মস্ত বড়ো একটা উদর। অবশ্য আমি কেবল সারাদিনই খাদ্যের চিন্তা করি না। রাতেও এর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমি ফের আমেরিকায় ফিরে গিয়ে সওদাগরী অফিসে চাকরি নিতে চাই না। ইউরোপের গরীব মানুষ হিশেবেই আমি পরিচিত হতে চাই। অবশ্য ঈশ্বর জানেন, আমি যথেষ্ট গরীব। এখন মানুষ শব্দটিই আমার সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাকি। গত সপ্তাহে আমি ভেবেছিলাম, আমার বেঁচে থাকবার সমস্যা-টির প্রায় সমাধান হয়ে এসেছে। আমি প্রায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছি। ঘটনাটা বলি। আমি সেদিন ছুটে গেলাম সের্গের কাছে। সে থাকে সারেনের এক ছোট্ট শিল্পী কলোনিতে। বিপ্লবের আগে সে ছিলো রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর ক্যাপ্টেন। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা এই লোকটা ভদ্‌কা খায় মাতের মতো। যুদ্ধজাহাজ 'পোটেমকিনে' ওর বাবা ছিলো অ্যাডমিরাল অথবা ওই ধরনের একটা কিছু।

একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সের্গের সঙ্গে আমার দেখা হলো।

খাবারের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সেদিন দুপুর নাগাদ চলে গেছি ফলিস বার্গেরের কাছাকাছি সরু একটা গলির মধ্যে। আমি কি করবো ভাবছি, হঠাৎ রাস্তার পাশে এসে একটা ট্রাক থামলো। আমাকে চুপচাপ পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্রাইভার—অর্থাৎ সের্গে বললো, লোহার ব্যারেল-গুলো ট্রাকে তুলে দেবে নাকি ভাই?' তার মানে সে এ-ব্যাপারে তাকে একটু সাহায্যের অনুরোধ জানালো। যখন সে শুনলো, আমি একজন আমেরিকান এবং বেকার, তার ফুর্তি দ্যাখে কে। তার অবস্থাতেই বোঝা গেলো, সে হন্তদন্ত হয়ে একটা ইংরেজির মাস্টার খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। আমি কীটনাশকের ব্যারেলগুলো ট্রাকে ওঠাতে ওর সঙ্গে হাত লাগালাম। একটু আগেই আমি কয়েকটি উড্ডীন প্রজাপতির স্পর্শ কামনা কর-ছিলাম। অথচ এখন ট্রাকে তুলছি পতঙ্গ-বিনাশী বিষাক্ত পদার্থের ড্রাম। ঘটনার কী নিষ্ঠুর বৈসাদৃশ্য। কীটনাশকের ব্যারেল, ব্যাটল্‌শিপ 'পোটেমকিন'—সর্বোপরি সের্গের ভদ্রতা। বিশালদেহী; কিন্তু কাঁচা। প্রতিটি ইঞ্চি একজন মানুষ। কিন্তু হৃদয়টা যেন মহিলার।

সে পাশের 'কাফে দ্য আতিস্তে' তক্ষুনি খাওয়াতে নিয়ে গেলো আমাকে। বললো, হলঘরের প্রবেশপথে একটা ম্যাট্রেস বিছাতে হবে তাকে। জানালো, ইংরেজি শেখানোর বিনি-ময়ে সে রোজ আমাকে একবার খাওয়াবে। বেশ ভরপেট রুশ খাবার। কোনো কারণে একদিন খাওয়াতে না-পারলে

তার বদলে নগদ পাঁচ ফ্রাঁ দেবে। শুনে তো খুশিতে আমি প্রায় আত্মহারা। কিন্তু সমস্যা একটাই। সারেনে থেকে রোজ রোজ আমেরিকান-এক্সপ্রেসে ঢুঁ মারা সম্ভব হবে না। বিকেলেই আমার হাতে গাড়ি-ভাড়া তুলে দিলো সের্গে। আমি যখন ওর কাছে ফিরে এলাম—তখন ডিনারের সামান্য দেরী। আমার সঙ্গে একটা ব্যাগ। তাতে সের্গেকে ইংরেজি শেখাবার মাল-মশলা। ক'জন অতিথি আছে বলে মনে হলো। দেখেই বোঝা যায়, ভীড়ের মধ্যে হৈ-হল্লা করে খাওয়া দাওয়া করতেই এরা অভ্যস্ত। তা, টেবিলে বসলাম আমরা মোট আটজন! আর তিনটে কুকুর। কুত্তারা আগে খায়। তারা খায় জইয়ের খাবার। তারপর আমরা খেলাম। জইয়ের খাবার খেলাম আমরাও। 'সেজ নাউস'—সের্গে চোখ নাচিয়ে বললো, 'সি এস্ত্ পাউর লে শিয়েনস, লে কোয়েকারওত্স, ইসি পাওর লে জেঁতেলম্যান, কা ভা!' জইয়ের পর এলো ব্যাঙের ছাতার সুপ আর সব্জী। তারপর বেকন, ফল লাল, মদ, ভদ্কা, কফি আর সিগারেট—একের পর এক। রুশ খাবার তো বেশ! সবাই হড়বড় করে কথা বলে খাবার সময়। খাওয়া দাওয়ার পর সের্গের আলসে দেখতে আর্মেনীয় বউটা কুকুরগুলোর দিকে ক'টা হাড্ডি ছুঁড়ে দিলো।

খাওয়া দাওয়ার পালা চুকে বুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিরা অদৃশ্য হলো। আশ্চর্য—যেন প্লেগের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

রয়ে গেলাম কেবল সের্গে আর আমি। এবং কুকুর তিনটে। সের্গের বউ ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে কৌচের ওপর। এঁটো-কাঁটা জড়ো করতে করতে সের্গে বললো, 'কুত্তারা খুব পছন্দ করে! ওদের জন্যে তোফা খাবার। ছোট কুত্তাটার পোকা হয়েছে!' বলতে বলতে সের্গে কুকুরগুলোর শরীর থেকে কার্পেটের ওপর ঝরে পড়া ক'টা শাদা পোকা পরীক্ষা করতে লাগলো অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে। পোকার বর্ণনা দিচ্ছিলো সে ইংরেজীতেই। কিন্তু তার সেই অপরূপ ইংরেজী—বাব্বাহ্—ভাবা যায় না। শেষে ডিকশনারীর শরণাপন্ন তাকে হতেই হলো। পোকাটার ইংরেজী নাম খুঁজে পেতেই বললো—'আহ! পেয়েছি। টেপ-ওয়ার্মস। ফিতে কৃমি!' আমার দিক থেকে এ-ব্যাপারে খুব একটা সাড়া না পেয়ে সের্গে খানিকটা বিব্রত হলো যেন। তারপর সে আরো খানিকটা উবু হয়ে পোকাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলো আরো বেশী মনোযোগের সঙ্গে। এমনকি একটাকে হাত দিয়ে টেবিলে তুলে ফলগুলোর পাশেই রাখলো।

ঃ হাহ, হিম নট ভেরী বী—গ!'—সে বললো—'এরপর তুমি আমাকে পোকার ওপরেই ইংরেজি পড়াবে, কেমন? তুমি বেশ পড়াও। আমি চমৎকার শিখে ফেলবো।'

মাদুরের ওপর শুয়ে আমি আমি—একটা সরু প্যাসেজে। কীটনাশকের বিচ্ছিরি গন্ধে আমার মাথা ঘুরছে। খাবার-গুলো আবার যেন ঘুরে ঘুরে আসছে—জই, ব্যাঙের ছাতা,

বেকন, ভাজা আপেল। দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট ফিতে-কৃমিটা পড়ে রয়েছে ফলগুলোর পাশে। দেখছি টেবল ক্লথের ওপর কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা। শুনছি কুকুরগুলোর অসুবিধের কথা। ফলিস বার্গেরের হেথায় হোথায় ছুটাছুটি করছে অগুনতি আরশোলা, উকুন আর ছারপোকা। আমি দেখতে পাচ্ছি, মানুষ পাগলের মতো গা চুলকোচ্ছে। চুলকোতে চুলকোতে তাদের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। দেখছি, লাল পিঁপড়েরা সেনাবাহিনীর মতো মার্চ করে উঠে যাচ্ছে ফিতেকৃমির ওপর। চোখের সামনে সমস্ত কিছুকে ঢেকে ফেলেছে তারা। আমি দেখতে পাচ্ছি, কোরাস-গার্লরা তাদের পোশাক-আশাক খুলে ফেলে ন্যাংটো হয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। দর্শকরাও খুলে ফেলছে নিজেদের কাপড় চোপড়। এবং তারাও একজন অন্যজনের গা চুলকে দিচ্ছে বাদরের মতো।

আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। যাই হোক না কেন, আমি থামার মতো একটা জায়গা পেয়েছি। পেয়েছি এক-বেলা খাবার নিশ্চয়তা। আর সের্গে যে একটা ইট—তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ঘুমুতে পারি না। যেন একটা মর্গের মধ্যে শুয়ে আছি। এমন আরশোলা, উকুন আর ছারপোকা অধ্যুষিত মাদুরের ওপর ঘুমানো কি চাট্টিখানি কথা? ভোর বেলাতেই আমি অপেক্ষায় ছিলাম, সের্গে কখন ট্রাক নিয়ে প্যারিস যাবে। বললাম, আমাকে নিয়ে চলো। বলতে সত্যি কষ্ট হলো যে, আমি

চলে যাচ্ছি। তাই কিছু বললাম না। আমি ব্যাগখানাও রেখে যাচ্ছি এখানে। এবং আরো কিছু টুকিটাকি জিনিশ। প্লেস পেরেইরেতে ট্রাক পৌছাতেই আমি লাফিয়ে নেমে হাওয়া। এখানে নেমে পড়ার পেছনে অবশ্য বিশেষ কোনো কারণ ছিলো না। আমি মুক্ত, ব্যাস, এইটেই আসল কথা।...

সারা শরীর এখন আমার পাখির মতোই হালকা। যেন ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি আমি হেথায় হোথায়। মনে হচ্ছে, আমি জেল থেকে খালাশ পেয়েছি। সব কিছু আমার চোখে নতুন লাগছিলো। সব ব্যাপারেই যেন উৎসাহ উছলে পড়ছে আমার। এমন কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও। রু-দু ফবুর্গের একটা জানালার পাশে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। শরীরচর্চা কেন্দ্র। ব্যায়ামের আগে ও পরে মানুষ কি ছিলো এবং কি হয়েছে তার প্রামান্য আলোকচিত্র। সবগুলো যেন ব্যাঙ। কেউ কেউ আবার ন্যুডও। দাঁড়িও আছে গালে। আমি ভেবেও পাই না, লোকগুলো প্যারালেল বার আর ডাম্বেল নিয়ে সময় কাটায় কি করে। অবশ্য ব্যারন দে-শর্লোরও দাঁড়ি আছে, কিন্তু তিনি কখনো ন্যাংটো হয়ে ছবি তুলবেন না। বরং তার পায়ে থাকবে প্যাটেন্ট-লেদারের ঝকঝকে জুতো। কোটের বুক পকেটে থ্রী কোয়ার্টার মাথা বের করে থাকবে শাদা হাত-রুমাল। সম্ভব হলে ল্যাপেলে গোঁজা থাকবে লাল রিবন। তিনি অবশ্যই বিছানায় যাবার সময় পাজামা পরবেন।

সন্ধের সময় প্লেস ক্লাইসির গঁমো প্যালেসের উল্টোদিকে দেখতে পেলাম সেই ক্ষুদে বেশ্যাকে। ছড়ি হাতে যথারীতি দাঁড়িয়ে। সব সময়—সে ওই রকম দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। আঠারো বছরের বেশী বয়সের বলে তাকে কিছুতেই মনে হয় না। তার অনেক রেগুলার কাস্টমার আছে, যেমন আমি। মধ্যরাতের পর ছড়িটা মাটিতে গেঁথে সে তার বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার পেছনের ছোট্ট খুপরিটা যেন আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলে। এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে সে হয়তো আমাকে রুগ্ন রাজহাঁস বলেই মনে করছে। বিছানায় লাঠি নিয়ে শোয়া নিশ্চয়ই বিদঘুটে ব্যাপার। অনেকে লোহা লক্কড়ের টুকরো পাশে রেখেও শুতে পারে। কিছুই করার নেই। যার যেমন রুচি!

রু দে দেম এ পৌঁছে ভাবলাম, পিকোভারের কাছে যাই। আর এক ফকিরনির বাচ্চা। পত্রিকায় চাকরি করে। তার অভিযোগ, রাত্রে সে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা ঘুমাতে পারে। সকাল আটটায় উঠে সে চলে যায় এক ডেন্টিস্টের অফিসে। 'বাড়তি রোজগারের আশায় নয়'—সে বলে—'এক জোড়া বাধাঁনো দাঁতের পাটি কেনার জন্যেই তার এ-পার্টটাইম চাকরি। ঃ ঘুম পেলে প্রুফ দেখা বড়ই কষ্টের!'—পিকোভার বলে। বউয়ের মতে, এই ঘুমের জন্যেই ওর চাকরিটা যাবে। অবশ্য চাকরির থোড়াই পরোয়া করে পিকোভার। সে ঘোরতর সঞ্চয়ী। নাকি কিপ্টে? সে সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো

জমিয়ে রাখে এবং পরে পাইপে ভরে তা খায়। কোটের এখানে ওখানে সে যে কতো সেফটিপিন লাগিয়েছে, তার শুমার হয় না। বসের ওপর তার ক্রোধের অন্ত নেই। বলে: 'একটা সেমিকোলন বাদ পড়লে ব্যাটা আমাকে মুতিয়ে ছাড়বে!' বউ সম্পর্কে বলবে: 'মাগিটা এমন শুকনো কাঠ যে, লাগাবার পরও ওর মধ্যে একটুখানি কৃতজ্ঞতাবোধ দেখা যায় না। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো!' ওকে তেলিয়ে ওর মতো কঞ্জুষের কাছ থেকে কিছু ম্যানেজ করা গেলো। আমি চেয়েছিলাম, আরো কিছু আদায় করি। কিন্তু তা ছিলো অসম্ভব। সে যাই হোক, কফি আর ক্রয়সাঁত খাবার পক্ষে এ যথেষ্ট। গেয়ার সাঁত লাজারের কাছে একটা শস্তা রেস্তোরাঁ আছে।

ভাগ্য ভালো, লাভাবো-র কনসার্টের একটা টিকেট পেয়ে গেলাম। কিন্তু আর একটি বিষয় আঁচ করতে পেরে রীতি মাতা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি। আশ্চর্য, এখানেও ফরমাল ডিহাইড? কে জানে ওই বিদঘুটে গন্ধের কীট-নাশক ওষুধ সেগে এখানেও সরবরাহ করে কিনা। তবে সান্তনা এই এখানে একটি লোকও গা চুলকোচ্ছে না। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। একটা ক্ষীণ গন্ধ পারফিউমের··· খুবই ক্ষীণ। যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হবার আগে থেকেই শ্রোতা-দের মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। স্ব-আরোপিত যন্ত্রনার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই কনসার্ট। কনডাক্টরের দণ্ডটি শূন্যে নেচে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো। ঐক-

তান। আমার মন বিস্ময়কর ভাবে সজাগ। এর কারণ, আমার খুলির মধ্যে লাগানো আছে এক হাজার আয়না। বাজনার ব্যবহৃত সুর লহরী যেন পানির মধ্যে কাচের বলের নাচন। আমি আজকের মতো এমন খালি পেটে কোনোদিন কোনো কনসার্টে আসিনি। কাজেই কোনো শব্দই আমার কানকে ফাঁকি দিতে পারছে না। যেন পিন পড়লেও তার শব্দ আমার শ্রবন এড়াবে না। এই যন্ত্রসঙ্গীত কতক্ষন চলবে, কে জানে? সময়ের হিশেব যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

ইন্টারভ্যালের সময় অর্ধচেতনার মধ্যে দিয়ে মনে হলো, আমার শরীরের ভেতর রয়েছে একটা হ্রদ। হ্রদের পানি জেলির মতো ঠাণ্ডা। সেখানে সাঁতরাচ্ছে ঠ্যাংঅলা পাখিদের ভীড়। একটু পরে আবার শুরু হলো অনুষ্ঠান। জানালাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আবার। আবার জ্বলে উঠেছে আলো। দর্শী আসনে বসা যে শ্রোতাকে আমি তুর্কি অফিসার বলে মনে করেছিলাম হঠাৎ দেখি তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন একজন মহিলায়। আর, মহিলার মাথার ওপর একটা ফুলদানী।

এবার চলছে সঙ্গীতের অট্টরোল। যারা অনেক কষ্ট করে কাশি চেপে রেখেছিলো, তারা এখন প্রাণপণে কেশে গলা সাফ করতে লাগলো। হঠাৎ দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। সবাই চুপ করে গোছগাছ হয়ে বসলো আবার। সঙ্গীত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক শ্রোতা সীটের ওপর আঙুল বোলানোর ঢঙে বাদকদের অনুসরন করতে শুরু করলো। তাদের

এতোটাই সিরিয়াস মনে হচ্ছিলো আমার যে, কেউ যদি হঠাৎ তাদের কানের কাছে ব্রাহম্‌স, বিঠোফেন, মেনডেলিভ, হারঙ্গেগভিনা এই নামগুলো আওড়ায়, তারা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে :—৪, ১৬৭, ২৮৯।

ডেবাসী-পর্বে এসে পরিবেশ সম্পূর্ণ বিষিয়ে গেলো, বলতে হবে। পাছার ওপর ক্রমাগত লাথি মারলে কেমন লাগে? আমার মনে হচ্ছিলো, বিশাল এক শূন্যতার মধ্যে ঝরে পড়ছে সংখ্যাগুলো। হঠাৎ আলো ঘুরে গেলো। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, 'আলো ঘোরে কীভাবে!' আমার পাশের শ্রোতাটি নির্বিকারে ঘুমোচ্ছিলো। তার বিরাট থাবা আর মোম মসৃণ গোঁফ জোড়া দেখে তাকে দালাল বলেই মনে হয়। বজ্রমুষ্টি মানুষ আমি পছন্দ করি। ওই লোকটা কেন ঘুমিয়ে পড়ছে না? সে তো যখন খুশি তখনই সঙ্গীতানুষ্ঠানের টিকেট কেনার ক্ষমতা রাখে। আমি লক্ষ্য করছি, শ্রোতাদের মধ্যে যার পোষাক যতো দামী, সে ঠিক ততোটাই গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। কথা একটাই যে, তারা ধনী। কোনো গরীবের যদি এখন ঘুম পেয়ে যায়, তাহলে সে বারবার সংকুচিত হয়ে পড়বে এই ভেবে যে, সে মহা অন্যায় করে ফেলেছে। সঙ্গীতকারের বিরুদ্ধে সে করে বসেছে অপরাধ।

অবশ্য স্প্যানিশ—পর্বে চট্‌কা ভেঙ্গে গেলো শ্রোতাদের। সবাই চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসেছে। ড্রামের সে কি বিরতিহীন

গর্জন। মনে হলো, শ্রোতারা শিগগীরই তাদের আসন থেকে ছিটকে পড়বে—অথবা নিদেন পক্ষে ছুঁড়ে ফেলবে মাথার টুপি। এই বাজনার সত্যি কিছু একটা আছে। উত্তেজনাকর আর বীরত্বব্যঞ্জক। যা শ্রোতাবৃন্দকে ক্ষেপিয়ে তোলে। যেন র‍্যাভেল —অবশ্য সে যদি তা হতে চেয়ে থাকে কখনো। হঠাৎ সব-কিছু নীরব। যেন র‍্যাভেলের কথাই তার আচমকা মনে পড়ে গেছে। কিন্তু না, এই সঙ্গীতকার র‍্যাভেল নয়। র‍্যা-ভেল ছিলো স্বেচ্ছা বন্দী। আমার মতে, এ একটা বিরাট ভুল। শিল্পকে হতে হবে পূর্ণ-দৈর্ঘ। তুমি যদি ড্রাম দিয়ে আরম্ভ করো, তোমাকে শেষ করতে হবে ডায়নামাইট অথবা টি. এন. টি দিয়ে। র‍্যাভেল আঙ্গিকের ক্ষেত্রে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এ যেন গড় পরতা লোকের জন্য রান্না করা নিরামিষ, শুতে যাবার আগেই যা হজম হয়ে যায়।

আমার চিন্তা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। ড্রাম থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভেতর জমে ওঠা সুর গুলো ঝড়ে পড়ছে বাইরে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্প্যানিয়ার্ড। তাকে দেখে মনে হয়, সে রঁদার বালজাকের জন্যে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। গলার ওপর দিকটা মনে পড়িয়ে দেয় বাফেলো বিলের কথা। সামনের দিককার একটি আসনে এক মহিলা বসে আছে দু'টি পা ফাঁক করে। বেশ বড়োসরো ফাঁক! মাথাটা পেছ-নের দিকে হেলানো। মনে হয় ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা। লাল হ্যাট মাথায় পড়া ওদিককার ওই মেয়েটিও সুন্দরী।

তবে মনে হয়, ওর রক্তক্ষারণ হচ্ছে! একবার কল্পনা করুন, কন সার্ট থেকে এরা ঘরে ফিরছে রক্তের ছোপ নিয়ে। স্বরলিপি ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কেননা শোনা এবং ভাবা দুটোই এখন অসম্ভব। যখন সঙ্গীতটাই একটা স্বপ্ন, তখন কোনো কিছু স্বপ্নে দেখাও অসম্ভব। শাদা দন্তনা পড়া এক মহিলা কোলের ওপর রাজহঁস নিয়ে বসে আছে। কাহিনীটি হচ্ছে, লেডা যমজ সন্তান প্রসব করেছে। জন্ম দিচ্ছে তো প্রত্যেকেই—কেবল লেসবীয়দের কথা আলাদা। মহিলার মাথাটা ওপরের দিকে তোলা, গলাটা খোলা। সে পূর্ণ-সচেতন। সঙ্গীতের মৃদু ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে তার সারাদেহ কাঁপছে। জুপিটার ফুটো করছে তার কান। ক্যালিফোর্নিয়ার বাগ্‌ধারা—ডাঙর পোনাঅলা তিমি, জানজিবার, আলকাজার।··· 'গুয়াদেল কুইভার পেরিয়ে যাবার সময় হাজার হাজার মসজিদ!' ভাসমান হিম শৈলের গভীরে, দিনগুলো যেন লাইলাক। দু'টি দিক-নির্দেশ লাগানো টাকা-সড়ক। কুলকুচো···জারোস্কীর রদ্দি বই হাতে হুকার···নদীর আলো···

৭

আমেরিকায় আমার বেশ ক'জন হিন্দু বন্ধু ছিলো। এদের কেউ ভালো, কেউ খারাপ। কেউ বা আবার ভালো মন্দে মেশানো। পরিস্থিতি আমাকে এমন এক জায়গায় উপস্থিত করেছিলো, যেখান থেকে আমি তাদের সহায়তা করতে সক্ষম হই। আমি তাদের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করেছি, নানা জায়গায় পাঠিয়েছি, এমনকি প্রয়োজনে খেতেও দিয়েছি। তারা ছিলো খুবই কৃতজ্ঞ। তবে আমি অবশ্যই বলবো যে, তাদের কৃতজ্ঞতার মাত্রা ছিলো অতিরিক্ত। যার দরুন আমার জীবন একেক সময় দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। এদের মধ্যে দু'জন ছিলো সন্ন্যাসী, যদি সন্ন্যাসী আমি চিনে থাকি। এদেরই এক জনের নাম গুপ্তে। একদিন ভোর বেলা দেখা গেলো, গুপ্তে তার বিছানায় মরে পড়ে আছে। তার গলাটা কাটা। সে থাকতো গ্রীনিচ ভিলেজের এক শস্তা হোটেলে। তার লাশটা ছিলো বিবস্ত্র। মৃতদেহের পাশেই পড়ে ছিলো তার বাঁশিটা। সে আত্মহত্যা করেছে না কেউ তাকে খুন করেছে—ব্যাপারটা কখনো আবিস্কৃত হয়নি। যদিও এতে খুব একটা কিছু আসে যায় না।···

আর নানান্‌জাতির কাছে কিভাবে আমি পৌঁছি, তা গোড়া থেকে চিন্তা করতে হয়। আশ্চর্য, আমি ওর কথা এতদিন ভুলে গিয়েছিলাম। রু সেলসের হোটেল কক্ষে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর কথা বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেলো আমার। শুয়ে শুয়ে কতো কি আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। লোহার খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে আমি নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করছিলাম। ভাবছিলাম, কতো অপাংক্তেয়, কতো শস্তা হয়ে গেছি আমি। হঠাৎ যেন দৈববাণী হলো: ননেন তাইতি! নিউ ইয়র্কে আমরা ওকে ননেন তাইতি বলেই ডাকতাম। মিষ্টার ননেন তাইতি।

নিউ ইয়র্কের এক জমকালো হোটেলের মেঝেয় আমি থাকি। কক্ষটি ভাড়া করেছে নানান্‌জাতি। আমি থাকি তারই আশ্রয়ে। সে আমাকে গা—চিটচিট্‌ করা কম্বল দিয়েছে দু' খানা। ধুলো ভরা মেঝের ওপর ওই কম্বল বিছিয়েই আমি শুই। সারাদিনের প্রতিটি ঘন্টায় ছোট ছোট কাজ করতে হয় আমাকে। ভোর হতে না হতেই সে রূঢ়ভাবে আমার ঘুম ভাঙ্গায়। কি? না আমাকে তার রান্নার জন্যে পেঁয়াজ রসুনের খোসা ছাড়াতে হবে। তার বন্ধু কেপি অবশ্য আমাকে হুশিয়ার করে দিয়েছে। যেন ও সব খাবার আমি না খাই। বাজে জিনিষ! কিন্তু ভালো বা মন্দ, যাই হোক খাদ্য তো। ওটাই আসল কথা। সামান্য একটু খাবারের জন্যে আমি মুড়ো ঝাটা দিয়ে তার কার্পেট ঝাট দিতে প্রস্তুত। কেবল তাই

নয়—আমি তার কাপড় ধুতে এবং তার আহার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নেঝের আবর্জনা পরিস্কার করতেও পেছ পা নই। আমাকে হস্তগত করার পর থেকে সে বেশ সাফসুতরো মানুষ হয়ে উঠেছে। এখন সব কিছু পয় পরিস্কার করতে হবে। দিতে হবে ঝাটপাট। চেয়ার গুলো যেন ঠিকঠাক সাজানো থাকে, ঘড়ি যেন অবশ্যই বাজে, টয়লেটে ফ্লাশ যেন গোলমাল না করে। এমন ক্ষ্যাপা হিন্দু আমি আর দু'টি দেখিনি। ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে প্রানখুলে হাসতে পারবো আমি। কিন্তু এমুহুর্তে আমি একজন বন্দী ; একটা বেজন্মা স্পর্শেরও অযোগ্য !

কোনো কোনো রাত্রে আমি হোটেলে ফিরতে না-পারলে এবং সকালে তার সঙ্গে দেখা হলে সে বলে, ও ঃ, তুমি তাহলে মরো নি দেখছি। আমি তো ভেবেছি, 'গ্যাছো প্যাঁজের ক্ষেপে !' আমি তাকে যতো বারই বলি, আমি কপর্দকহীন, সে ততোই বেশী উৎসাহী হয়ে কাছাকাছি শস্তা হোটেল গুলোর ঠিকানা দেয়। শেষে বিরক্ত হয়েই আমি বলিঃ আরে মিয়া, শস্তা হোটেলে রুম নেবার ক্ষমতাও যে আমার নেই, তাকি তুমি বোঝনা ? তখন সে বলে ওঠে "ওহ হো, তাই তো ! তোমার পকেটে যে পয়সা নেই, তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।...আচ্ছা এনড্রি, যখন ডাক আসবে, যখন মিস মোনা তোমার নামে টাকা পাঠাবে, তুমি আমার সঙ্গে বেরুবে তখন। তোমাকে দিব্যি একখানা রুম খুঁজে দেয়া যাবে

তখন ; কি বলো ?' কথাটুকু শেষ করে একবার নিঃশ্বাস নিয়েই পরক্ষণে আমাকে অনুরোধ করবে : 'আমার কাছেই থাকো না কেন তুমি ? যতোদিন তোমার খুশি ! ছ'মাস, সাত মাস, এনড্রি···এখানে তুমি থাকায় আমার কতো সুবিধে !'

আমি আমেরিকায় যে সব হিন্দুর জন্যে কিছুই করিনি, নানান-তিতি হচ্ছে তাদেরই একজন। সে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো ধনী ব্যবসায়ী বলে। মুক্তোর কারবার আছে। প্যারিসের রু লাফায়েতে তার বিলাসব-হুল হোটেল-রুম, বোম্বেতে একটা ভিলা আর দার্জিলিংয়ে একখানা বাংলো। প্রথম দর্শনে লোকটাকে আধ-পাগলা বলেই মনে হয়েছিলো। কিন্তু এই আধপাগলারাই আবার বেশ ভাগ্যবান হয়। আমার জানা ছিলো না যে, নিউইয়র্কে হোটেলের বিল শুধতো সে মুক্তো দিয়ে। হ্যাঁ টাকা নয়, মালিকের প্রসারিত হাতে সে তুলে দিতো ইয়া বড় বড় মুক্তো ! আমার মনে আছে নিউইয়র্কের এক হোটেলের লবিতে সে কি রকম হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলো। সে কি হাঁকডাক। সে কি জাঁকজমক। এই বেল বাজিয়ে লোক জড়ো করছে, মেহমানদের জন্যে খাবারের অর্ডার দিচ্ছে, পোর্টারকে থিয়েটারের টিকেট কিনে আনার হুকুম দিচ্ছে, সারাদিনের চুক্তিতে ট্যাক্সি ভাড়া করছে। হ্যানো করছে, ত্যানো করছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই,

পকেটে একটা পয়সাও তার নেই। গলায় মালার মতো সে ঝুলিয়ে রাখতো একরাশ মুক্তো। একটা জিনিসের দাম দিতো এক এক খণ্ড মুক্তোয়। আমি অনেকটা হিন্দু ছেলেদের মতো বলে সে আমাকে ধন্যবাদ দিতো। পিঠ চাপড়ে বলতো, 'হিন্দু ছেলেরা খুব বুদ্ধিমান, বুঝলে এনড্রি ?··· খুবই বুদ্ধিমান!' তারপর আমাকে আশ্বাস দিতো, দেবতা অমুক আমার মঙ্গল করবেন।

নানানতিতি টয়লেট পেপার ব্যবহার করতো না। 'মাফ করবেন' শব্দ দু'টিও সম্ভবতঃ গুজরাতি অভিধানে নেই। যেদিন আমি ওর অ্যাপার্টমেণ্টে পৌঁছলাম—দেখি, একটা নোংরা গামলার ওপর সে বসে আছে। নুলো হাতখানা তার ঘাড়ের পেছনে রাখা। গামলার পাশেই একটা পেতলের ঘটি—যা পানি বদলানোর কাজে লাগে। সে আমাকে কথা বলতে বারণ করলো—কেননা সে পূজায় বসেছিলো। আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম। যেন একটা বিধর্মী। দেখতে লাগলাম, সে মন্ত্র পাঠ করছে, গান গাইছে, আর থুথু ছিটিয়ে ভরে ফেলছে গামলাটা। ভাবলাম, এটাই তাহলে রু লাফায়েতের সেই বিলাসবহুল হোটেল রুম, যার কথা সে নিউইয়র্কে বলেছিলো। রু লাফায়েত নামটা শুনেই তো আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিলো সেদিন। আমার মনে ধারনা জন্মেছিলো, কেবল কোটিপতি আর মুক্তো ব্যবসায়ীরাই ওই এলাকায় বসবাস করে। শুনতে কী সুন্দর—রু লাফায়েত! বিশেষ করে

শব্দটি যদি পুকুরের ও-পাড়ে বসে কেউ উচ্চারণ করে। যেমন —ফিফথ্ এভিনিউ! যাই হোক, আমি এখন সেই রু লাফায়েতের বিলাস-বহুল হোটেলের একটি কক্ষে, একটা পাগলা পাতিহাঁসের সামনে বসে তার উপাসনা উপভোগ করছি। আমি যে-চেয়ারটাতে বসেছি তা নড়বড়ে। বিছানার চাদর ছেঁড়া। ওয়ালপেপার জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। আমি যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে নিচে রু লাফায়েতের আভিজাত্য চোখে পড়ে। দেখতে পাচ্ছি—সেই সব অভিজাতরা বসে বসে মাটির কলকেতে ধুমপান করছেন। ভাবছিলাম, এই তাহলে তার অভিজাত এলাকার নমুনা! দার্জিলিংয়ের বাংলোটাও যেন আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো।

রোববারে টিন-টাবে গোসল করে নানানতিতি। তারপর পোশাক-আশাক পরে কাবার্ডের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে। তৃতীয় তাকের ওপর একটা ছোট্ট পুতুল। সে ওই মূর্তির সামনে বসে। অং বং মন্ত্র আওড়াতে থাকে প্রাণপণে। সে বলে, তুমি যদি এই মন্তরটা রোজ আওড়াও—তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। কী যেন নাম সেই দেবতাটা, তাঁর ভক্তদের কখনো ভোলেন না। সে আমাকে ট্যাক্সি-দুর্ঘটনায় নুলো হয়ে যাওয়া হাতটা দেখিয়ে বললো, ওই দিন আমি পুজা-অর্চনায় অবহেলা করছিলাম। এ তারই ফল, বুঝলে? তার হাতটা দেখে ঠিক যেন একটা ভাঙা কম্পাসের মতোই

মনে হয়। হাত আর একে বলা যাবে না এখন। হাতের ক্ষত সেরে উঠলেও দু'টো মাংসপিণ্ড সেখানে জেগে আছে। দেখতে অবিকল কুকুরের অণ্ডকোষের মতো। পূজা করতে করতেই বোধহয় তার মনে পড়ে গেলো ডাক্তারের উপদেশ। তিনি ওকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কম বাছাবাছি করতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে একটা খাদ্য-তালিকা বানাবার অনুরোধ জানালো নানানতিতি। বললো, তাতে যেন প্রচুর মাছ মাংস থাকে। আর যেন আমাকে খুশি করবার জন্যেই বললো—ঝিনুক টিনুকও থাকবে, কি বলো এনড্রি! যদিও আমি বেশ বুঝি, ঝিনুক কেনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও তার নেই। ঝিনুক তো ঝিনুক—মাছ মাংসও যে সে কী পরিমান কিনবে, তাও আমি বেশ জানি! অন্ততঃ আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা অনেক দিন ধরে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি স্রেফ ডালভাত। একটা ভাঁড়ারের ভেতর ডাঁই করা আছে শুকনো খাবার। আর গেলো হপ্তায় যে মাখন সে কিনেছে মনে হয় তার একটুও নষ্ট করবে না। যখন সে মাখনের দলার ওপর থেকে পচা অংশটা পরিস্কার করে, তখন এমন বিকট গন্ধ বেরোয় যে ভূত পর্যন্ত ছুটে পালাবে। প্রথম প্রথম আমিও দৌড়ে পালাতাম ওর ওইসব ঘাঁটা-ঘাঁটির সময়। কিন্তু এখন সয়ে গেছে। খেতে বসে আমাকে বমি করাতে পারলেই যেন ও সবচেয়ে বেশী খুশি হতো। শুকনো রুটি আর পচা পনিরের সঙ্গে ফেটে যাওয়া দুধ

মিশিয়ে নিজের হাতে পিঠে বানাতো সে। তারপর তুলে রাখতো কাবার্ডে!

মনে হয়, বছর পাঁচেক যাবৎ কোনো কাজই সে করছে না। রোজগার করেনি একটা পাই-পয়সাও। ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বেলেছে সে। আমাকে এখন শোনায়, ভারত মহাসাগরের বিশাল আকৃতির মুক্তোর গল্প। যার একটি পেলেই একজন মানুষের সারা জীবন কেটে যায়। এখন আরবরাই নাকি একচেটিয়া কারবার চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তোর। তবে নানানতিতিও তো বসে নেই। নিয়মিত দেবতার সেবা করছে। পূজায় বসছে উপাচার সাজিয়ে। দেবতা কি আর বিনিময়ে কিছুই দেবেন না। নিশ্চয়ই দেবেন। মুক্তোর ব্যবসা আবার জমে উঠবে, একদিন। পাঁচ বছর দেরী হতে পারে। বিশ বছরও লাগতে পারে। দেব বুমারুম যেদিন ইচ্ছে করবেন, সেদিনই আবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। 'আর ব্যবসা যখন আবার জমজমাট হয়ে উঠবে এনড্রি—তুমি পাবে লভ্যাংশের দশ পার্সেন্ট। তোমার কাজ হবে চিঠিপত্র লেখা। কিন্তু এনড্রি, তুমি প্রথমেই চিঠি লিখে এমন একটা ব্যবস্থা করবে যাতে আমরা ভারত থেকে বাকিতে মাল কিনতে পারি। অবশ্য চিঠির জবাব পেতে ছ'মাস লাগতে পারে। লাগতে পারে সাত মাস·· ভারতে জাহাজ চলে খুব ধীরে ধীরে।' বেচারা ছোট্ট পাতিহাঁস! সময় সম্পর্কে কোনো ধারনাই তার নেই। যদি আমি জিজ্ঞেস করি, 'সুনিদ্রা হয়েছে তো?'

তার জবাবে সে বলবে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খুব ভালো ঘুমিয়েছি এনড্রি। আমি তো ভালোই ঘুমোই। এক এক সময় আমি তিন দিনে বিরানব্বই ঘণ্টা ঘুমোই।'

একদিন আমার বন্ধু আনাতোলি এসেছে। নানানতিতি খুব খুশী। ফলে আনাতোলিকে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো। পরিতৃপ্তি সহকারে গলধঃকরণ করতে হলো সেই বিখ্যাত পিঠে!—'তুমি রোজ আসবে!' নানানতিতি বললো—'আর আমাকে রুশ ভাষাটা শেখাবে। আমি রুশ ভাষায় কথা বলতে চাই! শব্দটা যেন কিভাবে উচ্চারণ করতে, আবার! ওই যে—বোর্স্ৎ! কথাটা লিখে রাখো না এনড্রি।' আমি শব্দটা কীভাবে টাইপ করি, তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তবে তার তৃপ্তি। তা টাইপ-রাইটার একটা সে কিনেছে। ডাক্তারই পরামর্শ দিয়েছিলো, তার হাতটার ব্যায়ামের জন্যে মাঝে মধ্যে টাইপ-রাইটার ব্যবহার করতে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে ক্লান্তি ও বিরক্তির কারণে ওই 'ইংরেজি টাইপ-রাইটার' ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছে।

যখন শুনলো আনাতোলি ম্যাণ্ডোলিন বাজায়, সে বললো, 'ভেরি গুড! তুমি রোজ এসে আমাকে বাজাতে শেখাবে। এই তো, ব্যবসাটায় আর একটু দাঁড়াতে পারলেই আমি একটা ম্যাণ্ডোলিন কিনে ফেলবো। আমার হাতের জন্যে এটা খুব উপকারী হবে!' পরের দিনই সে নিচতলা থেকে একটা গ্রামোফোন চেয়ে আনলো। 'তুমি আমাকে নাচ শেখাও

এনড্রি। আমার পাকস্থলীটা খুব বড়ো।' আমি ভাবছি, ও কবে কিনে নিয়ে আসবে দশাসই সব মাংসের টুকরো, যা দেখে আমি বলতে পারি, 'তুমি আমার হয়ে ওতে একটু কামড় দাও না, মিস্টার নানানতিতি। আমার দাঁতগুলো তেমন শক্ত নয়!'

একটু আগেই বলেছি, আমি এখানে আসবার পর থেকেই অতি-রিক্ত গোছানো মানুষে পরিনত হয়েছে নানানতিতি। যেমন কথা নেই, বার্তা নেই—সে হঠাৎ বলে বসবে, 'গতকাল, তুমি তিনটে ভুল করেছো এনড্রি। প্রথম ভুল, পায়খানার দরজা আটকাওনি—সে-জন্যে সারারাত দ্রুমদাম শব্দে আমি ঘুমোতে পারিনি। দ্বিতীয়, রান্নাঘরের জানালা খোলা রেখেছিলে—যার ফলে সেটি ভেঙে গেছে। আর দুধের বোতল বাইরে রাখতে ভুলে গিয়েছিলে তুমি। লক্ষ্মীটি, সব সময় রাতে শুতে যাবার আগে দুধের বোতল বাইরে রাখবে। আর ভোরবেলা রুটি আনবে, কেমন?'

ওর বন্ধু কেপি প্রত্যেকদিন আসে। ভারত থেকে কোনো লোক এদেশে বেড়াতে এলো কিনা, তারই খোঁজে সে আসে। কেপির মতে, তারা সবাই নবাব। একটা ম্যানিলা চুরুট আর এক পাত্তর মদের জন্যে সে যে-কোনো হিন্দুর পাছা টিপবে। কেবল মাত্র হিন্দুর—কিন্তু কোনো ইংরেজের নয়। তার সংগ্রহে প্যারিসের প্রতিটি বেশ্যালয় আর সেখানকার রেটের তালিকা আছে। দোকান থেকে দশ ফ্রাঁর জিনিস কিনলেও সে তার

কমিশন আদায় করে। তুমি যে জায়গাতেই যাও না কেন, কেপি জানে সবচেয়ে শর্টকাটে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সে প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, ট্যাক্সিতে যাবে কিনা। যদি তুমি 'না' বলো, সে বুদ্ধি দেবে বাসে যাবার। যদি তাতেও তোমার না কুলোয় তবে সে তোমাকে স্ট্রীট-কার কিংবা মেট্রোয় চাপবার পরামর্শ দেবে। অথবা সে তোমাকে পয়সা বাঁচাবার জন্যে পায়ে হাঁটতে বলবে এবং বেঁচে যাওয়া সেই এক অথবা দুই ফ্রাঁয় তাকে একটা চুরুট খাওয়াবার জন্যে আবদার করবে।

কেপি বেশ অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। প্রত্যেক রাতে এক একটি নারী সম্ভোগ ছাড়া তার আর কোনো আকাঙ্খা নেই। যে-সামান্য পয়সা সে রোজগার করে তা নাচের আসরেই ফুঁকে দেয়। বোম্বেতে তার বউ আছে। আটটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতে কি? যখন তখন সে তার পছন্দ হওয়া মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। রু কঁদরে সে ষাট ফ্রাঁ মাসিক ভাড়ায় একটা ঘর নিয়েছে। নিজেই সাজিয়েছে মনের মতো করে। এ-জন্যে সে গর্বিত। কলমে সে ব্যবহার করে বেগুনি রঙের কালি। এ-কালির লেখা নাকি বেশীদিন টেঁকে। নিজেই কাপড় চোপড় ধোয়, ইস্ত্রি করে। পালিশ করে নেয় জুতো। সামান্য একটা চুরুটের বিনিময়ে সে তোমাকে সারা প্যারিস ঘুরিয়ে দেখাবে। হয়তো পথের কোনো দোকানে একটা কলার-বাটন তোমার পছন্দ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে

বলবে, 'কিনো না কিনো না'—সে যেন আঁৎকে উঠে বলবে, 'এরা বড্ড ঠকায়! কিনতে হলে চলো, অন্য দোকানে এই জিনিসই ঢের শস্তা!' এবং তুমি কিছু ভাববার আগেই সে তোমাকে আরেক শো-উইণ্ডোর সামনে হাজির করে ফেলেছে। সেখানে টাঙানো আছে একই টাই আর শার্ট কিংবা কলার-বাটন। হয়তো একই দোকান—কিন্তু তুমি তার তফাৎ ধরতে পারছো না। কে জানে, হয়তো দামেও আগের দোকান থেকে কম নয় অথবা একই দাম। যদি তুমি কেপির সঙ্গে কেনা-কাটায় বেরোও—তোমার হয়ে গেলো। সামান্য একটা জিনিসের জন্যে সে তোমাকে নিয়ে বেঘোরে ঘুরে বেড়াবে সারা শহরে। যাতে তুমি ক্লান্ত, পিপাসার্ত হয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ওর সঙ্গে গলা ভেজাতে বাধ্য হও। আর লকআউট হোক কিংবা বিপ্লবই ঘটে যাক, সঙ্গীতের আকর্ষণে কেপি একবার মুলা রুজ, অলিম্পিয়া অথবা অ্যাজে রুজে ঢুঁ মারবেই।

একদিন সে আমার জন্যে নিয়ে এলো একখানা বই। কোনো এক ভারতীয় ধর্মগুরুর সঙ্গে এক পত্রিকা-সম্পাদকের মোকদ্দমার বিবরণ। সম্পাদক ওই ধর্মগুরুকে কলঙ্কময় জীবন যাপনের জন্যে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। পরে সম্পাদক মারাত্মক-ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিযোগ করেন, তার অসুখের জন্যে ওই ধর্মগুরুই দায়ী। কেপির মতে রোগটা ছিলো ফরাসী বসন্ত; কিন্তু নানানতিতি বলে, 'না, এটা জাপানী

ঘা।' তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলবে, 'এনড্রি, তুমি বইটা পড়ে আমাকে জানিও তো—রোগটা আসলে কী রোগ ছিলো! আমার এই হাতটার জন্যে বইটই ধরতে পারি না আমি।" আমাকে উৎসাহিত করার জন্যে সে বলে, 'যৌন-লীলার সরস ফিরিস্তি এ-বইটা, বুঝলে এনড্রি? কেপি তোমার জন্যে বইটা আনিয়েছে। সে তো লোক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। কতো মেয়েকেই যে লাগিয়েছে—ঠিক কৃষ্ণের মতো। আমি আবার এসব কারবারের ধার ধারি না এনড্রি!...'

কিছুক্ষন পর নানানতিতি ওপর তলায় একটা ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেলো আমাকে। বললো, 'আমি মেয়েদের এইখানে নিয়ে আসি। অবশ্য আমি এ-ব্যাপারে খুব একটা ওস্তাদ নই। আর আমি তো মেয়েদের ওসব করি-টরি না এখন। আমি ওদের এই একটুখানি জড়িয়ে ধরে কথাবার্তা বলি কেবল।' এরপর আর বিশেষ কিছু শুনবার দরকার হয় না। কেননা এর পরেই তার নুলো হাতের পাঁচালি শুরু হবার কথা। কিন্তু আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে সে বলে, 'এ-ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই আমি আনাড়ি। তবে হ্যাঁ, আমার ভাইটা এ-ব্যাপারে তুখোড়। দিনে তিনবার লাগায়—প্রত্যেক দিন। আর কেপি তো স্বয়ং কৃষ্ণ!'

বুঝতে পারি, ওর মগজটা এখন ফাকিং-বিজনেসেই ছেয়ে আছে। নিচতলায় ক্যাবিনেটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে

আমাকে শোনালো তার অতীত দিনের কাহিনী। যখন সে ধনী ছিলো, তখন স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততিরা এখানেই তার সঙ্গে থাকতো। ছুটির দিনে সে তার বউকে নিয়ে চলে যেতো আন্তর্জাতিক ভবনে। সেখানে তারা সারা রাত্রির জন্যে ভাড়া নিতো একটা রুম। ওই ভবনের এক একটি রুম এক এক জোড়া স্ত্রী পুরুষের কাজে ব্যবহৃত হতো। ওখানে যৌন-ক্ষুধা মেটাতে ওর বউ নাকি খুবই পছন্দ করতো 'কামক্ষুধা মেটাবার আদর্শ স্থান এনড্রি। সবগুলো রুমই আমার চেনা।'

ছোটমতো এই ঘরের দেয়ালগুলো অসংখ্য আলোকচিত্রে ভর্তি। পরিবারের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত সব ছবি। যেন ভারতীয় রাজ্য সমূহেরই এক বিচিত্র সম্মিলন। মহিলারা ঘোমটায় ঢাকা। কেমন একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি চোখে। পক্ষান্তরে পুরুষরা কিছুটা সপ্রতিভ। খানিকটা বুদ্ধিদীপ্ত। যেন শিক্ষিত শিল্পাঞ্জী। পরিবারের নব্বুই জনের মধ্যে তিন-জনকে দেখা যাচ্ছে শাদা বলদের সান্নিধ্যে—কাদা আর গোবরের ছড়াছড়ির ভেতর। এখানে সেখানে ঘুঁটের চাপড়া। তাদের পাগুলো কাঠির মতো লিকলিকে। চোখে মান্ধাতা আমলের চশমা। চারদিকে দেবদেবীর মুর্তি। আর অসাধারণ বৈচিত্র ও গাম্ভীর্যময় এক একটা মন্দির। হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত বহু চমৎকার ও অতিকায় দেবালয় ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে। ভারতের মতোই বাহুল্যময় আর জটিল সেসব দেব মন্দিরের স্থাপত্য। পাথরে উৎকীর্ণ, স্বত-

স্ফূর্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ কৃষ্ণ বর্ণের নরনারীর মূর্তিগুলোর পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। এগুলোর দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

নানানতিতির যে-বোনটি প্রসবের সময় মারা যায়, তার কথা ভেবেও মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে আমার। ছবির ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তেরো বছরের সেই জবুথবু বউটি। মাত্র দশ বছর বয়েসে তার বিয়ে হয়ে এক বুড়োর সঙ্গে—যার পাঁচটি বউ ইতিমধ্যেই মারা গেছে। সাতটি সন্তানের জননী হয়েছিলো সে—যার একটি মাত্র জীবিত। নানানতিতির বোনটা যখন মারা যায়; তখন কাঁদতে কাঁদতে সে ডাক্তারকে বলছিলো, 'বুড়ো হাবড়াটার সঙ্গে আমি আর শুতে চাই না। ও আমাকে আস্তে আস্তে মেরে ফেলছে, ওর খপ্পর থেকে আমাকে বাঁচাও!'

: আসলে, ব্যাপারটা কি জানো এনড্রি,—নানানতিতি বললো—ওসব যৌন-সঙ্গম খুব ভালো জিনিস নয়!—তুমি বরং এর মন্তরটা যদি লক্ষ লক্ষ বার আওড়াতে পারো, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে। মন্ত্রটা হচ্ছে—উমাহারুমুমা!

: উমারাবু···

: না এনড্রি, ওরকম নয়—এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে উমাহারু মুমা!

: উমা মাবুমবা···

: না এনড্রি···এই রকম···

আবছা অস্পষ্ট ছোট্ট ঘরটির মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণরত গুজরাটি লোকটিকে আর দেয়ালের রহস্যময় আলোকচিত্রগুলোকে দেখতে দেখতে আমি যেন কেমন আছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কেমন সম্মোহিত।

ভাগ্যের জোর না থাকলে আমি আর কোনোদিন ওই নানানতিতির কবল থেকে উদ্ধার পেতাম কিনা সন্দেহ। এক রাতে কেপি এসে আমাকে ধরলো, একটা লোককে কাছাকাছি কোনো বেশ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে। যুবক সদ্য এসেছে এই দেশে—। ভারতীয়। সঙ্গে খুব বেশি টাকা কড়ি নেই। সে গান্ধীর শিষ্য —ছোটখাটো যে-নেতাটি লবন-সত্যাগ্রহের সময় বিরাট আন্দোলনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। যাহোক শিষ্যটি আক্ষরিক অর্থেই গান্ধীর শিষ্য। সে এ-পর্যন্ত কোনো নারী-সংসর্গ তো দূরের কথা, মেয়েদের মুখের দিকে পর্যন্ত মুখ তুলে তাকায়নি। ছেলেটি খুবই সুদর্শন, এ-কথা স্বীকার করতে হবে।

আমার ওপর ভার পড়লো, তাকে নিয়ে যেতে হবে রু লাফেরিয়েরে। কামকাতর কুকুরের মতোই যেন তার জিভ বেরিয়ে পড়েছিলো। তার পরনে ছিলো বর্ডুরয়ের স্যুট, মাথায় টুপি, হাতে বেতের ছড়ি আর গলায় উইণ্ড্‌সর টাই। তার পকেটে দু'খানা ফাউন্টেন পেন, কাঁধে একটা কোডাক ক্যামেরা আর কিছু টুকিটাকি শৌখিন জিনিস। যে-টাকায় সে এসব জিনিস কিনেছে, তা হচ্ছে বোম্বের ক'জন ব্যবসায়ীর দেয়া চাঁদার টাকা। টাকাটা তারা উপহারই দিয়েছে। যুবকটাকে তারা

ইউরোপে পাঠিয়েছে গান্ধীর বাণী ইংল্যাণ্ডের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

মিস হ্যামিল্টনের ডেরায় গিয়ে যুবকটি তো ঘাবড়েই গেলো রীতিমতো। তার পাশে গুনগুন করছে বেশ ক'টা উলঙ্গ মেয়ে। সে তো স্রেফ হতভম্ব—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার অবস্থা দেখে আমি বললাম, 'এর মধ্যে যে-কোনো একটাকে বেছে নাও —যেটা তোমার পছন্দ।' কিন্তু তার অবস্থা প্রকৃত পক্ষেই কাহিল তখন। সে ভালোভাবে মেয়েগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। কোনোমতে বললো, 'তুমিই বেছে দাও না!' আমি নির্বিকার দৃষ্টিতে মেয়েগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে একটাকে বেছে দিলাম আমার পছন্দ মতো। আমরা অভ্যর্থনা-কক্ষে বসে মদ খাচ্ছি, বাড়িউলি আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'তা বাছা, তুমিও একটা বেছে নিচ্ছো না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু যুবটি বললো, 'নাও, নাও, তুমিও নাও একটা! আমি কিন্তু ওর সঙ্গে একা একা ও-ঘরে যেতে পারবো না!'

অতএব মেয়েগুলোকে আবার ডাকা হলো। আমি ওদের ভেতর থেকে পছন্দ করলাম একটিকে। এ মেয়েটি লম্বা, পাৎলা। চোখ দুটো বেশ বিষণ্ণ। গান্ধী-ভক্তের মধ্যে বেশ একটা ব্যস্ততা। সে আমাকে ইশারায় তাড়া দিলো। আমরা চারজন ওয়েটিংরুমে বসেছিলাম। ওর তাগাদায় আমি বিব্রত বোধ করলাম। শেষে মেয়ে দু'টোকে লক্ষ্য করে আমাকে

বলতেই হলো, 'আমরা এখনই শুরু করতে চাই।' আমরা চারজন ওপর তলায়, দুটো পাশাপাশি ঘরে ঢুকে পড়লাম। দুই ঘরের মাঝখানে রয়েছে দরজা। অল্পক্ষনের মধ্যেই পাশের ঘর থেকে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'টয়লেটটা কোথায় ?'—আমি মনে করলাম, সামান্য কোনো কারনে সে এটা জানতে চাইছে। বললাম, ঘরেই তো সারতে পারো !' সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটো দু'খানা তোয়ালে হাতে নিয়ে যার যার ঘরে ঢুকলো। পাশের ঘরে কল্‌কল্ শব্দ শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। প্যান্ট পরতে যাচ্ছি, হঠাৎ পাশের ঘরে গর্জন করে উঠলো মেয়েটি। সে বারবার চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'শুয়োর, নোংরা শুয়োর কোথাকার !' আমি ভাবতেও পারলাম না, কী এমন অঘটন ঘটলো যাতে ওরকম তাণ্ডবলীলা শুরু হতে পারে। আমি প্যান্টের মধ্যে একটি পা ঢুকিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করতে লাগলাম, মেয়েটা কী বলছে। মেয়েটি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে তার কথাগুলো। তার গলার আওয়াজ চড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ !

দড়াম্ শব্দে দরজা বাজিয়ে বাড়িউলী এসে আমার ঘরে ঢুকলো হঠাৎ। তার মুখটা রাগে লাল। আমার দিকে তর্জনি উঁচিয়ে সে বললো, 'তোমার অবশ্যই লজ্জিত হওয়া উচিত ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এই রকম একটা লোক নিয়ে এসেছো আমার এখানে। এ তো একটা জংলি;···একটা শুয়োর, একটা···।' আমার সঙ্গীটি দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনেই। মুখটা ফ্যাকাশে।

: কি করেছো তুমি ?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু জবাব দিলো বাড়িউলী, 'কি করেছে, দেখবে ? এসো দেখে যাও ! এদিকে এসো।' বলতে বলতে আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো সে পাশের ঘরে। 'এই যে, এই দ্যাখো !' সে চেঁচিয়ে উঠলো আবার। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সারাটা মেঝে প্রস্রাবে তলিয়ে গেছে।

ব্যাপারটা যে ইচ্ছাকৃত নয়, তা অনুধাবনের পর পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ সহনীয় হয়ে উঠলো। বাড়িউলী বললো, 'তা ভুল হয়ে গেছে যখন, তখন আর কী করা যাবে ? তা, ভদ্রলোককে বলো না বাছা, নিচ তলায় গিয়ে আর একটু মদের অর্ডার দিতে ? মেয়েগুলো ঘাবড়ে গেছে ! দু'একটা চুমুক দিয়ে খানিকটা চাঙা হবেখন। তা ভদ্রলোক কি একটু শ্যাম্পেন খাবেন ?'

আমি বাইরে যাবো ?—যুবকটি বললো খুব ক্লান্ত গলায়।

: অতোটা সঙ্কোচের কি আছে বাছা ! যা ঘটে গেছে, তা গেছেই। এ নিয়ে আর মন খারাপ করে কি হবে ?—বললো বুড়ীটা। বললো, 'যা ভুল, তা ভুলই। এরপর পেচ্ছাপ পেলে টয়লেটের কথা শুধিও বাপু !' বাড়িউলী এবার টয়লেট নিয়ে পড়লো। তার হাবভাবে মনে হচ্ছে, এ বাড়ির ঘরে ঘরে টয়লেট রয়েছে। এমনকি অ্যাটাচড্ বাথরুম পর্যন্ত।

: আমার এখানে ইংরেজ আসে অনেক—বাড়িউলী বললো—তারা সবাই ভদ্দরলোক। তা এ-ভদ্দরলোক বুঝি হিন্দু ? মজার

মানুষ তো? হিন্দুরা যা বুদ্ধিমান, যা সুদর্শন?

আমরা যখন রাস্তায় নেমে এলাম, সুদর্শন হিন্দু যুবকটি এক রকম কাঁদতে শুরু করেছে। কর্ডুরয়ের স্যুট, ঝর্নাকলম আর বেতের ছড়ি কিনে শৌখিনতা করার জন্যে তার অনুতাপের সীমা নেই। যে আটটা শপথ সে নিয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সংযম। দণ্ডী-অভিযানের সময় আইসক্রীম পর্যন্ত সে ছোঁয়নি। সে আমাকে চরকা এবং সত্যাগ্রহীদের অনমনীয় মনোবল সম্পর্কে অনেক কিছু বললো। কীভাবে অনুসারীরা তাদের প্রভুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে, কি রকমভাবে তাঁকে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে, সে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকলো আমাকে। ভাবলাম, তা হবেও বা! এক শিষ্যেরই যা তেজ—তার প্রভু তো তাহলে না জানি কী রকম!

পরের কয়েকটা দিন খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কাটালাম যুবকের সঙ্গে। খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে কয়েকটা সাক্ষাৎকারে বসতে হলো তাকে। আয়োজিত হলো প্যারিস-প্রবাসী হিন্দুদের সমাবেশ, যাতে সে প্রধান অতিথি। নানা মত ও নানা পথের অনুসারী হিন্দুদেরকে গান্ধীর নামে ওরকম বিপুলভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু সমাবেশের শেষে যখন তারা যার যার ঘরে ফিরে যাবে, তখনই আবার শুরু হবে তাদের দলাদলি, হিংসা আর কূপমণ্ডুকতা।

৮—

এই হচ্ছে ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

এই হিন্দু যুবক অবশ্যই খুব আশাবাদী। সে এক সময় আমেরিকায় ছিলো এবং সে-দেশের শস্তা আদর্শে সে বিশেষভাবেই দূষিত বলে মনে হয়। আমেরিকার আপাতস্বাচ্ছন্দ, তার কৃতিত্ব, কলকব্জা, উচ্চ বেতন, বিনামুল্যের পাঠাগার ইত্যাদি ইত্যাদি যুবকের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তার ইচ্ছে ভারতের আমেরিকীকরণ। গান্ধীর 'এগিয়ে চলো' এই আহ্বানকে সে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সদস্যদের মতো অপছন্দ করে। আশ্চর্য হই আমি তার আমেরিকা প্রীতির নানা নমুনা দেখে। কিন্তু এও তো ঠিক যে ভারতের শত্রু ইংল্যাণ্ড নয়—আমেরিকা। আমেরিকা হচ্ছে ধ্বংসের কেন্দ্রবিন্দু। সে সারা পৃথিবীকে উচ্ছন্নে দেবে।

যুবক তন্ময়তার সঙ্গে আমার কাছে বলে যায় আমেরিকার নানা আধ্যাত্মিক আর সামাজিক সংস্থার কথা। সে জানতো, তার নৌকা কোথায় ভেসে যাবে। হায় উজ্জ্বল যুবক! সে জানতো, কখন চোখে পানি আনতে হবে, কখন হাতে নিতে হবে চাঁদার টাকা, কীভাবে আবেদন করতে হবে মন্ত্রীদের স্ত্রীর কাছে, কীভাবে মা ও মেয়ের সঙ্গে একই সময় প্রেম করতে হবে। তুমি তার কাছে গিয়েই ভাববে, সে একজন সন্যাসী। সে অবশ্য আধুনিক পোশাক পরা একজন সন্যাসীই বটে। একজন দূষিত সন্যাসী, যে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, যৌনতা, পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থা এবং কর্ম-

কুশলতার কথা।

প্যারিসে তার শেষ কর্মব্যস্ত দিনের শেষে সে আমাকে পাকড়াও করে বললো, 'অনেক ভালো ভালো জিনিস তো দেখালে। এবার একটা শস্তা আর বন্য পরিবেশে নিয়ে যাও না আমাকে। ডাকো, একসঙ্গে অন্তত তিনটে মেয়েকে!' অগত্যা, আমি তাকে নিয়ে রওয়ানা হলাম বুলেভার দে লা চ্যাপেলের উদ্দেশে। হুশিয়ার করে দিলাম মানি-ব্যাগ সম্পর্কেও। অবার-ভিলিয়েরে ঢুঁ মারতেই মাগি মিলে গেলো বেশ ক'টা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেলো, ছোকরা ধুম্‌সি আর ন্যাংটো একটা ব্লণ্ড মেয়ের সঙ্গে সে নাচছে। আমি দেয়ালের আয়নায় বারবার ঝলসে উঠতে দেখলাম মাগিটার পাছা, যা আঁকড়ে ধরে আছে যুবকের কালো, হাড় বের করা আঙুলগুলো। টেবিলে সার সার সাজানো আছে বিয়ারের গ্লাস। যান্ত্রিক পিয়ানো বাজছে বিরামহীনভাবে।

শিকার না-পাওয়া মেয়েগুলো চামড়া আঁটা বেঞ্চিতে বসে শান্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে গা চুলকাচ্ছে। ঠিক যেন একটা শিম্পাঞ্জী-পরিবার।

৮

দেড়টা বাজতেই আমি ভ্যান নর্ডেনের হোটেলে গিয়ে হাজির। সে অবশ্য আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলো, ডাকাডাকিতে সাড়া না দিলে বুঝতে হবে, আমি কাউকে নিয়ে, খুব সম্ভব জর্জিয়ান মাগিটাকে নিয়ে শুয়ে আছি। যাই হোক, সে যথা-রীতি ঘুম ভেঙে উঠে এসে ঘরের দরজা খুলে দিলো। বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন তার চোখে মুখে আঁকা। যেন সে তার চাক-রিকে, তার জীবনকে অভিসম্পাত করতে করতে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। রাত্রে সে যে মরে যায়নি—সম্ভবতঃ এখন সেই কথাটিই ভেবে আশ্বস্ত হচ্ছে।

আমি জানালার পাশে বসে, তাকে আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব সাহস যোগালাম। এ সত্যি এক বিরক্তির দায়িত্ব। যে-লোকটা সকাল বলতে বোঝে দুপুর একটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত যে-কোনো সময়—তাকে যথাসময় ঘুম থেকে জাগানো চাট্টিখানি কথা নয়। ঘুম থেকে উঠেছে সে একগাদা স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্নে সে কাদের দেখেছে, তাদের সঙ্গে কি করেছে, তা অবশ্য আমার মুখস্থ। তবুও তার নারীঘটিত অলৌকিক স্বপ্নের বিবরণ আমার না শুনেও তো নিস্তার নেই।

সঙ্কটজনক অবস্থার ফিরিস্তি দেবার সময় প্রায়শ সে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। তখন সে কেবল মুখভঙ্গি করে আঙুল নাচাতে থাকে সমানে। অর্থাৎ সেই ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা-দান শব্দে বা বাক্যে সম্ভব নয়। খাটের স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ঝোলানো আছে একটা ব্যাগ। তার মধ্যে লুকানো রয়েছে কিছু জরুরী জিনিসপত্র। এসব জিনিষের দরকার হয় তখনই, যখন নর্ডেন তার 'কুমারী'-দের আপ্যায়িত করে। সেই কুমারী মেয়েদের পেছনে সে ফেউয়ের মতোই লেগে আছে সর্বক্ষন। এমনকি স্বপ্নেও নাকি সে মিলিত হয় কেবলমাত্র কুমারীদের সঙ্গেই। সে সব সময় বলবে 'আমার কুমারী' যেমন বলে থাকে 'আমার জর্জিয়ান যোনি!' যখন সে পায়খানায় ঢোকে, তখন সে বারবার মনে করিয়ে দেয়, 'যদি আমার জর্জিয়ান মাগিটা আসে তাকে অপেক্ষা করতে বলবে। আমি যেমন করে ওকে বলি, তুমিও তেমনি বলতে পারো। আর শোনো, তুমি কি ওকে পেতে চাও? চাইলে বলো। আমার ক্লান্তি এসে গেছে ওর ওপর!'

অদ্ভুত মানুষ এই নর্ডেন। বৃষ্টি এলে বলবে, 'জঘন্য আবহাওয়া! এ যেন মানুষকে হতাশ করে ফ্যালে!' আবার চড়া রোদ উঠলে চেঁচাবে, 'তোর রোদ্দুরের গুষ্টি মারি! চোখ দু'টো কানা হয়ে গেলো একদম!' দাঁড়ি কামাবার সময় গর্জে উঠবে, 'তোর পচা হোটেলের গুষ্টি মারি। এমন ময়লা টাওয়েল দেয়? রোজ রোজ একটা করে সাফ-সুতরো তোয়ালে দিতে

পারিস না ব্যাটারা ?'

ভ্যান নর্ডেনের দাঁতের অবস্থা খুব খারাপ। তার মতে বাজে রুটি খেয়ে খেয়েই তার দাঁতের এমন দশা হয়েছে। গত কালকেই নাকি সে নিচের পাটির ছ'টা দাঁত উপড়ে ফেলেছে ব্যথার জ্বালায়। আমাকে লক্ষ্য করে সে বলে: 'দ্যাখো হে, একদিন আমার সবগুলো দাঁতই অটুট ছিলো, চোখ ছিলো উজ্জ্বল আর পরিষ্কার। এখন আমার দিকে তাকাও। হায়, হারানো ধন কি আর ফিরে আসে কখনো ? যদি কার্লের মতো একটা ধনী যোনি বাগাতে পারতাম! শালা এমন পাজি, মাগির নামটা পর্যন্ত বলেনি এখনো। ওর ভয়, মেয়েলোকটাকে যদি আমি ভাগিয়ে নিই ?'—তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বলে—'তোমার যাহোক ইয়ার-বন্ধু আছে অন্ততঃ কিছু। আমার কেউ নেই। আছে কেবল ওই কার্ল আর তার ধনী মাগির রূপকথাটুকু।

: 'শোনো'—ভ্যান বললো—'তুমি নর্মা নামে কোনো মেয়েকে চেনো ? সারা দিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। গতকাল ওকে আমি এখানে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু মেয়েটা আমাকে কিছুই করতে দিলো না। আমি তাকে বিছানায় শুইয়েছিলাম। তাকে ন্যাংটোও করেছিলাম···কিন্তু বড্ড ঝামেলা করলো সে। শেষে তুত্তোর বলে ক্ষান্ত দিলাম। এ-রকম ঝামেলার মধ্যে আমি আর কখনো যদি পা বাড়াই—! এদের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করার কোনো অর্থ হয়, বলো ? আরে মিয়া, তুমি যখন একটা

পুঁচকে কুত্তির সঙ্গে কুস্তি লড়ছো, তখন রাস্তায় গিয়ে দ্যাখোগে, ডজন খানেক যোনি ছটফট করছে, তড়পাচ্ছে। তারা সবাই ওখানে আসে স্রেফ শোবার জন্যে। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। সে দিন তো এক মাগি বললো, তার স্বামীর সঙ্গে গত ছ'মাসের ভেতর সে একদিনও শোয়নি। কল্পনা করতে পারো? যীশুর দোহাই, দারুন মাল সে। তাকে যখন লাগাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিলো, আমার নুনুটা ছিঁড়ে যাবে। আর তার মুখে সে কি গোঙানি!

'তুমি করছো? তুমি, তুমি।' অনর্গল বকছিলো সে যৌন-প্রলাপ। বিশ্বাস করবে, মেয়েটা আমার এখানে এসে উঠতে চেয়েছিলো! ভাবো তো একটিবার! বললো, আমাকে তুমি ভালোবাসবে না? অথচ আশ্চর্য! আমি তার নাম পর্যন্ত জানি না। আমি জানতে চাইও না। বিবাহিতা? যীশু, তুমি যদিও সমস্ত বিবাহিতাকে দেখেছো; তবুও আমি যাকে দেখাবো, তাকে দেখবার পর তোমার মোহ-ভঙ্গ ঘটবে। বিবাহিতারা কুমারীদের চেয়ে বাজে। তারা তোমাকে শুরু করবারও সময় দেবে না। তাড়াতাড়ি কাজকম্ম সেরে তারা তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ আরম্ভ করবে। জঘন্য! বিশ্বাস করো, যোনি টোনির ওপর সত্যি আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

: আমরা কি ওদিকে টইল দিতে যাচ্ছি জো?—জিজ্ঞেস করলাম ভ্যান নর্ডেনকে। আমি যেহেতু তাকে জো বলে ডাকি,

সে ও জো। কেননা এই জো ডাকটা বেশ সহজ। কিন্তু দোম-এর ওদিকে জো যাবে না। বহু লোক তার কাছে পয়সা পায়। সে যেতে চায় কুপোলের ওদিকটায়।

: কিন্তু এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে, জো ?

: আমি জানি ; কিন্তু তাতে কি ? আমার শরীর থেকে নোংরা জিনিশ ঝেঁটিয়ে বের করতে হবে যে !'—সে এমনভাবে কথা-গুলো বললো, যেন পৃথিবীর সমস্ত নোংরা জিনিষ তার পেটের মধ্যে পচছে। সে বললো : কেবল একটা ধনী যোনিই এখন বাঁচাতে পারে আমাকে। একটার পর একটা যোনিকে তাক করে ছুটতে ছুটতে এক সময় ক্লান্তি আসা খুবই স্বাভা-বিক। ব্যাপারটা রীতিমতো যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। মুশকিলটা কি জানো ? আমি প্রেমে পড়তে পারি না। মেয়েরা কেবল আমাকে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এটা অনেকটা মদ টানা কিংবা আফিম খাওয়ার মতো। আমি রোজ একটা করে মেয়েকে উপভোগ করি। যেদিন না পাই—নিরাশ হয়ে পড়ি। গভীর চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকি আমি। একেক সময় আমি এই ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, কতো তাড়াতাড়ি শিশ্নটা টেনে বের করে নিই ! ব্যাপারটা কতো সামান্য। অনেকটা যেন স্বয়ংক্রিয় আমি। সঙ্গমের সময় প্রায়শ আমি ভুলে যাই যে, কার সঙ্গে আছি। মূলত কোনো মেয়েমানুষের অস্তিত্বই আমি টের পাই না। হঠাৎ সচমকে লক্ষ্য করি, মেয়েটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

আছে—ঠিক তখনই যেন চটকা ভাঙে আমার। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাস্তবে ফিরে আসি আমি। এবং আবার তৎপরতা শুরু করি নতুনভাবে। আমি কি বলতে চাইছি, তা কি তুমি বুঝতে পারছো?

নর্ডেনের মতে, ফরাসী মেয়েরা হয় টাকা চায়, নয়তো চায় বিয়ে বসতে। নিচের দিকটায় তো সবাই বেশ্যা। সে বরং একটা কুমারীকে নিয়েই ধস্তাধস্তি করবে। তাতে আর কিছু না থাক—রহস্য তো আছে! একটা ফাইট তো অন্তত: দিতে পারবে! বিশেষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সারিবদ্ধ যে বারবনিতাদের দেখা যায়, ভ্যান তাদের সব্বাইকে করেছে। একটাও বাদ নেই। বারে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে সে আমার কাছে বিভিন্ন বেশ্যার বিশেষত্ব বর্ণনা করে। কার কোন দিকটা ভালো, কার কোন দিকটা খারাপ। বলবে: সব বস্তাপচা মাল। আর সেই সঙ্গে কোনো কুমারী মেয়ের কচি রসালো যোনির কল্পনা করে সে বিনীত ভঙ্গিতে হাত কচলাতে থাকে! যেন ওই যোনিগুলো এ-মুহূর্তে কোনো কিছু পাবার জন্যে এখন ছটফট করেছে। একটা বিশাল পাছাঅলা মেয়েকে দেখিয়ে ভ্যান বললো, 'ওই দ্যাখো, আমার ড্যানিশ যোনিটা! মাজাটা দেখেছো? হ্যাঁ, ড্যানিশ পাছা! এই দিকে এসো, হ্যাঁ, হ্যাঁ এখান থেকে তাকিয়ে দ্যাখো। দ্যাখো একবার পাছাটা! দেখতে পাচ্ছো? দুর্দান্ত, না? যখন সে আমার ওপর চড়ে, তখন ওর পাছার বেড় পাওয়া দায়। যেন সারাটা

দুনিয়া ঢেকে দিয়েছে। ও আমাকে মনে করতে বাধ্য করে যে, ওর যোনির ভেতর দিয়ে একটা ছারপোকা যাচ্ছে। জানি না, ওর কথা এতো ভাবি কেন? ওই মাজাটার জন্যেই কি? তা হবে! কী ধারালো পাছা। এ-রকম পাছার কথা কখনো ভোলা যায় না। এটা সত্যি···এটা বাস্তবিক! যেন একটা মনুমেন্ট কাঁধে নিয়ে শুতে যাচ্ছি!'

ড্যানিশ মেয়েটা তাহলে দেখছি ব্যাটাকে বিদ্যুতায়িত করেছে। ওই বাজে হোটেলটা সে ছেড়ে দিতে চায়। বড্ড গোলমাল হয় ওখানে। সে একখানা বই লিখতে চায়। কিন্তু পচা চাকরিটাই তাতে বাদ সেধে বসে আছে। : এই চাকরি, যেন তোমার রক্ত মাংস সব নিংড়ে বের করতে চায়।—সে বিড়বিড় করে। 'আমি ওই মপারনাস নিয়ে লিখতে চাই না। আমি লিখতে চাই আমার জীবনের কথা আমার চিন্তা-ভাবনার কথা। আমি আমার ভেতরকার কলুষ বাইরে বের করতে চাই। ওই যে, ওই মেয়েটাকে দ্যাখো। অনেক আগে ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিলো। থাকতো লে-হ্যালের্সে। এক মজাদার কুত্তি। সে শুয়ে পড়তো বিছানার কিনারে এবং কাপড় চোপর খুলতে শুরু করতো। কখনো কি এভাবে করেছো? মন্দ নয়। সে কখনো তাড়া লাগাতো না। কাজের শেষে যখন সে ধোয়া মোছা করতে যেতো, তখন সে গুনগুন গাইতো গান। এমনকি হোটেল থেকে সে যখন বাইরে বেরুচ্ছে, তখনও তার মুখে গান। আ-রাভোয়া

বলে বিদায় জানাবার অবকাশও যেন তার নেই। চমৎকার বেশ্যা। খাসা মাল। আমি বোধ হয় আমার কুমারীটির চাইতেও বেশী পছন্দ করি একে।'—হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুঁজে থাকবার পর সে বললো, 'কাল বিকেলে আমার সঙ্গে তুমি ক্লাবে যাবে। নাচের আয়োজন আছে।'

ঃ আমি পারবো না জো। কার্লকে কথা দিয়েছি, ওর একটা কাজে···

ঃ রাখো তোমার কার্ল-ফার্ল। তোমাকে আমার একটা সমস্যার সমাধান করে দিতেই হবে। না না, তেমন কোনো কঠিন সমস্যা নয়। হাত কচলাতে কচলাতে সে বললো, 'একটা মেয়েলোককে প্রায় বাগিয়ে এনেছি, বুঝলেন! সে আমার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে একটা সমস্যাও দেখা দিয়েছে। ওর মা-টাও একটা খানকি। সে চায় তার কাছেই সর্বক্ষন বসে থাকি আমি। আসলে ঘটনাটা হচ্ছে মা ও মেয়ের মধ্যে দড়ি টানাটানি। মনে হয়, মা-টাকে যদি আগে একবার লাগিয়ে নিই, পরে সে আর তেমন গাঁই-গুই করবে না। কিন্তু এটা কি সম্ভব? তুমি বলো। যাই হোক, আমি ভেবেছি, মা-টাকে তুমিই করবে···জিনিষ তেমন খারাপ নয়। যদি ওর মেয়েটাকে আমি না দেখতাম, তাহলে হয়তো ওকেই পছন্দ করে ফেলতাম। মেয়েটা বেশ কমবয়সী, টাট্‌কা মতো। বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, আমি কি বলতে চাইছি? এমন একটা তাজা ঘ্রান।···

: শোনো জো!—তুমি বরং অন্য কারো সঙ্গে···

: আহ, ব্যাপারটাকে এভাবে নিও না। এ তো অন্য কিছু নয়। এভাবে তুমি আমার প্রতি খানিকটা আনুকূল্য প্রদর্শন করবে মাত্র। এ ছাড়া যে ওই বুড়ো মুরগিটার খপ্পর থেকে আমার মুক্তির কোনো উপায় নেই! পার্টি বড়ো সেন্টিমেন্টাল, বুঝলে? এসেছে মিনেসোটা না কোত্থেকে যেন। ভোগা-ভাগি দিয়ে কাজ হবে না। সে যাই হোক, কাল এসে তুমি আমার ঘুম ভাঙাবে। কেমন? নইলে কিন্তু ঘুমোতেই থাকবো আমি। তাছাড়া দু'জনে মিলে একটা রুম খুঁজেও বের করতে হবে কোনো নিরিবিলি জায়গায়। তুমি তো জানো, আমি একা মানুষ। এ-জায়গার ধারে কাছেই একটা ঘর দ্যাখো। এ-দিকটায় আমি বাকিতে কিনতে পারি নানা দর-কারী জিনিস। কথা দাও, কাজটা করে দেবে? তোমাকে খাওয়াবো আমি। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। খালি তো মেয়ে নিয়ে প্যাঁচাল পাড়ি। তোমার সঙ্গে আমি হ্যাভলক এলিস সম্পর্কে আলাপ করবো। যীশু, তিন সপ্তাহ ধরে বইটা পড়ে আছে, খুলেও দেখিনি। বললে বিশ্বাস করবে কি, আমি এ-পর্যন্ত লুভরে যাইনি। কিংবা পা বাড়াইনি কমেদি ফ্রাঙ্কাইস দেখতে? কেবল যোনি নিয়েই পড়ে আছি। আমি এই মাগির দেশ ছেড়ে অবশ্যই ভাগবো। এখানে আমার জন্যে কিছুই নেই। আর আমেরিকান? সেখানেও তো এই একই অবস্থা। যাই কোথা? কি? না প্যারিস?

দুনিয়ার ব্যর্থ মেয়েপুরুষ এখানে এসে ভীড় জমাচ্ছে। জো, দেশের কথা ভেবে তোমার মন খারাপ হয় না? মজার মানুষ বটে। মনে হয়, এখানে থাকাই তোমার পছন্দ। এখানে কী পেয়েছো, বলো তো? বকবকানি শুনে বিরক্ত হচ্ছো বুঝি? কিন্তু কাউকে না কাউকে এসব কথা আমার বলতেই হবে। বলবো ওপর তলার শয়তানগুলোকেও। কার্ল তো একটা স্বার্থপর। ইগোইষ্ট; কিন্তু সেলফিস নই, বুঝলে! দু'টোর মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। আমি একটা অনিদ্রা রোগীর—আমি বুঝতে পেরেছি, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার রাশটাও আমি টেনে ধরতে পারি না। অবশ্য এ-থেকে এটা বোঝায় না যে নিজেকে আমি খুব গুরুত্ব দিইনি। আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না—ব্যাস। কথা এইটাই। কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারলে হয়তো আমার কিছুটা উপকার হতো। কিন্তু সমস্যা একটাই। কোনো মেয়ে সম্পর্কেই আমার কোনো রকম উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। আমি প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। তুমি নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছো, তাই না? এখন তুমি আমাকে কি করতে বলো। কি পরামর্শ দাও? তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে, কি করতে? যাই হোক, কালকে এসে তুমি অবশ্যই আমার ঘুম ভাঙাবে। ঠিক দেড়-টায়। কেমন? যদি তুমি আমার জুতো পালিশ করে দাও, তাহলে তোমাকে কিছু বাড়তি পয়সা দেয়া যাবে। শোনো তোমার যদি কোনো পরিষ্কার বাড়তি শার্ট থাকে—সেইটে

সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, বুঝলে? শালার চাকরি। খাটতে খাটতে অণ্ডকোষ গুঁড়িয়ে ফেললাম, একটা পরিষ্কার জামা গায়ে দেবার ক্ষমতা নেই। যাই হোক, ভুলো না। কালকের কথা যেন মনে থাকে।

গত ছ'মাস যাবৎ চিঠি চালাচালি চলছে কার্ল আর তার ধনী যোনির মধ্যে। অর্থাৎ সেই আইরিনের সঙ্গে। গত ক'দিন যাবৎ যেন জোয়ার চলেছে প্রেমপত্রের। শেষ যে-চিঠিখানা আমরা ডাকে ফেললাম, সেটি চল্লিশ পৃষ্ঠার। তিনটি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই পত্রে। পুরনো উপন্যাস, রবিবাসরীয় পত্রিকা এবং লোনা ও তানিয়ার কাছে লেখা পত্রগুলো এ-ব্যাপারে আমাদের বেশ কাজে লাগলো। র‍্যাবেলিয়াস আর পেট্রোনিয়াসকেও রেহাই দিলাম না আমরা।

অবশেষে আইরিন তার খোলস ভেঙে বাইরে এলো। আমন্ত্রন পত্র এলো তার হোটেলে যাবার। কার্লের তো যাকে বলে প্রায় প্যান্টে প্রস্রাব করার অবস্থা। অচেনা মহিলার কাছে চিঠি লেখা এক জিনিষ। আর তার আহ্বানে তার কাছে গিয়ে, প্রেম করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। সময় যতো ঘনিয়ে আসছিলো, হৃৎকম্প ততোই বেড়ে যাচ্ছিলো কার্লের। ওর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আমি ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত আমাকেই বুঝি কার্লের বিকল্প হিসেবে আমন্ত্রন রক্ষা করতে যেতে হয়!

হোটেলের সামনে যখন আমরা ট্যাক্সি থেকে নামলাম, তখন কার্ল রীতিমত কাঁপছে। সে এতো বেশী কাঁপছিলো যে,

আমি তার পাশে পাশে হাঁটছিলাম তখনো পর্যন্ত। ইতি-মধ্যে দু'টো পারনদ গলধঃকরণ করেছে সে। কিন্তু তার বিন্দু-মাত্র প্রতিক্রিয়াও তো ওর চেহারায় দেখছি না। আর সে কাঁপবেই না বা কেন? আলিশান হোটেলটার চেহারা দেখেই তো চমকে যেতে হয়। এটা এমনি এক বিশাল থমথমে হোটেল যার লবিতে শূন্য দৃষ্টি মেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখা যায় ইংরেজ মহিলাদেরকে। কার্ল যাতে দৌড়ে না পালায়, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কাছাকাছিই। পোর্টার আইরিনের রুমে ফোন করে জেনে নিলো, সে আসছে। সে অতিথির জন্যেই নাকি অপেক্ষা করছে। কার্ল যখন লিফ্‌টে ঢুকলো, তখন তার চেহারা দেখে মনে হলো, শিকল লাগাবার সময় কুকুরের যে-চেহারা হয়, তারও যেন হুবহু সেই অবস্থা। হোটেলের রিভলভিং ডোর দিয়ে বাইরে যাবার সময় আমার মনে হলো ভ্যান নর্ডেনের কথা।

আমি আমার হোটেলে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগলাম একটা টেলিফোন-কলের। কার্লের হাতে সময় আছে মাত্র এক ঘণ্টা। সে আমাকে কথা দিয়েছে, অফিসে যাবার আগেই আমাকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যাবে। চিঠির কার্বন-কপিগুলোর ওপর আমার চোখ পড়ছিলো বারবার। ওখানে এখন কী ঘটছে, তা আমি কল্পনার নেত্রে অবলোকন করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কল্পনা করে জানা যায় না। ওর চিঠিগুলো

আমাদেরগুলোর চেয়ে ভালো। সেগুলো অকপট। সরল। এখন দু'জন মুখোমুখি। কে জানে কার্ল এখনো মুতে প্যান্ট ভেজাচ্ছে কি না!

টেলিফোন বেজে উঠলো। কার্লের গলা। অদ্ভুত ব্যাপার, তার গলা একই সঙ্গে খুশি-খুশি এবং ঘাবড়ানো। সে আমাকে তার অফিসের সিফ্‌ট সামাল দিতে বলছে। বললো, 'আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বেজন্মাদের যা খুশি বোলো। বোলো, আমি মারা যাচ্ছি।'

: শোনো কার্ল,...তুমি কি বলবে...'

: হ্যালো! আপনি কি হেনরী মিলার?' এক মহিলার গলা। বলা বাহুল্য, আইরিণ। আমি তো শিহরিত! টেলিফোনে তার গলা শোনাচ্ছে খুবই চমৎকার। কিন্তু তাকে কি বলতে হবে, তা তো আমি জানিনা। আমার বলতে ইচ্ছে হলো,

: শোনো আইরিণ, মনে হয় তুমি সুন্দরী...মনে হয়, তুমি অপরূপা। আমি তাকে এখন একটা সত্য কথা বলতে পারি। তা যতো বেসুরোই শোনাক না কেন। কেননা তার কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে গেছে। কিন্তু আমি কোনো কিছু বলবার আগেই কার্লের গলা শোনা গেলো আবার। সে গদগদ গলায় বলছেঃ আমি তোমার সব কথাই ওকে খুলে বলেছি জো। সে তোমাকে পছন্দ করেছে।...'

অফিসে আমি ভ্যান নর্ডেনের দায়িত্ব পালন করছিলাম। বিরতির সময় সে আমাকে টেনে হিঁচড়ে তুললো। রাগে তার

চোখ দুটি দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। চিবিয়ে চিবিয়ে সে বললো—
: ব্যাটা মরতে বসেছে। না? জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি। বল্, আসলে কেসটা কি?
: আমার মনে হয় সে তার সেই ধনী যোনির কাছে গেছে। আমি স্বাভাবিকভাবে জবাব দিলাম।
: কী? তার মানে সে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে? কোথায় থাকে সে। তার নাম কি?
আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।
: শোনো। সে বললো, 'তা আমাকে জানালেই তো পারতে।'
আমি হলফ করে বললাম, আগে ব্যাপারটা আগাগোড়া জেনে নিই। কার্লের সঙ্গে দেখা হলে সব শুনবো। তারপর তোমাকে সব কিছুই খুলে বলা যাবে। আগে ওর সঙ্গে দেখা হোক।
পরদিন দুপুর নাগাদ আমি কার্লের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। সে ইতিমধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। বসেছে দাড়ি কামাবার জন্যে। তার মুখ দেখে কোনো কিছুই আঁচ করবার উপায় নেই। এটাও বোঝা সম্ভব নয়, সে আমার কাছে যা বলবে, তা কতোটুর সত্য। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেয় আছড়ে পড়েছে রোদ্দুর। পাখিরা ডাকাডাকি করছে। তবুও কি জানি কেন, আমার মনে হচ্ছে—কী রকম যেন খাখা করছে ঘরখানা। যেমন শূন্য, তেমনি হতশ্রী। যেন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত। সাবানের ফেনা ছড়িয়ে আছে হেথায় হোথায়। র‍্যাকের ওপর

রাখা তোয়ালে দু'টো বোধ হয় কোনোদিন সাবানের ছোঁয়া পায়নি। যেন কার্লের জীবনে কোনো রকম পরিবর্তনই ঘটেনি। ব্যাপারটা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিলো। সকাল বেলায় সারাটা দুনিয়াই তো বদলে যায়। পরিবর্তন ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে—কিন্তু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ওই তো কার্ল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেভ করছে—কই তার মুখের একটি রেখাও তো পাল্টায় নি! 'বোসো!···ওই বিছানাটার ওপর বোসো!' বললো সে।

: তোমাকে সব কথাই খুলে বলবো! কিন্তু আগে অপেক্ষা করো। অল্প একটু খানি অপেক্ষা করো।' বলতে বলতে সে তার গালে বুরুশ চালাতে লাগলো। তারপর রেজার দিয়ে দাড়ি কাটতে শুরু করলো। এমনকি সে পানি সম্পর্কেও মন্তব্য করলো···আর গরম পানি নয়।

: শোনো কার্ল, কষ্ট দাও পরে দিও। এখন কেবল একটি কথা বলো। ঘটনা খারাপ না ভালো?

ব্রাশ হাতে আয়নার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালো কার্ল। মুখে তার এক ধরনের অদ্ভুত হাসি। বললো, 'রোসো, তোমাকে আমি সব কিছুই খুলে বলছি'···

: তার মানে, এ এক ব্যর্থ-অভিযান!'

: না। সে বললো ব্যর্থ নয়। আবার সফলও নয়।···ভালো কথা, আমার ডিউটির ঝামেলাটা ভালো ভাবে চুকিয়ে দিয়েছিলে তো? অফিসে আমার কথা কী বলেছো?'

বুঝলাম, এ ভাবে ওর পেট থেকে কথা বেরুবে না। বৃথা চেষ্টা। দেখা যাক, শেভ টেভ হবার পরে ধীরে সুস্থে যদি বলে। আমি ওর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। দাড়ি চাছা এগিয়ে চললো কার্লের।

হঠাৎ—প্রথমে অস্পষ্ট ভাবে এবং পরে স্পষ্ট করেই সে বলতে শুরু করলো ঘরে ঢুকতেই তার চোখে পড়লো, মেয়েটি প্রসাধনে মগ্ন। টেবিলের একপাশে শ্যাম্পেনের ঝুড়ি। ঘরটা কেমন আবছা আলোয় ভরা। তার গলার আওয়াজ মাদকতাময়। অর্থাৎ কার্ল সেই হোটেল-কক্ষটির বিস্তারিত বর্ননা দিতে শুরু করলো আমার কাছে। কক্ষ, শ্যাম্পেন, চাকররা কিভাবে বোতল খুললো, ছিপি খোলবার সময় কীরকম শব্দ হলো, কীভাবে সে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো,—সব কিছুই সে খুটিয়ে খুটিয়ে বলতে লাগলো। কিন্তু আমি যা জানতে চাই—তার ধ'রে কাছেও সে নেই।

প্রায় আটটায় সে ওখানে যায়। সাড়ে আটটার সময়েই সে নার্ভাস হয়ে পড়লো। চাকরি সম্পর্কেও তার দুশ্চিন্তা জাগে।

—'বোধ হয় ন'টা নাগাদ আমি তোমার কাছে ফোন করি, তাই না?' —সে বললো।

: হ্যাঁ, প্রায় ন'টাই হবে তখন!

: আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। দ্যাখো—

: আমি তা জানি। বলে যাও···

দশটা যখন বাজলো, তখন সে ডিভানে শুয়ে আছে। দু'টো

হাত তার দুই স্তনের ওপর। এটাই ছিলো তার সমর্পিত হবার ধরন। এগারোটা নাগাদ সবকিছু ঠিকঠাক। তারা ছুটে চললো বোর্নিওর দিকে। স্বামীটাকে গুলি মারো, সে কখনো তাকে ভালোবাসেনি। সে কখ্খনো তাকে প্রথম চিঠি লেখেনি। যদিও লোকটা বুড়ো কিংবা আবেগহীন নয়। এবং তারপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু শোনো প্রিয়তম, তুমি কি জানো, আমাকে নিয়ে ক্লান্তি বোধ করবে না?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আর তুমি কি বললে?'

: আমি বললাম, এটা তুমি ভাবতে পারলে? তোমাকে নিয়ে কেউ ক্লান্তি বোধ করতে পারে না!

তারপর সে বর্ননা দিলো পরের ঘটনার। কি ভাবে উবু হয়ে সে তার স্তন চুম্বন করলো, চুম্বনের পর সে আবার কিভাবে নিজের স্তনযুগল আবরিত করলো, মুখে কি কি বুলি আওড়ালো, আর এক প্রস্থ শ্যাম্পেন এলো ইত্যাদি ইত্যাদি!'

মধ্যরাতের দিকে বেয়ারারা নিয়ে এলো বিয়ার আর স্যাণ্ডউইচ! সর্বক্ষনই তাকে সহ্য করতে হচ্ছিলো নিজের প্রস্রাবের ভীষণ চাপ! মনে হচ্ছিলো, মূত্রাশয় ফেটে সে মরে যাবে। রাত দেড়টায় একটা গাড়ি ভাড়া করে বেড়াতে বেরুলো তারা দু'জন। কিন্তু তার মাথায় চিন্তা তখন একটাই। কীভাবে প্রস্রাব করবে। অবশ্য মুখে সে বলছিলো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি!' জবাবে সে বলেছিলো তুমি আমাকে যেখানে যেতে বলবে, সেখানেই যাবো—ইস্তাম্বুল, সিঙ্গাপুর,

হনুলুলু—কিন্তু আমি যাবো এক্ষুনি···বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে!'

'বুঝলাম!'—আমি বললাম—'সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু সে কেমন, তা তো বলবে? অবশ্য এসব যদি বানানো গল্প না হয়!'

'এক মিনিট অপেক্ষা করো।' সে বললো—'অপেক্ষা করো··· আমাকে ভাবতে দাও! না, সে সুন্দরী নয়। এখন এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তার চাঁদির বেশ ক'গাছা চুল ধূসর—আমার মনে পড়ছে। কিন্তু তাতে কি? তার হাত দু'খানা বেশ নরম।'—কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। 'কেবল তার বয়েস যদি দশ বছর কম হতো'—সে আক্ষেপের সঙ্গে উচ্চারণ করলো।—'যদি তার বয়স বছর দশেক কম হতো, তাহলে তার ধূসর হয়ে আসা চুলগুলো আমার নজরেই আসতো না। হাত নরম হলে হবে কি, অনেক বয়েস হয়ে গেছে মহিলার। দ্যাখো, তুমি হিসেব করে দ্যাখো, ওই রকম একটা বুড়ীর সঙ্গে আমাকে লেপ্টে থাকতে হবে—আগামী বছরে যার বয়স বাড়বে দশ বছর। দু'বছরে বেড়ে যাবে বিশ বছর! অথচ আমার চেহারায় তারুণ্যের ছাপ বেড়েই যাবে। বাড়তে থাকবে অন্তত আরো পাঁচ বছর!···

: শেষে কী হলো, বলো না!—আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

: শেষ হলো কথায়···যা ঘটলো, তা তো শুনলেই। আমি

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় তার সঙ্গে দেখা করবো বলে কথা দিয়েছি। সময়টা বোধ হয় সঠিক নির্বাচন করা হয়নি। তাই না? দিনের আলোয় তার মুখের ভাঁজগুলো স্পষ্ট চোখে পড়বে আমার। খুব সম্ভব ওদিনও সে আমাকে লাগাতে বলবে। উজ্জ্বল দিনের আলোয় অমন একটা যোনি তাও আবার ওই রকম একটা হোটেলে? যে দিন আমার নাইট-শিফ্‌টে ছুটি—ব্যাপারটা সেদিন হলে ভালো হতো না কি? কিন্তু মঙ্গল বারে তো আমার ছুটি নেই। কেবল তাই নয়। এর মধ্যে তার কাছে একখানা চিঠি লিখবো বলেও কথা দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু বলো তো, চিঠিতে আর কি লেখার আছে ওকে। বলবার তো আর কিছুই নেই এখন? ধেৎ—তোরি। শুধু যদি ওর বয়সে আর দশটি বছর কম হতো! তুমি ভাবতে পারো, আমি তার সঙ্গে বোর্নিওতে—কিংবা সে যেখানে নিয়ে যেতে চায়, চলে যাবে? এরকম একটা পয়সাওয়ালা যোনি সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করাও তো বিপদ। কী ভাবে গুলি করতে হয়, আমি জানি না। আমি বন্দুক এবং ও জাতীয় যে কোনো জিনিষ দেখলেই ভয় পাই। তাছাড়া সে চাইবে আমি দিনে রাতে অবিরাম তার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হই।···সব সময় শিকার···সব সময় লাগানো···না বাপু, সে আমার পোষাবে না।

: তুমি যতোটা বাঁকা ভাবে ব্যাপারটা দেখছো, ততোটা নাও হতে পারে। সে তোমাকে টাই এবং আরো কতো কিছু কিনে দেবে।

: হয়তো তুমিও আমাদের সঙ্গে শামিল হবে, অ্যাঁহ! আমি তোমার সব কথাই তার কাছে খুলে বলেছি।

: তুমি কি বলেছো, আমি গরীব, আমার অনেক কিছুর দরকার?

: আমি তাকে সবকিছু খুলে বলেছি। ইস্—কতো চমৎকারই না হতো, যদি তার বয়েসটা থাকতো আর দশটি বছর কম। সে বলেছে, তার চল্লিশ বছর চলেছে। তার মানেই তো পঞ্চাশ অথবা ষাট। এহ্—এখন নিজের মায়ের সঙ্গে···ছি ছি ছি কেউ তা পারে! এ অসম্ভব! : কিন্তু তার মধ্যে কিছু একটা আকর্ষন নিশ্চয়ই আছে।···তুমি বলেছো, তার স্তনে চুমো খেয়েছিলে সেদিন!,

স্তনেই তো—তাও আবার অন্ধকারে!

বোতাম খসা প্যান্টটাকে অঙুলি নির্দেশ করে সে বললো, দেখতে পাচ্ছো অবস্থাটা? ছিঁড়তে শুরু করছে এই স্যুটটা। সাত বছর ধরে পরছি।···এর দাম পর্যন্ত দেইনি এখনো। এক সময় দারুন জিনিষ ছিলো। এখন কতো কুঁচকে গেছে।···এখন ওই ধনী মেয়ে লোকটা স্যুট তো বটেই, আরো অনেক কিছুই আমাকে কিনে দেবে খুব সম্ভব। কিন্তু আমি এসব পছন্দ করিনা আমি চাই না, একটা মেয়ে মানুষ সেুফ আমার জন্যে নিজের খোলস খুলে বাইরে আসুক। আমি জীবনে ও এরকম কাজ করিনি। তুমিই তো এই দুর্বুদ্ধি দিয়েছিলে। আমি একা থাকতে চাই। এই ঘরখানা চমৎকার নয়? এখানে আমার কীসের অসুবিধে হায়ছে। তার ঘরের চেয়ে এই ঘর থেকে দেখা

বাইরের দৃশ্য কতো সুন্দর। আমি তার চমৎকার হোটেল পছন্দ করিনা। আমি ওই ধরনের হোটেলের বিরুদ্ধে। একথা আমি তাকে বলেছিও। সে আমাকে বলেছে, সে কোথায় থাকবে এ ব্যাপারে তার কোনো বাদ বিচার নেই। সে বলেছে, আমি যদি চাই, তবে সে আমার কাছেই এসে থাকবে। ওই ঢাউস ঢাউস তোরঙ্গ, হ্যাটের বাক্স আর নানা রকম দামী দামী জিনিষ নিয়ে এই ঘরের মধ্যে সে হাঁটাহাঁটি করছে, ছবিটা একবার কল্পনা করতে পারো? কতো কিছু আছে তার! কতো যে পোশাক! কতো বোতল। কতো বেশী বেশী জিনিষপত্তর! তার ঘরটা যেন একটা ক্লিনিক। তার হাতে যদি সামান্য একটু আঁচড় লাগে—ব্যাস—সাংঘাতিক অবস্থা। ওষুধ আনো, পথ্য আনো—এটা খাবো না, ওটা ছোঁবো না, কতো বাহানা বাপরে বাপ। শোনো জো—সব কিছু ঠিক হয়ে যেতো, যদি তার বয়েসটা···!' একটা কম বয়েসী যোনির সাত খুন মাফ করা যায়, বুঝলে? কাঁচা মেয়েদের মাথার বুদ্ধিও থাকে কাঁচা। কেননা এ-সময় পাকা বুদ্ধির দরকার ও পড়ে না। কিন্তু একটা পুরনো যোনি—যদি সে বুদ্ধিমতীও হয়, যদি সে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দরী হয়—সবই নিরর্থক। নবীন যোনি হচ্ছে একটা বিনিয়োগ। আর প্রাচীন যোনি হচ্ছে নিরেট গচ্চা! ডেড লস্। বুড়ীরা তোমাকে এটা ওটা কিনে দিতে পারবে ঠিকই। কিন্তু তাতে তাদের শুকনো হাতে মাংস গজাবে না; কিংবা রস ঝরবে না দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে।

সত্যি বলতে কি, আইরিনকে তোমার খারাপ লাগবে না। তুমি তাকে লাগাবে টাগাবে না। তবে মনে হয়, তাকে পছন্দ করতে পারবে। তার ধন সম্পদ তোমার ভালো লাগবে না, জানি। কিন্তু সে তোমাকে বীতস্পৃহ করবে না। তার বুক এখনো আঁটসাঁট, কিন্তু ওই হাতদুটো! আমি তাকে বলেছি, এক সময় তোমাকে নিয়ে যাবো ওখানে। জানি না, তাকে তোমার পছন্দ হবে কি না।…

: সে যখন ধনী, আমি নিশ্চয়ই তাকে পছন্দ করবো। তার বয়েস কতো, আমি তার থোড়াই পরোয়া করি। এখনো তো একেবারে পুরোপুরি বুড়ী সে নয়।'

: না, তা নয়। বরং সে বেশ আকর্ষণীয়। চমৎকার কথা বলে সে। কেবল তার ওই হাত দুটোই না—'

: ঠিক আছে। তুমি যদি না করো, আমি ওকে করবো। আমিই লাগাবো। তাকে বলতে পারো কথাটা। এই ধরনের মহিলাদের সঙ্গে একটু ধীর আচরন করতে হয়। তুমি ওকে আমার কাছে আনো এবং ঘটনাকে স্বয়ংক্রিয় হতে দাও। ও, হিংসে হচ্ছে তোমার? ঠিক আছে, না হয় আমরা দু'জনই ওর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হবো। আমরা এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো কতো জায়গায়। একত্রে বসে আহার করবো। আমরা বেড়াবো, শিকার করবো আর ভালো ভালো পোশাক পরবো। যদি সে বোনিওতে যেতে চায়, তো নিয়ে নাও আমাদের সঙ্গে। আমিও অবশ্য বন্দুক ছুঁড়তে পারি না;

কিন্তু তাতে কী আসে যায়? তারো এতে কোনো অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। সে কেবল একটা জিনিসই চায়—তাকে লাগাও! তুমি বারবার কেবল তার বাহুর কথা বলো। ওই বাহুর দিকে তুমি কি বারবার তাকাও? যেমন এই বিছানা, এই আয়নাটা—এগুলোর দিকে কখন তাকাও তুমি। না, যখন এগুলো নিয়ে কাজ করো বা ব্যবহার করো। তেমনি, ওর বাহুর দিকেও তো তোমাকে সব সময় তাকাতে হবে না। খামোখা আবোল তাবোল বকো কি জন্যে, তাহলে? তুমি কি এই রকম নোংরা জীবনই যাপন করে যাবে? তুমি এখনো তোমার হোটেলের বিল শোধ করোনি। একটা চাকরিও তুমি করো। একে বেঁচে থাকা বলে না। তার বয়েস যদি সত্তরও হয়, তাতেও কিছু যায় আসে না। এ অবস্থার চেয়ে ওটা অনেক ভালো।

: শোনো, জো, আমার পক্ষ থেকে তুমি ওকে লাগাও। সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো। অবশ্য মাঝে মধ্যে আমিও করবো। বিশেষ করে যেদিন রাত্রে আমার ছুটি থাকবে। চারদিন ধরে আমার পায়খানা পরিষ্কার হয় না।...

: তোমার পাইলসের খবর কি?

: আমার চুলও পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ডেন্টিস্টের কাছেও যেতে হবে।...আমরা যদি বোর্ণিওতে যাই, হয়তো দু'একটা বাড়তি অসুখও অর্জন করে নেবো আমি—। যেমন জ্বর কিংবা কলেরা। কিন্তু এই প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যাওয়া,

পাছায় ঘা-গজানো খবরের কাগজের চাকরির চেয়ে তা হবে শত গুণ ভালো। আমি ধনী হতে চাই। এক সপ্তাহের জন্যে হলেও। তারপর কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে আমি ভর্তি হতে চাই হাসপাতালে। রুম ভর্তি ফুল, নার্সরা চারপাশে নাচছে, টেলিগ্রাম আসছে। তুমি যদি বড়লোক হও, তাহলে ওরা তোমার বিশেষ যত্ন নেবে। তারা ধুয়ে মুছে দেবে তোমার শরীর, আঁচড়ে দেবে চুল। তবে আমি হয়তো মারা যাবো না একেবারে। সারা জীবনে পঙ্গু হয়ে থাকবো। কাল কাটাতে হবে আমাকে হুইল চেয়ারে বসে। তবুও আমার সেবা-যত্নের ঘাটতি হবে না। এমনকি তখন যদি আমি আর বড় লোক নাও থাকি। তুমি যদি সত্যি সত্যি অচল হয়ে পড়ো তারা তোমাকে অনাহারে থাকতে দেবে না। তুমি শুয়ে থাকবার জন্যে পরিস্কার বিছানা পাবে। তারা তোয়ালে পাল্টে দেবে রোজ। কিন্তু এ অবস্থায় কেউ তোমাকে কিছু দেবে না। বিশেষ করে তোমার যেখানে একটা চাকরি আছে। লোকে ভাবে, যার একটা চাকরী আছে, সে-ই সুখী। তা তুমি কি করবে চাঁদ? পঙ্গু হয়ে থাকবে, চাকরি করবে, নাকি একটা ধনী যোনিকে বিয়ে করে ফেলবে? তুমি বরং একটা বড়লোক মেয়েকে বিয়ে করে নাও। তুমি কেবল খাবার চিন্তা করো। একটা শাসালো বউ থাকলে তোমার আর ভাবনা কি? অবশ্য সব সময় হয়তো তোমাকে তার পায়ে পায়ে ঘুরতে হবে পুডল্‌ কুকুরের মতো। না, না,

সবচেয়ে ভালো হবে, তাকে বিয়ে করার কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়া। অসুখটা যেন কেবল সিফিলিস, কলেরা বা পীতজ্বর না হয়। যদি এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেই যায়, তাহলে বাকি জীবনের জন্যে তুমি হয়ে পড়বে পঙ্গু। তখন তোমার জন্যে যৌন-সঙ্গমের সুযোগ বা প্রয়োজন থাকবে না। সম্ভবত সে তোমাকে দামী একখানা হুইল চেয়ারও কিনে দেবে। তখন হয়তো তোমার হাতটা সচল থাকবে। আমি বলতে চাইছি, তোমার লেখার ক্ষমতা নষ্ট হবে না। অথবা হয়তো বা তুমি এ-জন্যে একটা সেক্রেটারিও রাখতে পারবে। এটা হচ্ছে—একজন লেখকের জন্যে সেরা সমাধান! একটা মানুষ তার হাত আর পায়ের কাছ থেকে কী আশা করে? নিশ্চয়ই লেখার সহায়তা নয়? লিখতে হলে দরকার নিরাপত্তা···শান্তি···পরিচর্যা। যে সব বীর হুইল-চেয়ারে বসে কুচ-কাওয়াজ করে···ভাবতেও খারাপ লাগে যে এরা লেখক নয়। তুমি কি নিশ্চিত যে যুদ্ধে গেলেই পা উড়ে যাবে? যদি তাই হয়, তাহলে আমি চাই, কালকেই একটা যুদ্ধ বাঁধুক। আমি ওইসব পদক টদকের ধার ধারিনা—ওগুলো ওদের কাছেই থাকুক। আমি চাই একটা হুইল-চেয়ার এবং দিনে তিন বেলা খাওয়া। আর তখনই আমি পড়বার জন্যে ওই কুত্তার বাচ্চাদের কিছু একটা দেবো।

পরের দিন বেলা দেড়টায় ভ্যান নর্ডেনকে গিয়ে ডাকলাম। আজ তার ছুটি। সে বললো, 'সারা রাত তার একটু ঘুম হয়নি।'

বললো, 'ছোঁড়াটা—মানে ওই কার্ল একটা শিল্পী। সে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছে আমাকে। সে এমন নিখুঁতভাবে সব কথা বলেছে, যা আমার কাছে মনে হয়েছে ডাহা মিথ্যে। কিন্তু মন থেকে তা আবার ঝেড়েও ফেলতে পারছি না। ওই নিয়েই যেন মনের মধ্যে ঝড় চলছে আমার!'

ভ্যান নর্ডেনের ধারণা, তাকে যন্ত্রনাদগ্ধ করবার জন্যে কার্ল তৈরী করেছে গল্পটা। এটা একটা 'কল্পনা', যা কার্ল তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর ওই কল্পনাটা তাকে পেয়ে বসেছে বেশ ভালোভাবেই। যদি পুরো গল্পটা মিথ্যে হয়—কল্পনাটা সত্যি। সবচেয়ে ভয়ের হলো ঘটনাটা যদি সত্যি সত্যি ঘটে থাকে—এই দুশ্চিন্তাটা!

: সে বলেছে, ওকে নাকি ছ'-সাতবার লাগিয়েছে।—ভ্যান বললো—ব্যাটা যে বাড়িয়ে বলছে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু গাড়িতে চড়ে বেড়াবার সময় ওর স্বামীর ফার কোট গায়ে দিয়েছে—এটা অসহ্য। হয়তো সে তোমাকে বলেছে, সোফার অপেক্ষা করছিলো বিনীত ভঙ্গিতে। আর ইঞ্জিন সর্বক্ষন কী রকম আওয়াজ করছিলো, সে দিয়েছে তার বিশদ বিবরণও। যীশু, যে গলাটা বানিয়েছে নিখুঁত করেই। সত্যি, ওর ডিটেলের দক্ষতা স্বীকার করতে হবে। ঘটনাকে সে এমনভাবে তোমার মগজে বুনে দেবে, যে বিশ্বাস না করে তোমার উপায় নেই। ভাবলে অবাক হয়ে যাই, সে এমন স্বাভাবিক, এমন সহজভাবে বলে যায়। চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি। আর ছোকরা মেঝের

কার্পেটের ওপর বসে বসে তাকে লক্ষ্য করছিলো। বলছিলো, তুমি কতো সুন্দরী !···সে কি তোমাকে বলেছে, মেয়েটি মাতিসের আঁকা মেয়েদের মতো দেখতে? আরো অনেক স্তুতি-বাক্য সে উচ্চারণ করছে অবলীলাক্রমে। নিশ্চয়ই ফরাসী ভাষায়। ফরাসী শব্দগুলো শুনতে সুন্দর, যদিও মনে রাখা কষ্টকর। ছোঁড়াকে হয়তো কবি বলে মনে করেছে সে।

ভাবো একবার, সে হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসে আঙুল দিয়ে তার যোনিটা ফাঁক করলো! তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? যাই হোক, সে বেশ কয়েকবার লাগালো ওকে। তারপর আবার আঙুল দিয়ে ফাঁক করলো যোনিটা। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হলোঃ ফিস্ ফিস্। ঠিক এই রকম আঁঠালো আর মৃদু একটা শব্দ! যীশু হে! ফিস্ ফিস্ ফিস! সারারাত যেন এই আওয়াজটা আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। আমাকে পাগল করে ফেলেছে। তারপর যোনির ঘন চুলের মধ্যে সেই মুখ ডোবানোর ব্যাপারটাই ভাবো না একবার। ওহ্ হো,—তখন মেয়েটি ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা তুলে দিয়ে ওকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরেছে, যাতে ছোঁড়া নিজেকে ছাড়াতে না-পারে। যেন ইঁদুর পড়েছে যাতা কলে। এই বর্ননায় আমি তো একেবারে যাকে বলে শেষ। ভাবো তো একবার। অমন সম্পদ শালানী, সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলা আর কারো নয়, ওই কার্লের ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে আছে আর তড়পাচ্ছে···। এমন সাংঘাতিক, এমন

মর্ম ঘাতী এ ব্যাপার, যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। আমি হলফ করে বলতে পারি, এরকম কোনো বর্ণনা ও বইয়েও কোনোদিন পড়েনি। এটা নিশ্চয়ই সত্য। এতো বেশী কল্পনার দৌড় ওর হতেই পারেনা।'

যখন শয্যাত্যাগ করে ভ্যান দাড়ি কাটতে শুরু করলো, দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গেছে। আজ দুপুরের মধ্যেই ঘরটা ছেড়ে দেবার কথা। কাজের মেয়েটা দেখতে এসেছে, গোছ গাছের কদ্দুর কি এগিয়েছে! কিন্তু মেয়েটির সামনেই সে প্যান্ট পরতে শুরু করলো। মেয়েটির পেছন দিকে না ঘুরেই ও যখন টুক-টাক ফরমাস দিতে শুরু করলো, আমি তো হতভম্ব। ভ্যান বললো, ওর কথা ভেবোনা। লক্ষ্মী মেয়ে। ওর পাছায় একটা চিম্‌টি দাও—কিসসুটি মনে করবেনা। এটুকু সে উচ্চারন করলো ফরাসীতে। আর ইংরেজীতে বললো: এখানে আয় কুত্তি! হাত লাগা!' আমি তো হেসেই অস্থির। মেয়েটি না বুঝতে পারছে ভ্যানের কথা—না আমার হাসির অর্থ। সে বোকা বোকা চোখ মেলে ইতিউতি তাকাতে লাগলো কেবল। মেয়েটি দেয়াল থেকে নামিয়ে রাখছিলো ভ্যান নর্ডেনের ফটোগ্রাফ। বেশ ক'খানা ছবি। নর্ডেন হাত ইশারা করে মেয়েটিকে বললো—একটা ছবি তুইও রেখে দে মাগি। পরে পাছা মুছিস! তারপর আমার দিকে ঘুরে বললো, আরে, এ ছুড়িটা বদ্ধ কালা। একদম কানে শোনেনা। আমি ফরাসীতে বললেও সে কিছু বুঝবে না!'

ভ্যান নর্ডেনের ভাবভঙ্গী দেখে অবশ্য মেয়েটি ভাবছে, লোকটা ক্ষেপে গিয়েছে। কিন্তু তার হাঁ-করা মুখের দিকে ইঙ্গিত করে ভ্যান একখানা ফটো কুড়িয়ে নিলো। তারপর নিজের পশ্চাদ্দেশ ঘষতে ঘষতে ইশারা করে বোঝালো ব্যাপারটা। কমে কা! সাভি? 'গোল্লায় যা তুই। এখন ছবি এঁকে বোঝাতে হবে নাকি তোকে?' বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে, বললো ভ্যান।

মেয়েটি বড়ো ব্যাগে জিনিস-পত্র ভরছিলো। ভ্যান একটা টুথব্রাশও তার হাতে তুলে দিয়ে বললো—'এটাও ভরো!' জিনিষ পত্রের অর্ধেক পড়ে আছে মেঝেয়। অথচ ঝোলাতে আর সূচ রাখবার জায়গাও নেই। বই আর পেইন্টিং গুলোও পড়ে রয়েছে এখনো। আর অর্ধেক খালি হয়ে থাকা বোতল গুলো?

: আরে, আমাদের হাতে এখনো সময় আছে অনেক!' —সে বললো।— কি 'ভাবে এসব জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে ঠিক করতে হবে। তুমি যদি আজ না-আসতে, তাহলে আমার আর উপায় ছিলো না। আমি এখান থেকে বেরোতেই পারতাম না। দ্যাখো, আমি কী রকম এঁকা, কতো অসহায়! খেয়াল রেখো, বাল্‌ব গুলোর কথা যেন ভুলে ফেলে না-যাই। এগুলো আমার। ওই ঝুড়িটাও আমার। ওরা চায় তুমি শুয়েরের মতো জীবন যাপন করো—বেজন্মার দল।'

কাজের মেয়েটা নীচে গেছে দড়ি আনতে। ভ্যান বললো,

'দেখো তুমি, ওই দড়িটার জন্যেও ও পয়সা চাইবে। ওরা পয়সা ছাড়া তোমার প্যাণ্টের বোতাম ও লাগিয়ে দিবে না। শালা, হাড় হাভাতে ফকিরের দল।' কালভাদোর একটা বোতল হাতে নিয়ে সে বললো, তুমিও আর একটু তুলে নাও। এ গুলো বয়ে নিয়ে যাবার কোনো দরকার নেই। বোতল ক'টা এখনই খালি করে ফেলা যাক। কিন্তু সাবধান, ওই বোবাটাকে এক ফোঁটাও দেবে না। বেটি খান্‌কী! আমি এ ঘরে এক টুকরো টয়লেট-পেপারও রেখে যাবো না। যাবার সময় হেগেমুতে ছয়লাপ করে রেখে যাবো সবকিছু। তুমি মেঝের মধ্যে প্রস্রাব করে দাও বরং। আমি ড্রয়ারের মধ্যে এক দলা গু তুলে রাখবো। মোটকথা ভ্যান নর্ডেন এতো বিরক্ত হয়েছে যার সামান্যও সে প্রকাশ করতে পারছিলো না। সে বোতল হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো বিছানার ওপর দিয়ে। চাদর তুলে সে মদ ঢেলে জাজিম ভেজাতে আরম্ভ করলো ক্ষিপ্রহাতে। শেষে চাদরটা তুলে নিয়ে তা দিয়ে নিজের জুতো জোড়া মুছতে থাকলো ভ্যান নর্ডেন। থুথু ফেললো আয়নায়। ময়লা ছেঁড়া মোজাটা সে ফেলে দিলো। রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো সে ছবিগুলোর দিকে চেয়ে। একটা ছবি হাতে তুলে নিয়ে সে লাথি মেরে ছিঁড়ে ফেললো। বললো, 'কুত্তী!' জানা গেলো, তার এই ছবিটা এঁকে দিয়েছিলো এক লেসবিয়ান মেয়ে। যে মেয়েটিকে লাগা-

বার সময় সে ভ্যানকেই বলেছিলো, 'তোমার যোনি ফাঁক করো!'

: ওকে নিয়ে অনেক লিখেছি আমি কাগজে। কিন্তু সে জন্যে আমাকে একটা পয়সাও দেয়নি কোনোদিন। ভেবেছিলো, নিছক প্রশংসা হিশেবেই আমি ওসব লিখেছি এবং ছাপাবার ব্যবস্থা করেছি। এ ছবিটি অবশ্য আমাকে কখনো দিতো না। একবার মিনেসোটা থেকে আসা একটা লেসবিয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে দিলে ও আমাকে খুশি হয়ে ছবিটা প্রেজেন্ট করে। ওই মিনেসোটার মাগিটাকে জুটিয়ে না-দিলে অবশ্য সে আমাকে ছাড়তো না। হাড় চামড়া চিবিয়ে খেতো একদম!'

আমরা মালপত্তর নিয়ে বাইরে বেরুলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই আমাদের কানে এলো হোটেলওয়ালীর আর্তনাদ, 'কী সর্বনাশ! শয়তানটা একি হাল করে রেখে গেছে ঘরটার!'

এই হোটেলটা একটা সরু গলির মধ্যে। পুরোনো। লবিটা বেশ বড়ো। মিনে করা ইট। খাঁচায় খাঁচায় পাখি দোল খাচ্ছে। এখানে ওখানে এনামেল-সাইন—এটা করবেন না, কিংবা এটা করুন! বেশ পয়-পরিস্কার হোটেলটা। কিন্তু কেমন যেন একটা দারিদ্র, একটা হতচ্ছাড়া ভাব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হাতল-ওঁচানো চেয়ারগুলো এক সঙ্গে লাগানো। মনে হয়, তার জাতীয় কিছু দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন, ইলেকট্রিক-চেয়ার!

ভ্যান নর্ডেনের রুমটা পাঁচ তলায়। আমরা সিঁড়ি দিয়ে

উঠবার সময় সে বললো, 'মপাসাঁ এক সময় এ-হোটেলে থাকতেন!' এবং এক নিঃশ্বাসেই সে জানালো, 'লবিটা যেন কেমন একটা বিদঘুটে গন্ধে ম ম করছে।' পাঁচ তলায় বেশ ক'খানা জানালার পাল্লা নেই। আমরা নিচের লোকগুলোকে তাড়াহুড়ো করে আঙিনা পেরিয়ে খাবার ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। এরাই তাহলে এই হোটেলের বাশিন্দা! দেখেই মনে হয়, যা আয় করে তাতে কোনো মতে তাদের থাকা-খাওয়াটা চলে যায়। আর কিছুই নয়। খোলা জানালা দিয়ে নোংরা, অগোছালো রুমগুলোতে গা-চুলকোতে থাকা লোকগুলো দেখলে পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

আমরা ৫৭ নং কক্ষের কাছাকাছি আসতেই দড়াম্ করে পাশের রুমের দরজাটা ভেতর থেকে খুলে গেলো। ক্ষ্যাপাটে চেহারার একটা বুড়ি। তার দিকে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা থম্‌কে দাঁড়িয়েছি। অবস্থাটা এমন যে, আমরা তিনজনই তাকিয়ে আছি পরস্পরের দিকে। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। বুড়ীর পেছনেই দেখা গেলো একটা কিচেন-টেব্‌ল আর তার ওপর শুয়ে আছে উলঙ্গ শিশু। হঠাৎ মেঝে থেকে কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে বুড়ীটা চলে গেলো সামনের দিকে। আমরা সরে দাঁড়িয়ে তাকে যাবার মতো পথ করে দিলাম। আর দরজাটা বন্ধ হতে না হতেই ভেতরে সেই উদোম বাচ্চাটার চিল-চিৎকার শোনা গেলো। এই রুমটার নম্বর ৫৬। এবং ৫৬ ও ৫৭ নম্বর রুমের মাঝখানে যে টয়লেট,-

বুড়ীটা সেইখানে গিয়ে তখন তার তলপেট খালি করে ফেলছে। পাঁচ তলায় উঠবার পর থেকেই ভ্যান নর্ডেন চুপচাপ। কিন্তু তার চোখ জোড়া দ্রুত ছোটাছুটি করছে এদিকে ওদিকে। সে ৫৭ নম্বর ঘরটার দরজা খুলতেই আমি চমকে উঠলাম। দরজা খুলে ঢুকলেই, উল্টো দিককার দেয়াল ঘেঁষে একটা বইভর্তি বেবী-ক্যারিজের ওপর মস্ত বড় এক আয়না। ভ্যান নর্ডেন কোনো কথা না বলে খুবই ধীরে সুস্থে বেবী-ক্যারিজের ওপর থেকে তুলে নিলো একখানা বই। যেন পাবলিক লাইব্রেরীর তাকের সামনে সে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়ানো। আরেক দিকে চোখ পড়তেই আমি দেখলাম, এক জোড়া হ্যাণ্ডেল-বার পড়ে আছে। জিনিসটা যেন আমার কাছে কেমন অলৌকিক মনে হয়। যেন অনন্তকাল ধরে ওই হ্যাণ্ডেল বার জোড়া কেউ ওখানেই রেখে দিয়েছে। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম নানা কথা ভাবতে ভাবতে। চমক ভাঙলো ভ্যান নর্ডেনের গলা শুনে। সে বলছে: 'একটা ছারপোকা-নিবাস!' তার মুখে এমন এক ধরনের হাসি যা দেখে আবার মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমি। মনে হলো, আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক দীর্ঘ কড়িডোরের এক প্রান্তে। তার মুখের হাসিটাকে মনে হচ্ছে সেই লণ্ঠন, রাত্রির ভেজা ও পিচ্ছিল রাস্তায় সাইকেল-চালকরা দাঁতে আটকে রাখে যার হাতল। ঘরের ভেতরে ও বাইরে ভ্যান হাঁটাহাঁটি করছিলো। যেই না চেয়ারে বসেছে, সেটি ভেঙে পড়লো। সে যখন তার

ঝোলা খুললো, দেখা গেলো তার ভেতরে একটা টুথব্রাশ ছাড়া আর কিছু নেই!

ঘরের ভেতরে লাগেজ নিয়ে ঢোকার পর, পরিবেশ যেন আরো খোলতাই হয়ে উঠলো। বিশেষ করে সে যখন তার এক্সারসাইজারটা ছিছানার কাছে বসিয়ে শরীরচর্চা শুরু করলো, দৃশ্য হয়ে উঠলো পরম উপভোগ্য। 'জায়গাটা খারাপ নয়।' সে বললো। হেসে ইশারা করলো সে ভৃত্যের দিকে। তারপর কোট এবং গেঞ্জি খুলে ফেললো। চাকরটা তো অবাক। তার এক হাতে ঝোলা অন্য হাতে ব্যাগ। এঘরের কোনো একটা জিনিসও যেন স্বাভাবিক নয়। এরকম পরিবেশ আমি যেন আগেও দেখেছি প্যারিস রয়্যাল থিয়েটারে কিংবা কমেদি ফ্রাঙ্কাইসে।

অল্প আগে ওপর তলায় ওঠার সময় ভ্যান নর্ডেন উল্লেখ করেছিলো মপাসাঁর কথা। হয়তো এ-কথাও তার মনে হয়েছে যে, বেশ কয়েকটি অসাধারণ গল্প মপাসাঁ এখানে বসেই লিখেছিলেন।—'তাহারা শূকরের ন্যায় জীবন ধারণ করিত—সেই হতভাগ্য বেজন্মারা!'—সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো। চেয়ারে বসে পাইপ ধরালো ভ্যান নর্ডেন। দাঁতের নিচের পাটিতে সে গুঁজে দিলো সুতি। জানালা দিয়ে খয়েরী রঙের থুথু ফেললো বেশ কয়েকবার। তাকে এখন অনেক স্বাভাবিক আর আস্থাবান মনে হচ্ছে।

: আমেরিকায়—বললো সে,—'তুমি এরকম একটা থাকার

জায়গার কথা কল্পনাও করতে পারবে না। আমার যখন খুব দুর্দিন, তখনো আমি এর চেয়ে ভালো ঘরে ঘুমিয়েছি। কিন্তু এখানে এটাই স্বাভাবিক। ঠিক বইয়ে যে রকম পড়েছো,—তাই। আমি যদি কোনোদিন ফিরে যাই, তবে এখানকার সব কিছু ভুলে যাবো। যেমন মানুষ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি ভুলে যায়। তবে আমি হয়তো এখানকার এই জীবনটাই বয়ে নিয়ে যাবো, যেখানেই যাই। অবশ্য আদৌ আমার কোথাও যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ আছে। একেক সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি অতীতের কথা চিন্তা করি। সে চিন্তা এতো গাঢ়, এতো গভীর যে—একেক সময় চমকে উঠে জরিপ করি—স্বপ্ন দেখছি কিনা। কিংবা আমি এখন কোথায়। বিশেষ করে আমার পাশে যদি কোনো মেয়ে থাকে। মেয়েই কেবল পারে আমাকে সচেতন রাখতে। তাই তো, নিজের কথা ভুলে থাকবার জন্যে আমি মেয়েদের সঙ্গে-সাহচর্য কামনা করি সব সময়। মাঝে মাঝে আমার ভাবনা এমন গাঢ় হয় যে মেয়েটার নাম কি, অথবা কোন পাড়া থেকে তাকে তুলে এনেছিলাম একদম ভুলে যাই। কি, তুমি হাসছো বুঝি? দ্যাখো, পাশে একটা টাটকা গরম শরীর রেখে ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা বড় আনন্দদায়ক। এটা তোমার মনকে চনমনে, ঝড়ঝড়ে করে তোলে। বেশ একটা অতীন্দ্রিয় স্পর্শ—অন্ততঃ যতোক্ষণ পর্যন্ত ওরা প্রেমালাপ শুরু না করে। এই মাগিরা কেন যে অতো ভালোবাসা-ভালোবাসা করে আমি বুঝি না। তুমি বলতে পারো এর কারণটা

কি ? একটা চমৎকার শট লাগাবার পরও যেন ওরা খুশি নয়। ওরা তোমার আত্মাটাকেও চায়।···

এক দিক দিয়ে দেখলে, ভ্যান নর্ডেন একটা পাগল। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তার ভয় ওই একটাই—একা হয়ে যাবার ভয়। এমন কি সে যখন কোনো মেয়ের ওপর শুয়ে আছে, তখন হঠাৎ এই দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসতে পারে। 'আমি এই চিন্তাটার খপ্পর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কম চেষ্টা করিনি।' ভ্যান বললো, এমন কি কখনো কখনো জটিল দার্শনিকতত্ত্ব নিয়েও ভাবতে শুরু করেছি। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। যেন, আমি দ্বৈত-সত্ত্বার অধিকারী। একজন আমার ওপর অন্য এক আমি যেন সর্বক্ষন নজরে রাখছে। একেক সময় এমন ক্ষেপে যাই আমি, যে মনে হয়, আত্মহত্যা করি।···একদিন আমি একখানা বই লিখবো। সেখানেই আমি অকপটে তুলে ধরবো নিজেকে। কোনো কিছুই গোপন করবো না সেখানে। কেউ যা কখনো করেনি, আমি তাই করবো। তুমি হাসছো যে! এটা কি একটা হাসির ব্যাপার হলো ?

কিন্তু ভ্যান নর্ডেনের পক্ষে বইটি শুরু করা অসম্ভব বলেই মনে হয় আমার। তার মাথায় কোনো আইডিয়া এলেই সে মনে করে, এ-ব্যাপারে দস্তয়েভস্কি অথবা হামসুন কিংবা অন্য কেউ আগেই লিখে রেখে গেছে।—'আমি অবশ্য এ-কথা বলি না যে, তাঁদের চেয়ে ভালো লিখবো। তবে কিনা, আমি চাই

ভিন্নতা।'—সে ব্যাখ্যা করে। আর তারপর সে শুরু করে দেয় একটার পর একটা বই পড়তে, যাতে কোনো পুরোনো কথা তার নতুন বইয়ের ভেতরে ঢুকে না পড়ে। একটি অধ্যায়ও যে এ-পর্যন্ত লিখে উঠতে পারেনি, তার বক্তৃতা শুনলে মনে হয়, শেলফের অন্ততঃ এক তাক বই তার নাম বক্ষে ধারন করে আছে। কেবল তাই নয়। এ-সব চিন্তা ভাবনা নিয়ে সে রাস্তা থেকে তুলে আনা মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ করে। নিজের লেখা কবিতাও সে পড়ে শোনায় ওই মূর্খ মেয়েগুলোকে। মতামত জানতে চায় তাদের। কিন্তু দুর্বোধ্য কতগুলো শব্দ পাশাপাশি দেখে মেয়েগুলোর তো অবস্থা কাহিল। তারা কি মতামত জানাবে? এজরা পাউণ্ডের ক্যান্টোস থেকে পংক্তি তুলে নিয়ে সে ওই মেয়েদের কাছে তা এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকে, যেন তালার ফুটোয় চাবি ঢোকাচ্ছে।

অবশ্য এদের মধ্যে একটি মেয়েকে সে খানিকটা তৈরী করে নিতে পেরেছে। ওদের প্রথম পরিচয় আমেরিকায়। এখন তো দু'জনেই আছে প্যারিসে। সম্ভবতঃ মেয়েদের মধ্যে এক মাত্র ওর সঙ্গেই ভ্যানের ভাবের আদান প্রদান একটা উল্লেখযোগ্য স্তরে। সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ট এবং বিচিত্র তো বটেই। দেখতে সে খারাপ নয়। আবার ভালোও তাকে বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, শরীরটা বেশ শাঁসালো। নাম বেসি। তাদের মধ্যে কী চমৎকার সমঝোতা, তার একটা প্রমাণ দিই। এক-

দিন দুপুর দেড়টায় গেছি ভ্যান নর্ডেনের কাছে। দেখলাম, বেসিও বসে আছে বিছানায়। চাদরটা নিচে পড়ে আছে এবং ভ্যান নর্ডেন তাকে বলছে, 'নুনুটায় ক'টা টোকা দাও তো—সামান্য ক'টা টোকা! তাহলেই আমি শয্যাত্যাগ করবার সাহস পাবো। অথবা ক'খানা ঘুষিই লাগাও না ব্যাটাকে!' কিন্তু হয়তো আমাকে দেখেই নিষ্ক্রিয় রইলো বেসি। তখন নর্ডেন নিজেই খপ করে নিজের শিশ্নটা হাতের মুঠোয় পুরে এমনভাবে নাড়াতে লাগলো, যেন ডিনার-বেল বাজাচ্ছে। হাসতে হাসতে ওদের দু'জনই যেন তখন দম ফেটে মরবে। —'ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে লাভটা কি?' ভ্যান নর্ডেন বলবে, 'ও আমাকে একটুও সম্মান করে না।' এবং এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বেসিকে জিজ্ঞেস করবে—'কালকে যে ব্লণ্ড মেয়েটাকে দেখালাম, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছো?' বেসি বললো, 'ইস, তোমার রুচির বলিহারি! ওটা একটা মেয়ে হলো?' ভ্যান নর্ডেনের কাছে বেসির সঙ্গে খারাপ রসিকতা যেন ডাল ভাতের মতোই সহজ ব্যাপার। যেমন সে বলবে—'শোনো, বেসি, একটা চট-জলদি শট হয়ে যাক না এখন। হবে না? তাহলে ওর সঙ্গে হোক!'—আমাকে দেখিয়ে বলবে—'ওর সঙ্গে একটিবার কেন শোবে না?'

এলিভেটর-দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলো পিকোভার। মারাত্মকভাবে। অফিসে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শুনে প্রথমটা চমকে উঠেছিলো ভ্যান নর্ডেন। কিন্তু যখন শুনলো, লোকটা পিকো-

ভার, তখন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। বললো, 'মরে বেঁচেছে! অবশ্য মরবার আগে দাঁতের পাটি কিনতে চেয়েছিলো শালা ইংরেজটা।'…

আর উর্ধ্বতন কর্তাটির ওই নকল দাঁতের প্রসঙ্গ নিয়ে যেন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। পিকোভার নাকি অর্ধচেতন অবস্থায় তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় বিড়বিড় করে বলছিলো, 'আমার দাঁতের পাটিটা কোথায় গেলো? আমার ঝুটা দাঁত!' অথচ পিকোভারের সঙ্গে মোটেই ভালো সম্পর্ক ছিলো না কর্তার। তিনি কোনোদিন প্রুফ-রীডিং ডিপার্টমেন্টে পা দিয়েছেন কিনা, সন্দেহ। ওপরতলা আর নিচতলার লোকদের মধ্যে একটা অদৃশ্য ব্যবধান সব সময়ই আছে। কিন্তু অধস্তনের মৃত্যু যেন সাময়িকভাবে হলেও, দেয়ালটা সরিয়ে দিয়েছে। তিনি বলছিলেন, 'অমন কর্মনিষ্ঠ, অমন সুদক্ষ প্রুফ-রীডার আমি খুব কমই দেখেছি।' যদিও তিনি জানেন, ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো।

পরে আমরা 'ঝুটা দাঁত' 'ঝুটা দাঁত' বলে অনেক হাসাহাসি করেছি। লোকটা মরে গেলেও, তার নকল দাঁতের স্মৃতি রেখে গিয়েছিলো আমাদের মগজের ভেতর। আসলে পুরো লোকটাই ছিলো ঝুটা। ভ্যান নর্ডেন তো দু'চোখে দেখতে পারতো না লোকটাকে। সে উল্লসিত হয়ে ওই দিনই বলেছিলো, 'পিকোভারের মৃত্যুর অন্ততঃ একটা ভালো দিক আছে। ওর চাকরিটা এবার তুমি পেতে পারো। আর তোমার ভাগ্য

যদি ভালো থাকে, তাহলে তুমিও একদিন এলিভেটর-অ্যাক-সিডেন্টে ঘাড় ভেঙে অক্কা পেতো পারো। আমি চমৎকার একটা ফুলের তোড়া নিয়ে তোমার কফিনে রেখে আসবো। হলফ করে বলছি!'

পিকোভার মারা গেছে, সে আজ অনেক দিন হয়ে গেলো। ভ্যান নর্ডেন আগের মতোই আছে। বদলায়নি এক চুলও। ভুলতে পারেনি সে জর্জিয়ান-যোনিটাকে। কিন্তু সাময়িকভাবে আহার বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেও, নিয়মিতভাবে তাকে সঙ্গে রাখতে রাজী হয় সে কী করে! 'সে আমাকে ডুবিয়ে ছাড়বে না?'—প্রশ্ন করে নর্ডেন। আসলে মেয়েটার হাড়-সর্বস্বতাই তাকে বিমুখ করে তুলেছিলো পরবর্তী সময়ে। তখন সে বলতো, 'যেন তুমি একটা কঙ্কাল পাশে নিয়ে শুয়েছো, বুঝলে?' বলতো, 'একদিন রাতে, অনেকটা দয়ার বশেই ওকে এনেছি। সে কি করেছে, জানো? জায়গাটাকে পরিপাটি-ভাবে শেভ করে ফেলেছে। যোনির ওপর একটা লোমও নেই। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, একবার ভাবো তো? যোনি-টাকে যোনি বলেই মনে হচ্ছে না আর। আরে মিয়া, চুলই তো যোনিকে সুন্দর, রহস্যময় আর আকর্ষণীয় করে রাখে। আর শেভ করলে? ঠিক যেন একটা স্ট্যাচুর যোনি। অবশ্য একবার একটা স্ট্যাচু দেখেছিলাম, যার যোনি বাস্তবতা-সম্মত। রদাঁর ভাস্কর্য সেটি—তোমাকে এক সময় দেখাবো-খন। মূর্তিটার বোধ হয় কোনো মাথা ছিলো না। কেবল

যোনি, হ্যাঁ ওই যোনিটাই। যীশু—যা ভৌতিক মনে হচ্ছিলো যোনিটাকে।

অথচ, আসলে দু'পায়ের মাঝখানে একটা চিড়-খাওয়া জায়গা ছাড়া ওটাতো আর কিছুই নয়। আমরা যা নিয়ে মাথা কুটি, তাতো একটা কাল্পনিক ব্যাপার। এটা এতো বেশী অর্থহীন, যে আমি দশ মিনিট টর্চ জ্বেলে দেখেও এর মধ্যে কোনো রহস্যময়তা খুঁজে পাইনি। একটা ফাঁক ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়। যদি ওর ভেতর একটা মাউথ-অর্গান কিংবা ক্যালেণ্ডার পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু ওর ভেতরে কিস্‌সুটি নেই হে। কিস্‌সু নেই! এ এক বিরক্তিকর জিনিস। যাই হোক, কোনো মতে ওই অবস্থাতেই ওকে চট করে একটু লাগাবার পর আমি ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটা বই পড়তে শুরু করলাম।—যোনি?—ধেৎ—সময়ের অপচয়!'

নর্ডেন যখন কথা বলছিলো, তখন একটা বেশ্যা আমাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলো। সে আমাকে বললো, 'ওকে লাগাবে নাকি?' বেশী খরচ হবে না···আমাদের দু'জনকেও দেবে।' এবং আমার জবাবের তোয়াক্কা না করে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। ফিরে এলো সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।—'সব ঠিক করে এলাম।' সে বললো—'বিয়ারটা তাড়াতাড়ি শেষ করো।—আমাদের দু'জনের জন্যে সে নেবে পনেরো ফ্রাঁ। চলো, আমার ঘরেই যাই।

তাতে শস্তা পড়বে ! জলদি করো, মাগির খিদে পেয়েছে !'
পথে মেয়েটি আব্দার ধরলো, এক কাপ কফির জন্যে। মেয়েটি কিছুটা ভদ্র গোছের। দেখতেও খারাপ নয়। সে ভ্যান নর্ডেনকে চেনে হাড়ে হাড়ে। সে বেশ জানে, ওই পনেরো ফ্রাঁর বেশী একটা কানাকড়িও লোকটার হাত দিয়ে গলবে না। ভ্যান নর্ডেন বললো—'আর এক পয়সাও বেশি খরচ করতে পারবো না আমি।' যদিও আমার পকেটে একটা পাই-পয়সা নেই ; তবুও সে আমাকে সতর্ক করে দিলো। 'যীশুর দোহাই, মন নরম করবে না। ওকে দশ ফ্রাঁতেই পেতাম। খামোখা পাঁচটা ফ্রাঁ গচ্চা দিচ্ছি। আবার কফির বায়না ধরে ! অতো বেশি আস্কারা দিতে নেই !'
ঘরে ঢুকেই মেয়েটি জানতে চাইলো, দু'এক টুকরো রুটি আছে কিনা। হাসলো ভ্যান নর্ডেন। একটা বোতল বের করে বললো, 'নাও একটু মদ খাও !' কিন্তু মেয়েটি মদ খেয়েছে আগেই। 'পেটটা একদম খালি। খালি পেটে নিরেট কিছু না দিলে—।' মেয়েটি বললো।
: ধরতাই-বুলি ! সব সময় মাগি একথাই বলে !—ভ্যান নর্ডেন আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলো। 'ওর মিথ্যে কথায় কখনো নরম হবে না। খিদে পাওয়া মাগি লাগাতে আগপেই ভালো লাগবে কি ? মনের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে !
ভ্যান নর্ডেন যখন তাকে নিয়ে কাজে লিপ্ত হলো, আমার কাছে দু'জনকে দুটো যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিলো না।

মনে হলো যন্ত্রটি হাতল ঘুরিয়ে না-থামালে অনবরত চলতেই থাকবে। দু'জনই যেন দু'টো ছাগল, যাদের আবেগ বলতে কিছু নেই। আবেগ না থাকলেও হিসেব তাদের ঠিকই আছে। ওই পনেরো ফ্রাঁর হিসেব। আর কোনো কিছুই ধর্তব্য নয়—ধর্তব্য ওই পনেরো ফ্রাঁ। মেয়েটি দু'পা ফাঁক করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ভ্যান নর্ডেন সওয়ার হয়েছে তার ওপর। তার পা দু'খানা যেন মেঝের মধ্যে গাছের মতো বুনে দেয়া হয়েছে। আমি ও এই দৃশ্য উপভোগ করছি যান্ত্রিক ভাবে। ঘটনাটি যদি অনন্তকালব্যাপী অব্যাহত থাকে, তাতে যেন আমার কিছুই আসে যায়না। যেন আমি বসে আছি একটা প্রিন্টিং-মেশিনের সামনে, যেখান থেকে ছাপা হয়ে বেরুছে নিরর্থক শিরোনামা-সমন্বিত লক্ষ কোটি খবরের কাগজ। অবশ্য মেশিনের সালতাও অনেক সময় মানবিক-আচরনের চাইতে প্রানবন্ত মনে হয়। মানবিক-উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্প্রান ওই সংবাদ পত্রের চেয়ে। ভ্যান নর্ডেন আর মেয়েটি সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি যদি এভাবেই বসে থাকি এবং সারা দুনিয়া জুড়ে একই কাণ্ড শুরু হয়, তাতেও আমার কৌতুহল সামান্য বাড়বে না। চলমান ঘটনার সঙ্গে বৃষ্টিপাত কিংবা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে কী তফাৎ—তাও আমার বোধের বাইরে।

আমি হাঁটু মুড়ে উচু হয়ে লক্ষ্য করছিলাম খুব মনোযোগের সঙ্গে। মেয়েটি মাথা কাৎ করে আমাকে দেখে বিবর্ন মুখে

বললো, 'এটা একটা কথা হলো?—না না এ অসম্ভব!' কিন্তু নতুন উদ্যমে আর এক দফা শুরু করেছে ভ্যান নর্ডেন। যেন একটা বুড়ো পাঁঠা! যারা শিঙ ভেঙ্গে গেলেও সঙ্গমে বিরতি দেবার নাম পর্যন্ত করেনা।

: ঈশ্বরের দোহাই—জো, এখন থামো! মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবে?

: চুপ করো! সময় হলেই ছাড়বো!

আমার এখন মনে পড়ে যাচ্ছে সেই স্বপ্নাচ্ছন্নতার কথা।... দীর্ঘ করিডোরের এক প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। টুথব্রাশ ছাড়া ভ্যান নর্ডেন সব কিছুই হারিয়েছে। সে যে চেয়ারটিতে বসেছিলো, সেটি ভেঙ্গে পড়েছে। যে ঘরখানাতে সে ঢুকেছে, তা আসবাবপত্র-শূন্য। তার মুখ বিস্বাদ। স্বপ্ন আর বাস্তব যেন একাকার হয়ে গেছে।

ঘুমের ভেতর তার দেহটা যেন চুরি হয়ে গেছে। সে এখন একটা মুদ্রন-যন্ত্র, যার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে রোজ লক্ষ-কোটি সংবাদপত্র। যাদের প্রথম পৃষ্ঠাটি নানা রকম দুর্যোগ-দুর্বিপাক, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি, বিস্ফোরণ, সংঘর্ষ ইত্যাদিতে ভরপুর। অথচ সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অনুভূতি ও নেই সেই সংবাদপত্রের। কেউ যদি সুইচটা অফ্ না-করে, তাহলে জানতে পারবে না, মৃত্যুর অর্থ কি? তুমি একটা বুড়ো পাঁঠার মতোই একটা যোনির ওপর বিচরন করতে থাকবে অনন্তকাল।

প্রায় হপ্তাখানেক কর্তার পাছা টিপবার পর—আমি পিকোভারের চাকরিটা পেয়ে গেছি। খবরের কাগজের অফিস। নাকি একটা পাগলাগারদ। যেখানে একবার ঢুকলে সারা জীবন আর বেরুনো যায়না। সারা দুনিয়াটা তোমার নাকের ডগায়। ওপর তলার কর্তারা কোনো কপিতেই হাত বোলান না—চোখ বোলান সম্ভবতঃ। যার জের যায় আমাদের মতো নীচতলার লোকদের ওপর দিয়ে। কোনো দুঃখ-জনক, কোনো আনন্দদায়ক ঘটনাই তাদের চোখ ফাঁকি দিতে পারে না। তাঁরা জীবনের কঠিন সত্য নিয়ে বসবাস করেন—যাকে বলে বাস্তবতা। একটা ব্যাঙের বাস্তবতা, যাদের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। তারা যতো বেশী ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে, জীবনে বাস্তবতাও যেন ততোই বেশী ফুটে ওঠে। আইন ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী ডাক্তার, রাজনীতিবিদ আর সাংবাদিক—এরা হচ্ছে সেই ধরনের হাতুড়ে চিকিৎসক, যারা দুনিয়ার নাড়ি টিপে ধরে বসে আছে। একটা ধারাবাহিক দুর্বিপাক ছাড়া একে আর কীই বা বলা যাবে? চমৎকার অবস্থা যা হোক। ব্যারোমিটার কখনো বদলানো হবে না, পতাকা সর্বক্ষন থাকবে অর্ধ-নমিত। মানুষের মনে স্বর্গ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, তা যেন এ থেকেই আঁচ করা যায়। স্বর্গের আসল চেহারা কীরকম হতে পারে, তা বোঝা দুষ্কর। তবে তা যে ওই ব্যাঙের স্বর্গ—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্যাওলা আর শাপলায় ভরা একটা পুকুর। শাপলার পরিপাটি পাতার ওপর বসে আছে

ব্যাঙ। সারাদিন ডাকছে। আমার মনে হয়, স্বর্গ অনেকটা এই রকম।

প্রুফ দেখার সময় আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। মনে হয়, বিষাক্ত জীবাণুপুঞ্জের মাঝখানেও আমি আমার চমকপ্রদ অস্তিত্বসহ পরিপূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে জীবন যাপন করছি। কোনো অঘটনই আমাকে স্পর্শ করে না। না দুর্যোগ, না যুদ্ধ, না বিপ্লব! আমি সব ধরণের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, দুঃখ আর বিষাদ—সব কিছুর উর্ধ্বে। পৃথিবীর যাবতীয় বিষ আমারই হাতের নিচ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলে যায়—আমার নখেও একটা দাগ লাগে না। আমি এমন কি একজন ল্যাবরেটরী-সহকারীর চাইতেও ভালো অবস্থায় আছি। কেননা সীসে গলাবার ঘ্রান ছাড়া আশেপাশে অন্য কোনো বদগন্ধ নেই। পৃথিবী উড়ে যাক—আমি এখানে স্থির অকম্প্র বসে থাকবো একটা কমা, অথবা একটা সেমিকোলন বসাবার জন্যে। উপরন্তু এ-জন্যে আমি একটা ওভারটাইমও পাবো। শুধু কি তাই? আরো কিছু অতিরিক্ত পাবো। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া উপলক্ষে আমাদের পত্রিকার রবিত বিশেষ সংখ্যাটি যখন প্রেসে যাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ-রীডাররা যাবতীয় কমা, সেমিকোলন, হাইফেন, ড্যাশ, ব্রাকেট, প্রশ্নবোধক চিহ্ন একত্রিত করে এডিটোরিয়াল-চেয়ারের ওপরে রেখে দেয়া ক্ষুদে বাক্সের ভেতরে ভরে রাখবে।

১১—

আমার সহকর্মীদের কেউই কিন্তু বুঝতে পারেনি, আমার পদার্পন এতোটা স্বতস্ফূর্ত, এতোটা স্বাভাবিকভাবে কি করে ঘটলো। এরা সব সময় গুনগুন করছে নিজেদের মধ্যে। এরা উচ্চাভিলাষী। এরা যে কতো গুনবান, কতো কর্তব্যপরায়ণ, অষ্টপহর চলেছে তার সপক্ষে হাজারো গুঞ্জন। কিন্তু একজন ভালো প্রুফ-রীডারের উচ্চাকাঙ্খা থাকতে নেই। একজন প্রুফ-রীডার হচ্ছে ছোটখাটো একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো, যে এই পৃথিবীতে থেকেও আবার নেই। সে কেবল ওই রোববারের জন্যে। কেননা ওই দিনই তার ছুটি। রোববারেই সে অবস্থান করে তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে। এই দিনই সে শ্রবণ করে ব্যক্তিগত যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার খবর। এবং পরবর্তী সাত দিনের জন্যে এটাই হয় তার খোরাক।

একজন প্রুফ-রীডারের প্রতি চাকুরিচ্যুতির হুমকি খুবই মারাত্মক দুপুরের টিফিন খাওয়ার সময় যখন আমরা ক'জন একত্রিত হই—তখন প্রায়শই এ-প্রসঙ্গটি আমাদের মধ্যে এক হিম শীতল আতঙ্কের সঞ্চার করে। 'চাকরি চলে গেলে কি করবো!' এ-প্রশ্নটি আমাদের সবাইকে যেন কুরে কুরে খায়। মানুষ শুকেও ভালোবাসতে বাধ্য হয়, যদি এ জিনিষ তার জীবিকা-অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। আমাদের ব্যাপারটাও যেন তাই। ঘটনা যাই ঘটুক—বানানটা যেন ঠিক থাকে। সব খবরেরই একই বানান-রীতি। তা সে গাউনের সর্বশেষ ফ্যাশন সম্পর্কেই

হোক ; কিংবা হোক যুদ্ধ জাহাজ, প্লেগ, পারমাণবিক আবিস্কার, ব্যাংক, ট্রেন-দুর্ঘটনা, গরুর বেচাকেনা, কিংবা ফাঁসি-বিষয়ক। প্রুফ-রীডারের চোখকে কোনো কিছুই ফাঁকি দিতে পারে না। অথচ মজাটা এই যে, কোনো মালিন্যই তাকে স্পর্শ করতে অক্ষম। ভারতীয় জ্যোতিষী আগা মীরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন মাদাম শিয়ার (পূর্বতন মিস এস্তেভে)। লিখছেন: 'আপনার কাজে আমি খুবই খুশি। গত ৬ই জুন আমার বিয়ে হয়েছে। আপনার ক্ষমতার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করি আপনার এ-ক্ষমতা চিরস্থায়ী হবে। এতদ্‌সঙ্গে আপনার নামে···টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রেরণ করা হলো। আগামীর ভাগ্য গণনা করেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপনার যে-কোনো অশুভ অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে। এভিন্যু ম্যাকমেহন, প্যারিস, এই ঠিকানায় টেলিফোন করুন অথবা লিখুন।'

একই সংখ্যায়···'পৃথিবীর পরিসর এতোই বেড়ে যাচ্ছে যে, এটি ফেটেও যেতে পারে!' তার ঠিক নিচেই শিরঃপীড়ায় কাতর এক ভদ্রলোকের ছবি।···দু'ধরনের মুক্তোর বিবরণ, উভয় প্রকার মুক্তোই জন্মে ঝিনুকের মধ্যে। একটা 'বন্য'-মুক্তো, অন্যটি 'সংস্কৃত'-মুক্তো! ভাবুন একবার—'সংস্কৃত'মুক্তো! একই দিনে ত্রেইয়ার ক্যাথিড্রালে জার্মানরা প্রদর্শন করছে যীশু খৃষ্টের কোট। বেয়াল্লিশ বছর পর এই দুর্লভ গাত্রাবরণ পুনরায় সর্বসমক্ষে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে। প্যান্ট এবং গেঞ্জি সম্পর্কে

অবশ্য কোনো কথা বলা হয়নি। ওই সংখ্যাতেই, একজন পুরুষ মানুষ 'প্রসব' করেছেন এক জোড়া ইঁদুর—বিশ্বাস করুন, চাই না করুন। হাইড পার্কে দু'পা আড়াআড়িভাবে রেখে বিশ্রাম করছেন এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী। ছবির ক্যাপশনে এক প্রখ্যাত আঁকিয়ের মন্তব্য: তাঁর স্বামী যদি প্রেসিডেন্ট না-ও হতে পারেন, তবুও রূপ আর ব্যক্তিত্বের কারণে মিসেস কুলিজ বারোজন খ্যাতিমান আমেরিকানের একজন হতে পারেন। আর ভিয়েনাবাসী মিষ্টার হামহ্যাল কি বলেন? তিনি বলছেন, 'আমি বলতে চাই, কেবল নিখুঁতভাবে কাটা আর সেলাই করাই পোশাকের উৎকর্ষ প্রমাণ করে না। স্যুটটা আপনার শরীরে মানানসই হলো কিনা—সেইটাই বড়ো কথা।' আর খনি-দুর্ঘটনার খবর একটা আছে তো। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'বৃটিশ কয়লা-খনিতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন রাজা এবং রাণী টেলিগ্রাম মারফৎ শোক-বার্তা পাঠিয়েছেন। অতঃপর তাঁরা রেসের মাঠে গুরুত্বপূর্ণ ডার্বি-প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হন।' রিপোর্টার পাঠক-পাঠিকাকে শিহরিত করে আরো জানাচ্ছেন, 'হঠাৎ তুমুল বৃষ্টিপাত শুরু হয়। যাতে রাজা এবং রাণী যথেষ্ট কৌতুক বোধ করেন।'

তা নেহাৎ মন্দ নয় এই প্রুফ-রীডারের চাকরিটা। রাত তিনটে নাগাদ তুমি গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতে পারো। ভোর-বেলা বাজারে গিয়ে কিনতে পারো টাটকা বেলজিয়ান ডিম। প্রুফ-রীডারের ঘুম ভাঙে সাধারণত দুপুর বেলায়। কিংবা আরো

পরে। তুমি কোনো সিনেমা-হলের ধারে কাছে আস্তানা গাড়লে খুব সুবিধে। ম্যাটিনি-শো'য়ের ঘণ্টা বাজলেই তোমার ঘুম ভাঙবে। আর ওটাই তোমার অফিসে যাবার সময়। কবর-খানাতেও পহরে পহরে ঘণ্টা বাজে। তাই, গোরস্থানের কাছা-কাছি বাসা নিলেও তোমার চলবে। কিন্তু কথা একটাই। কখনো হতাশ হবে না। যে-কথাটা রোজ রাত্তিরেই আমি কার্ল আর ভ্যান নর্ডেনকে বারেবারে বলি। অবশ্য এ-জায়গায় আশা করবার কিছু নেই, তাই বলে হতাশা হওয়া কেন? যেন আমি এক নতুন ধর্মের অনুসারী হয়েছি। যেন আমি আরাধনা করছি সান্তনা দেবীর। আমি কোনো সময় এই পত্রিকায় সম্পাদক হবো কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবো, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি আছি সরু রাস্তার ওপরে এক আরামদায়ক জায়গায়। প্রুফের তাড়া হাতে নিয়ে আমি শুনি এক বিচিত্র সঙ্গীত। শুনি লাইনো-মেশিনের টুংটাং। শুনি মানুষের কোলাহল। কখনো পায়ের ওপর আঁচড় লাগিয়ে দৌড়ে পালায় ইঁদুরেরা। দেয়াল বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে যায় আরশোলারা। চোখের সামনে ঘটনার মিছিল। মিছিলটা যেন ক্রমশ এগিয়ে যায় কবর-খানার গেটের দিকে। ভ্যান নর্ডেনের টেবিলটা খয়েরী ছিটোয় ভর্তি। নস্যির দাগ। এগারোটা নাগাদ আসবে বাদামওয়ালাটা। একটা আধ-পাগলা আমেরিকান—নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে যে আশাবাদী।

এর মধ্যে একটা ক্যাব্‌ল-গ্রাম পেলাম মোনার। সে লিখেছে, পরের জাহাজেই সে আসবে। চিঠির তারিখ লক্ষ্য রাখতে বলেছে আবার। এ-রকম বলে সব চিঠিতেই। অন্ততঃ ন'মাস যাবৎ একই কথা সে লিখছে। কিন্তু জাহাজের যাত্রী-তালিকায় তার নাম কই? এরপর থেকে আমি তার আসবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। আর দৈবাৎ সে যদি এসেই পড়ে, সোজা এখানে এসে আমাকে পাবে। নিচতলায়, পায়খানার গাঁ ঘেষেই আমাদের রুম। আমি নিশ্চিত, সে বলবে, জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর। ইউরোপের যে-জিনিসটা দেখে যে-কোনো আমেরিকান-মহিলা সর্বাগ্রে হতাশ হবেন, তা হলো এখানকার টয়লেটগুলো। হাল ফ্যাশানের পায়খানা নেই—অথচ স্বর্গ; এ-কথা তাদের কিছুতেই বিশ্বাস করানো যাবে না। বিছানায় একটা ছারপোকা আবিস্কার করতে পারলে একজন মার্কিন মহিলা তক্ষুনি চেম্বার অব কমার্সে চিঠি লিখবেন। কি করে আমি মোনাকে বোঝাবো যে, এখানে আমি ভালোই আছি? সে বলবে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে। সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী বলবে--তা হুবহু আমি বলে দিতে পারি। সে এসে একটা স্টুডিও খুঁজবে বাগানসমেত—আর এ্যাটাচ্‌ড-বাথরুম তো অবশ্যই। এবং বাথটাবও সেখানে থাকতেই হবে। সে গরিবীয়ানা চায়—কিন্তু তা হচ্ছে রোমান্টিক দারিদ্র্য। আমি তাকে চিনি। আমি তাকে মোকাবেলা করবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই আছি।

মসিয়েঁ পলের রেস্তোরাঁ। আমরা খবরের কাগজের লোকেরা সেখানে বাকিতে খাই। আমাদের জন্যে বিস্ত্রোর পেছনে আলাদা একটা রুমই আছে। করাতের গুঁড়ো আর মাছিতে রুমটা ভর্তি। আমরা যে পেছনের রুমে খাই বা বসি, তার কারণ আছে। ওই রুমেই এসে খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য কাজকর্ম করে মসিয়েঁ পলের আরো কিছু খদ্দের—বেশ কয়েক-জন বেশ্যা। যা তাঁর রেস্তোরাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ। আমি এখন ভাবছি, সেই সোনালী চুলের ছোকরাটির কথা, যে সাইকেলে তারবার্তা বিলি করে বেড়ায়। সে সব সময় খেতে আসে দেরীতে। বিস্ত্রোর পেছনকার এই ঘরে এসেই সে সবাইকে সেলাম করতে থাকে হাসিমুখে। মুখ-হাত ধুয়ে, সে সেরে নেয় এক ত্বরিৎ-তল্লাশ। কী রান্না হলো, তা খেতে কী রকম হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাংসের টুকরো অবলী-লায় সে তুলে নেয় বাটি থেকে। চেখে দ্যাখে সুপ। সে যেন একটা সুদর্শন ব্লাড-হাউণ্ড। সব সময় নাক তুলে শুঁকে বেড়াচ্ছে মাটি আর হাওয়া। প্রাথমিক কাজগুলো শেষ হলে সে শিস দিয়ে এবং নিজের নাকের ওপর একটা ঘুষি লাগিয়ে সোজা চলে আসে তার প্রেমিকার কাছে। এসেই তাকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে থাকে। আর মেয়েটিও তাকে একইভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চুমু খায়। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়, সে এইমাত্র বেড়িয়ে এলো টার্কিশ বাথ সেরে। এ-রকম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও অনাবিল প্রেম দেখতেও ভালো

লাগে। অবিশ্বাস্যও মনে হয়। খাওয়া দাওয়ার পর, সোনালী চুলের ছোকরাটা তাকে সাইকেলে বসিয়ে নামিয়ে দেয় কোথায় যেন। যতোক্ষন সে খেতে থাকে, ততোক্ষন তার মুখে লেপ্টে থাকে হাসি। তার হাবভাবে মনে হয়, দুনিয়ার কাউকেই সে পরোয়া করে না। সবশেষে সে আদর করে যে-মস্ত চড়টা ওই ছোঁড়াকে হাঁকায়—তাতে একজন প্রুফ-রীডার অতি অবশ্য কুপোকাৎ হতে বাধ্য।

ওদের ওই লীলা-লাস্য, ওই গভীর সমঝোতা এবং সর্বোপরি অমন অকৃত্রিম উল্লাস দেখে ভ্যান নর্ডেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। ওই অনিন্দ্য, ওই দুর্লভ দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখে ও যেন আর চোখ ফেরাতে পারে না। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ছোকরার ফ্লাইয়ের ভেতর হাত ঢুকিয়ে স্রেফ খেলার ছলে তার নুনুটা ধরে আদর করে এবং বিনিময়ে ছোঁড়াও ওর পুবি খামচে ধরে টিপতে থাকে—তখন একদম ক্ষেপে যায় ভ্যান নর্ডেন। প্রায় একই সময়ে এখানে আসে আরো দুইজন। এদের আচার আচরনে মনে হয়, এরা বিবাহিত, স্বামী-স্ত্রী। দু'জনের মধ্যে খুনসুটি কিন্তু লেগেই আছে। মেয়েটির নাম লুইজিয়েনে। একমাথা প্ল্যাটিনাম-ব্লণ্ড চুল। রাগী চেহারা। উত্তেজিত হলে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। তবে তার ঠাণ্ডা নীলাভ চোখ দু'টি বড়ো সুন্দর। তার ব্যাগটা সব সময় ভর্তি থাকে টাকায়। কোনো সময় লুইজিয়েনে যদি এখানে আসতে দেরী করে, তাহলে তার সঙ্গিটি

ক্ষেপে যায়। রাগের চোটে সে অনবরত এটা-ওটার ফরমাশ দিতে থাকে। তা, পঞ্চাশ ফ্রাঁ বিল তো ওঠেই। মেয়েটি তবু আর এক প্রস্থ অর্ডার দিয়ে, যুবকটিকে লক্ষ্য করে বলে, 'তোমার আবার ক্ষিধে পায়নি? হুঁ, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, নাকি ফবুর্গ মমার্তে ফুর্তি করেছো কারো সঙ্গে—যখন তোমার জন্যে আমি দাসীবিরিত্তি করছিলাম? বলো, সত্যি করে বলো, আসলে তুমি কোথায় ছিলে?'

যুবক চুপচাপ ঘাড় নিচু করে ন্যাপকিনে নখ খুটতে লাগলো। অর্থাৎ লুইজিয়েনে বুঝতে পারলো, তার অনুমান মিথ্যে নয়। আর যায় কোথা? সে গর্জে উঠলো: বলো, কোথায় ছিলে? ছেলেটি তখন মিনমিন করে বললো, 'এখানে ছিলাম।'

: মিথ্যুক!—মেয়েটি চেঁচিয়ে বললো—ওহ, তবুও রক্ষা যে আমিও একটা মিথ্যুক। একটা চমৎকার মিথ্যেবাদী। তোমার ছোট ছোট মিথ্যে কথায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তুমি এতো মিথ্যে কথা কেন বলো? আর কখনো যেন এরকম না হয়। তুমি একটা পুরুষত্বহীন মানুষ। বসো। খেয়ে নিই। তোমাকে ভালো মতোই টাইট দেবো আমি। আমিও মিথ্যুক; তবে তোমার মতো পুরুষত্বহীন নই, বুঝলে?

সামান্যক্ষন পরেই দৃশ্য-বদল। দেখা যাবে, তারা পাশাপাশি বসে আছে এক জোড়া ঘুঘুর মতো। দু'জনের দু'টি হাত দু'জনের হাতে! মেয়েটি মৃদু গলায় বলছে, 'ওগো আমার ক্ষুদে খরগোশ, তোমাকে এখন কি করে ফেলে যাই বলোতো? এসো,

আমাকে চুমু খাও। বিকেলে কি করবে আজ? সত্যি করে বলো তো লক্ষ্মীটি। তোমাকে অমন বকাঝকা করে আমার যা বিচ্ছিরি লাগছে?'

মেয়েটি যখন ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে—তখন ছোকরার চোখ দু'টি বাঁকাভাবে পড়েছে পাশের বেঞ্চের ওপর রাখা মেয়েটার হাত-ব্যাগের ওপর। ব্যাগের মুখটা খোলা। ছোকরার চোখ পড়ে আছে ওইখানেই। যখন কিছু হাতানো যায়—সেই চিন্তা। আর মন পড়ে আছে তার রু দু ফুবর্গ মমার্তের এক জনবিরল রেস্তোরাঁয়।

ছোকরাকে আমি চিনি। নিষ্পাপ চেহারার ক্ষুদে শয়তান। চোখ দু'টি গোলাকার। যেন ভয়ার্ত খরগোশ। আমি আরো জানি, পেতলের নাম-ফলক, রাবারের তৈরী নানা জিনিস আর উজ্জ্বল আলোয় ভরা রু দু ফুবর্গ যেন যৌনতার এক নর্দমার মতোই বয়ে চলেছে অবিরল। রু দু ফুবর্গ আর রু লাফায়েতের দু'টি প্রান্ত এসে যেখানে মিলেছে, সে যেন এক যৌবনের দেশ। সবগুলো বার জীয়ন্ত। ক্যাশিয়াররা ঘন ঘন থাবা মেলে দিচ্ছে শকুনের মতো। ব্যাংকোকে ফ্রাঁসের টাকা মানুষের হাত-বদল হতে হতে এখানে এসে যেন দাবানলের মতো দাউদাউ করে জ্বলছে আর বিস্তৃত হচ্ছে ক্রমশঃ। কিন্তু এর পেছনেই রয়েছে ধোঁয়া।

বাস থেকে নামলাম কাফে দে ল' এভিন্যুতে। যেখানে এক গর্ভবতী মহিলা আমাকে প্রস্তাব দিলো। সে বললো, এক ঘণ্টা

কিংবা দু'ঘণ্টার জন্যে আমি তার বাসায় গিয়ে কাটাতে পারি। এই প্রথম আমি কোনো অন্তঃস্বত্বা মেয়েমানুষের কাছ থেকে এ-ধরণের প্রস্তাব পেলাম। আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম তার কথায়। সে বললো, বাচ্চাটা বিয়োতে পারলেই তাকে সরকারী শিশু সদনের হাওলা করে দিয়ে সে তার কাজে ফিরে যাবে। সে হ্যাট বানায়। আমার মুখভাব দেখেই সে চট করে আমার একটা হাত নিয়ে তার পেটের ওপর ঘষলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম আমি। আমার কামভাব দ্রুত দূরীভূত হলো।

যৌনতার বিচিত্র রূপ আমি প্যারিসের মতো আর কোথাও দেখিনি। এখানে কোনো মহিলা তার সামনের দাঁত অথবা একটা চোখ হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই হাসিরে ফেলে তার সমস্ত কিছু। কিন্তু আমেরিকায় একজন মহিলা আমৃত্যু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে, যদিও পঙ্গু ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায়না। তফাৎটা ধরা পড়ে এখানেই।

আমি মুলত বড়ো বড়ো শহরের কথাই বলছি—সেখানে নরনারীর শেষ জীবন-শক্তিটুকুও শুষে নেয় যন্ত্র। আধুনিক প্রগতির শহীদ! এ যেন অসংখ্য হাড়—যাতে মাংস সংযুক্ত করা কোনো শিল্পীর পক্ষে কঠিন কাজ।

৯

অনেকদিন পর বোরিসের একখানা চিঠি এসে হাজির। মাসের পর মাস ধরে ওর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। চিঠিটাকে বলা যায় একটা অদ্ভুত প্রামাণ্য দলিল, যার পূর্ণ মর্মোদ্ধার আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

'আমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটুক, আমরা যখন যেখানেই থাকি, তুমি একদা আমার অন্তর স্পর্শ করেছিলে। স্পর্শ করেছিলে আমার জীবন।···আবেগের বশে জীবনটাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমি আবার বেঁচে উঠেছি। আমি জীবিত।'

রহস্যময় চিঠিটা এভাবেই শুরু হয়েছে। না কোনো সম্বোধন, না কোনো অভিনন্দন, না তারিখ বা ঠিকানা। রুল টানা এক পৃষ্ঠা খাতার কাগজ ছিঁড়ে, সে তাতে লিখছে: 'কাজেই, তুমি আমাকে পছন্দ করো বা না করো—তুমি আমার অতি অন্তরঙ্গ। তোমার জন্যেই, আমি জানি, আমি মারা গিয়েছিলাম। আমি আবার নিজেকে মরতে দেখছি। এটা সাধারণভাবে মরার চেয়েও বেশি কিছু। হয়তো এ-কারণেই আমি তোমাকে দেখার

জন্যে এতো ভীত। ঘটনা আজকাল এতো দ্রুত ঘটছে!'

আমি পড়লাম। বারবার পড়লাম। এক লাইন এক লাইন করে। কী এমন ঘটনা ঘটছে অতো দ্রুত? আমি যার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। খবরের কাগজের প্রথম পাতার দুর্বিপাক ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাইনি। ছ'মাস ধরে সে একটা ছোট্ট কোঠায় বসবাস করছিলো। হয়তো তার সঙ্গে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ছিলো ক্রনস্ত্রাদের সঙ্গে। সে বলছে, বাহিনী পিছিয়ে আসছে, সেক্টর পরিত্যক্ত হয়েছে। সে একটা ট্রেঞ্চে বসে রিপোর্ট লিখছে হেড কোয়ার্টার্সে। এ-চিঠি লেখার সময় হয়তো তার পরণে ছিলো সেই ফ্রক-কোটখানা। আর অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে এলে ভাড়াটের সামনে সে মিনিট কয়েক হাত কচলিয়েছে।—'যেজন্যে আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে বলেছি'···সে আবার শুরু করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হেসে উঠলাম।···আমি তার এ-সব আবোল তাবোলের একটা শব্দও বুঝতে পারিনি। তার পায়ের কাছেই ছিলো বইয়ের ব্যাগ। যেখানে রাখা ছিলো প্ল্যাটো আর স্পিনোজার বই। সে বুঝতে পারতো না, ও-সব বই আমার কাজে লাগে না কেন। বোরিসের একটা নিজস্ব ভাষা ছিলো। যখন আমি তার কাছে ছিলাম—আমার তাই-ই মনে হতো। কিন্তু আবার যখন ক্রনসত্রাদের সঙ্গে আলাপ করতাম, মনে হতো, বোরিস তার ভাষা চুরি করেছে। চুরি করেছে তার চমকপ্রদ আইডিয়াগুলো। তারা কথা বলতো, যেন উচ্চতর গণিত

নিয়ে বলাবলি করছে। ওরা দু'জন। বিমূর্ত, ভৌতিক আলাপ। তবে যখন মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা হতো, তখন তাতে থাকতো কিছুটা সারবত্তা। যেমন মাংস কাটবার কুড়োলে থাকে একটা হাতল। মৃত্যু সম্পর্কে জীবনে সেবারই আমি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যখন তখন তারা আমার বেঁচে থাকা নিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করতো। কিন্তু এমনভাবে তা করতো যে আমি বিব্রত বোধ না করে পারতাম না। তারা আমাকে এ-রকম একটা ধারনা দিতো যে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবন যাপন করে চলেছি। সে আমার দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকালো, যাতে মনে হতে পারে, রাস্তায় চলাচলরত লক্ষ লক্ষ মানুষ স্রেফ মরা গরু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু চিঠিটা··· আমি চিঠিটার কথা ভুলে যাচ্ছি।···

'তোমাকে আত্মহত্যা করতে বলেছিলাম, কেননা আমি খুবই ঘনিষ্ট ছিলাম তোমার। এবং আমি এই ভেবে খুব ভয় পাচ্ছিলাম যে, কোনো না কোনো দিন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার কোলেই মারা যাবে।'

হয়তো আপনারা তার এই ধারনার মর্মোদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হয়, আমি নিজেই ছিলাম তার আইডিয়া। কিন্তু অনাহারী আইডিয়া বললেই যথাযথ বলা হবে। যে জীবন-ধারণ করছে খাদ্য ছাড়া। খাদ্য-সমস্যাকে বোরিস তেমন পাত্তা দেয়নি কোনোদিন। সে আমাকে আইডিয়া দিয়েই প্লাবিত করতে চেয়েছিলো।

যদিও বাড়িটা ভাড়া দেবার সময় টয়লেটের ওয়াশার পাল্টাতে তার ভুল হয়নি। যাই হোক, সে আমাকে তার নিজের কাছে মরতে দিতে চায়নি।—'সবশেষে তুমি অবশ্যই হবে আমার জন্যে জীবন।' সে লিখেছে, 'তুমি ভালোভাবে বেঁচে থাকো—আমি মৃত। তোমার কথা অন্যের কাছে বলবার সময় আমি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ি। এই, সামান্য একটু লজ্জা। একজন সম্পর্কে এতোটা অন্তরঙ্গ ভাবে বলা কঠিন বৈকি!' আপনাদের হয়তো মনে হবে, সে আমাকে দেখবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। অথবা এখন আমি কি করছি, তা সে জানতে চায়। কিন্তু না। সারা চিঠিতে বাঁচা মরার সেই রহস্যময় ভাষা ছাড়া ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, কিংবা সারবস্তু বলতে কিছু নেই। সেই ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে লেখা চিরকুট। যখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, দুনিয়ার যতো পাগল-ছাগলকেই আমি আকৃষ্ট করে আসছি বরাবর। আর আকৃষ্ট করেছি ঈহুদীদের। বোধহয় কালো তেতো রুটির মতো, স্বাস্থ্যবান ভদ্রজনকেও ইহুদীরা পছন্দ করে। যেমন মলডর্ফ। বোরিস আর কন্‌সত্রাদের মতে, যে নিজেকে রূপান্তরিত করেছে ঈশ্বরে। মলডর্ফ প্রত্যক্ষভাবে ঘেন্না করে আমাকে। কথায় কথায় ছোবল। যদিও আমার কাছ থেকে দুরেও সে থাকতে চায়না। যখন তখন আমাকে অপমান করে তার বিমল আনন্দ। কিন্তু আমি অট্টহাসি হেসে তার সমস্ত খোঁচাকে নিস্তেজ করে দিই। এভাবেই চলছিলো। কিন্তু যখনই সে

আবিষ্কার করে বসলো, তানিয়াকে রক্ষা করা তার দায়িত্ব; গোল মালটা শুরু হলো তখন থেকেই। মলডর্ফ আমার মনটাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলো মূলে ক্লদের দিকে। স্বীকার করতেই হবে, মেয়েটাকে আমার ভালো ও লাগে। ক্লদের সঙ্গে রাত কাটানোর জন্যে মলডর্ফ প্রায়শ আমাকে টাকা দিতো।

আমি তানিয়ার কথা বলছি এজন্যে, সে সদ্য ঘুরে এলো রশিয়া থেকে। সিলভেস্টার ঢুকে পড়েছে চাকরিতে। সাহিত্য সে একদম ছেড়ে দিয়েছে। তানিয়া চাইছে আমাকে নিয়ে ক্রিমিয়া গিয়ে একটা নতুন জীবন শুরু করতে। কার্লের ওখানে বসে মদ খেতে খেতে এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো সেদিন। আমি বললাম, ওখানে গিয়ে আমি করবোটা কি? এই প্রুফ দেখা ছাড়া? তানিয়া বললো, 'এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' আমি সৎ আর নিষ্ঠাবান হলে নাকি ওরাই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিবে। আমি চাই, আমাকে সব সময় দেখতে লাগুক স্প্রতিভ, স্বচ্ছন্দ। মুশকিল হয়েছে এই আমাকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায়। কিন্তু গোমড়া মুখ দেখতে চায় না রাশিয়া। তারা চায় হাসি খুশি প্রানবন্ত মানুষ। ব্যাপারটা আমার কাছে আমেরিকার মতো মনে হয়। রাশিয়ার ঐসব যন্তর-মন্তর আমার আদপেই পছন্দ হয় না। আমার মনোভাবের কথা জেনে তানিয়া এমন ক্ষেপে গেলো যে, আমরা প্রায় ছ'বোতল ভিঁ অর্দিনিয়েরি খতম করে ফেললাম। কার্ল

লাফাচ্ছিলো একটা আরশোলার মতোই। রাশিয়ার নাম শুনেই যারা আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সে তো তেমনি একটা ইহুদী। বললো, 'তোমাদের কিস্‌সু করতে হবে না। কেবল বিয়ে করতে হবে। রাজী হয়ে যাও, তোমার ভালো হবে।' বলতে বলতে সে দৌড় দেবার ভান করলো। যেন, এভাবেই আমাদের দৌড় দেয়া উচিত রাশিয়ার দিকে। এক্ষুনি। ব্যাস, তানিয়া সেই থেকে পিছু লেগেছে আমার। মুখে রাশিয়ার মন্তর। তার তাগাদায় এক রকম অস্থির হয়ে পড়লাম আমি। খাওয়া দাওয়া সেরেছি। এবার অফিসে যেতে হয়। আমরা বুলেভার এদগার কুইনেতে একটা ট্যাক্সি নিলাম। হুডখোলা গাড়িতে প্যারিসে ঘুরে বেড়ানো বেশ মজাদার। তার ওপর আমাদের পেটের মধ্যে মদ। মজাটা যে দ্বিগুন হয়ে উঠলো, তা বলাই বাহুল্য। কার্ল বসেছে আমাদের উল্টোদিকে। তার মুখ গাজরের মতো লাল। সে খুব খুশি। ফকিরনির বাচ্চা নিশ্চয়ই ভাবছে, ইউরোপের উল্টোপিঠে একটা নতুন জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। আবার তার মনের মধ্যে একটা দ্বিধাও যে আছে, তা-ও আঁচ করতে অসুবিধে হয় না। সে কখনো প্যারিস ছেড়ে যেতে চায়নি। চলমান ট্যাক্সি থেকে ভারাক্রান্ত চোখে চেয়ে চেয়ে সে দেখতে লাগলো শহরের দালান ও স্ট্যাচুগুলো। যেন স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছিলাম আমিও—অবশ্য জেগে জেগে। তানিয়ার স্তনের ওপর আমার

হাত। আমি বোঁটার মধ্যে আঙুল দিয়ে টিপছিলাম। চেয়ে দেখছিলাম ব্রীজের নিচে সীন নদীর পানি, ভাসমান বজরা আর নোতরদেম গির্জের দিকে। ঠিক পিকচার পোস্ট-কার্ডে যেমন থাকে, তেমনি এ-দৃশ্য।

অবশ্য প্রচুর মাল টেনেও সেদিন খুব একটা মাতাল হইনি আমি। বেসামাল হলে অবশ্য আমার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে সুস্থ হবার। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করা। আজকেও প্রয়োজনে সে-অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে বাধা নেই। কেননা মাতাল হয়ে আর যাই করা যাক, প্রুফ দেখা সম্ভব নয়। প্রুফ দেখার সময় হারানো-কমা শনাক্ত করা নীৎশের দর্শন ব্যাখ্যা করার চাইতেও কঠিন। অবশ্য কোনো কোনো সময় মদ খেলে মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়। কিন্তু মেধার সঙ্গে প্রুফ রীডিং ডিপার্টমেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই। দিন, তারিখ, হিশেব, সেমিকোলন এই-সব ব্যাপারগুলো এমন যে, মন এলোমেলো থাকলে তাতে ভুল-ভাল হবার সম্ভাবনা। বেশ কয়েকবার আমার কয়েকটি মারাত্মক ভুল হয়েছে। যদি আমি ওপরওয়ালার পাছায় চুমো খাবার ব্যাপারে অভ্যস্ত না হতাম, তাহলেই হয়েছিলো আর কি! চাকরি চলে যেতো। একবার এমন একজন বড়ে কর্তার চিঠি পেলাম, যাকে আমি কখনো দেখিনি। তিনি বানান নিয়ে নানান রকম মোড়লী করা থেকে আমাকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। এই পত্রাঘাতে, ভয়ে আমার তো কাপড় চোপর নষ্ট হওয়ার উপক্রম। কেননা উপদেশ লংঘনের পরিমাণ আমার

অজানা নয়। এরপর থেকে লিখিতভাবে তো দূরের কথা, বাক্যালাপে সময়ও শব্দ ব্যবহারে সতর্ক হয়ে যাই আমি। ওপরতলায় বসেন আমাদের ওস্তাদ। তাঁর কাছে বানান সম্পর্কে পরামর্শের জন্যে গেলে তিনি দারুন খুশি হন। তাঁকে সংক্ষেপে বলা চলে ডিকশনারী কিংবা টাইম-টেবল। যেন তিনি এই পেশার জন্যেই জন্মেছেন। আমার বিপদ ছিলো এই যে, আমি বেশী জানি। খবরটা কি করে যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। যদিও এটা গোপন রাখার ব্যাপারে আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। আমি সঙ্গে করে কোনো বই নিয়ে এলে ওস্তাদ ঠিকই টের পেয়ে যেতেন। আর সেটি যদি একটা ভালো বই হতো, তাহলে তিনি ক্ষেপে উঠতেন।

জুলাইয়ের খুব সম্ভব চার তারিখে আমার চাকরি চলে গেলো। না, কোনো সতর্ক-বাণী ছিলো না। পুকুরের ওপর থেকে জনৈক ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ্ মনে করলেন, তাদের ব্যয়-সঙ্কোচ করা দরকার। রীজ এলাকায় দখল করা তার বিশাল প্রাসাদের ব্যয় নির্বিঘ্ন রাখার জন্যেই আমরা কয়েকজন বলি হয়ে গেলাম। বেতন পেয়ে ধারকর্জ শুধে, আমার পকেটে সামান্যই রইলো। হোটেল-ওয়ালাকে কিছুই বললাম না। কেননা চুপচাপ সটকে না পড়লে—তিনশো ফ্রাঁর জন্যে চেপে ধরবে নির্ঘাত। 'চাকরি চলে গেলে কেমন করবে?'—বহু উচ্চারিত বাক্যটি যেন ঘুরে ফিরে বাজতে থাকলো আমার কানে—'ক্যা য়ু এস্ত মেইতেনেৎ! কী আবার হবে! আবার নেমে যাবো রাস্তায়। বেড়াবো

যততত্র। বসে থাকবো পার্কের বেঞ্চে। সময় কেটে যাবে। মঁপারনাস এলাকায় আমি বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন আমাকে এ-রকম ভান করতে হবে যে, আমি এখনও ওই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আছি। তাতে আগের মতো ব্রেক-ফাস্ট কিংবা ডিনারের দাওয়াত মাঝে মধ্যে পেতেই থাকবো। এখন গ্রীষ্মকাল। পর্যটকদের মওসুম চলছে। আমি ওদের গাইড-গিরি করে দু'পয়সা পেতে পারি।—'কী করবে? চলবে কেমন করে?'…আরে দূর—না খেয়ে থাকবো নাকি তাই বলে? আরো কমসে কম দু'সপ্তাহ বাকিতে রাতের খাওয়া চালিয়ে যেতে পারবো মসিয়েঁ পলের রেস্তোরাঁয়। ব্যাটা জানাবে কি করে আমার চাকরি নেই?

পয়সার মতো যে কোনো জিনিষের জন্যে আমি কান পেতে থাকি। মেলামেশার ধরনটা পর্যন্ত পাল্টে গেলো আমার। যে সব মানুষ আগে আমাকে বোর করতো তাদের সঙ্গে আড্ডা মারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মঁপারনাসের মতো এলাকায় একজন নিষ্কর্মার পক্ষে বন্ধু জোটানো কষ্টকর নয়। আর কিছু নয়, —তুমি কেবল যদি ধৈর্যের সঙ্গে কারো বকবকানি শুনতে পারো, তবে তারা তোমার সঙ্গে উকুনের মতো লেগে থাকবে।

চাকরি হারাবার পর কার্ল আর ভ্যান নর্ডেন আমাকে খোঁচা-বার নতুন কাঁটা পেয়েছে।—'এ মুহূর্তে তোমার বউ যদি এসে পড়ে, কী করবে?' কী আর করবো। একটি মুখের জায়গায় তখন খাবার তুলে দিতে হবে দু'টি মুখে। এমন দুঃখের দিনে তো

তার সাহচর্যটা অন্ততঃ পাবো। আর তার চেহারা যদি নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে আমরা দ্বিগুন উদ্যমে এগোতে পারবো। সুন্দরী মেয়েদের পৃথিবী কখনো অনাহারে থাকতে দেয় না। তানিয়া আমার জন্যে খুব একটা কিছু করবে বলে মনে হয় না। সে বরং টাকা পাঠায় সিলভেস্টারকে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, তানিয়া ওর ঘরে আমাকে ঠাঁই দেবে। কিন্তু আমার সঙ্গে এভাবে সে আপোষে আসতে অনিচ্ছুক। তাছাড়া কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে তার তখন ভালো থাকারও দরকার।

তোমার বিপদে প্রথম এগিয়ে আসবে ওই ইহুদীরা। আমি এ-মুহূর্তে এ-ধরনের তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি। সত্যি, ওদের সহানুভূতি খুবই গভীর। এদের একজন হচ্ছে এক ফার-ব্যবসায়ী। বয়েস হয়েছে। তার ইচ্ছে, খবরের কাগজে নাম ছাপাবার। সে আমাকে তার নামে নিবন্ধ লিখে দেবার প্রস্তাব দিয়েছে নিউইয়র্কের এক ইহুদী-দৈনিকে। পরিচয় হলো এক প্রখ্যাত গণিতবিদের সঙ্গে—যে এক বর্ণ ইংরেজী জানে না। তার উদ্‌ভট্টি থিয়োরীগুলো আমাকে টুকতে হয়, যার কোনো কোনোটিতে নস্যাৎ করা হয়েছে খোদ আইনস্টাইনকেও। এর জন্যে আমি পাই পঁচিশ ফ্রাঁ। আবার যখন দেখি, আমার নিবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমি তা পড়ি না। কিন্তু ছাপা হবার পর তা দেখতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। বিশেষ করে ফার-ব্যবসায়ীর নামটা।

এ-সময়ে অনেকগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়েছে আমাকে

বিভিন্ন লেখাপত্রে। বুলেভার এদগার কুইনেতে যখন নতুন বেশ্যালয়ের উদ্বোধন হলো, তার প্যাম্ফলেট লেখার কাজটা জুটলো আমারই। অবশ্য এ-জন্যে আমার পারিশ্রমিক জুটলো বেশ অভিনব। আমি পেলাম এক বোতল শ্যাম্পেন আর একবার লাগাবার জন্যে একটা মিশরী মাগি। এক সময় কেপি যা করতো, আমি সেইভাবে দু'বার টাকা পাই। এটা হচ্ছে বেশ্যাদের ঘাটে মক্কেল ভেড়াবার কমিশন। এক-দিন রাতে আমি সেখানে নিয়ে গেলাম ভ্যান নর্ডেনকে। ভ্যান, আমার প্রাক্তন কর্মস্থলে উঁচু পদে কর্মরত। সে চায় তার আয়ের কিছু অংশ যদি কমিশনের মাধ্যমে আমার হাতে এসে পৌঁছে। কিন্তু মাসীটি যখন শুনলো যে ইনি খবরের কাগজের লোক—একটি পয়সাও সে নিলো না। ফলে আরেক বোতল শ্যাম্পেন এবং আরেকটা ফ্রী-ফাক্। এ-থেকে আমার হাতে একটা ফ্রাঁও এলো না। উপরন্তু ভ্যান নর্ডেনের হয়ে আমাকেই লিখতে হলো ফিচারটা। আমাকে লিখে দিতে হলো, কেননা ঘটনাস্থলের ধরন উল্লেখ না করে কীভাবে লেখাটি তৈরী করতে হবে—তা তার জানা নেই। একটার পর একটা এই ধরনের ঘটনা। আমার পাছার ছাল উঠে যাবার যোগাড়।

তবে সবচেয়ে জঘন্য কাজটি আমাকে করতে হলো এক মূক-বধির বিশেষজ্ঞের অধীনে। বস্তুতঃ আমার মগজটা যেন ছেয়ে গেলো দুনিয়ার যতো ব্যাধি আর তাদের বিধি-বিধানে।

দীর্ঘ ছ'সপ্তাহ যাবৎ ধস্তাধস্তি করে লেখাটি দাঁড় করাবার পর শুরু হলো তাতে ঘষামাজা। এমন কি প্রুফ পর্যন্ত দেখতে হলো। লেখাটি ফরাসী ভাষায় তৈরী করতে হয়েছে। আর তা এমন এক ধরনের ফরাসী, যা আমি কখনো পড়িনি বা শুনিনি। কিন্তু এটির দৌলতে রোজ ভোরে যে জাঁকালো ব্রেকফাস্টটি মিলতো তা সত্যি আনন্দদায়ক। কমলার রস, মাখন, কফি, হ্যাম আর ডিমে সে এক জমজমাট আমেরিকান প্রাতরাশ। বলতে গেলে, প্যারিসে বসবাসকালে এমন রাজসিক নাশতা আর কখনো খাইনি আমি। ধন্যবাদ, মূকবধির ছেলেমেয়েরা!

এমনি সময় একদিন, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো এক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে। সে প্যারিসের বিখ্যাত স্থানগুলোর ছবি তুলবে। সে প্রস্তাব দিলো, আমি সেইসব জায়গায় উদোম হয়ে পোজ দিতে রাজী কিনা। অবশ্য অন্যান্য ভঙ্গির ছবিও সে তুলতে চায় আমার! আমার মনে পড়ে গেলো, এখানকার নগ্ন-পোস্টকার্ডে ছাপা রোগাটে লোকগুলোর করুণ চেহারা। যা গুচ্ছে গুচ্ছে সাজানো থাকে এ-শহরের দোকানে দোকানে। সেই রহস্যময় ভৌতিক চেহারার লোকগুলো, যারা বসবাস করে রু দা লুঁ্য-এর ঝাঁপসা পাড়ায়। আমি নিজের চেহারাকে এভাবে বিজ্ঞাপিত করার পক্ষপাতি নই। কিন্তু ফটোগ্রাফার যখন বললো, এগুলো নিতান্তই ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে এবং পাঠানো হবে সুদূর ম্যুনিখে, তখন

আশ্বস্ত হলাম। এবং জানিয়ে দিলাম সম্মতিও। নিজের শহরের বাইরে। বিশেষ করে এ-যখন তোমার রুটি-রুজির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, এ-ধরনের প্রস্তাবে রাজী হতে পারো বৈকি!

পর্যটকদের জন্যে যে-সব জায়গা বেশী আকর্ষণীয়—আমরা সে-সব স্থান সাধারণত এড়িয়ে চলতাম। আমরা যে-সব জায়গাতেই ছবি তুলতে যেতাম, যেগুলো বিখ্যাত না হলেও মৌলিক। যেখানে কাজ শুরু করার আগে একটুখানি তাস পেটানো যাবে। সঙ্গীটি খুবই ভালো মানুষ। এ-শহরের আগাপাশ-তলা তার মুখস্থ। বিশেষ করে দেয়ালগুলো। এমন কি সে গ্যেটে সম্পর্ক আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। বলেছে হোহেনস্টাউফেনের কথা। বিচিত্র লোক। হয়তো দেখলো, একটা ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে সে শুরু করে দেবে দান্তে, লিও-নার্দো দ্য ভিঞ্চি অথবা রেমব্রান্টের কথা। 'ভিলেত্তির কসাই-খানা' থেকে সে আচমকা মারবে একটা লাফ—আমাকে বগল-দাবা করে নিয়ে সোজা চাপবে একটা ক্যাবে। ক্যাব ত্রকা-দেরো যাদুঘরের সামনে পৌঁছাতেই সে আমাকে সোজা তার ভেতরে নিয়ে দেখাবে একটা খুলি কিংবা মমি—যা নাকি তার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়।

আমাদের বিশ্রাম নেবার পছন্দসই জায়গাগুলো হচ্ছে প্লেস ন্যাশিওনালে, প্লেস দে পেউপলিয়ে, প্লেস কঁত্রাসকার্পে আর প্লেস পোল ভেরলেন। বেশ ক'টা জায়গা আমার আগে থেকেই

চেনা। কিন্তু ওর সাহচর্যে এবং অদ্ভুত ব্যাখ্যা-বর্ণনায় এই পরিচিত স্থানগুলোই যেন কেমন অন্যরকম লাগে আমার কাছে। ফটোগ্রাফারের মাধ্যমেই আমি ক্রুগার নামে এক ভাস্কর এবং শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হই। লোকটা সর্বক্ষন অধ্যাত্মিক চিন্তায় ভরপুর হয়েই আছে। 'ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর হের পিপারকর্নের মতো তারও একটি বিশেষ দর্শন রয়েছে। আমি লোকটার কথাবার্তায় এতো বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে তার 'উচ্চ-মার্গে' পৌছতে আমার বোধ হয় খুব দেরী হতো না। অন্ততঃ তার ধারনায়। তার 'আত্মাসূত্র', 'বস্তু শরীর'—উপনিষদ, প্লটিনাস, কৃষ্ণমূর্তি, কর্মযোগ—আমার মাথা চিবিয়ে খাবার উপক্রম করলো যেন। কিন্তু আমাকে সে ক্রমশ এতো অনুগত বলে মনে করতে শুরু করলো যে, দরকার পড়লে পয়সা কড়িও দিতো।

শিল্পী হিসেবে সে ছিলো ব্যর্থ। ভাস্কর হিসেবে ব্যর্থের চেয়েও বেশী। তাকে বলা যায় সৎ-গেরস্থ। এবং আপাদমস্তক কৃপণ। সে কোনো কিছুই ফেলে দিতো না—এমন কি মাংস প্যাঁচানো কাগজও। শুক্রবারে স্টুডিওতে ভীড় জমাতো ওর সাগরেদরা। মদ আর স্যাণ্ডউইচ খাওয়া হতো বেশ হৈ চৈ করে।

ব্যাল বুলিফেরের পেছনে ছিলো মার্ক সুইফটের স্টুডিও। সেখানেও ছিলো আমার নিয়মিত যাতায়াত। সে হয়তো প্রতিভাবানই। তা না হলে উন্মাদ। এই আইরিশ আঁকিয়ের

মডেল ছিলো একটা ইহুদী মেয়ে—যার সঙ্গে সে বসবাস করছে চার বছর যাবৎ। ইদানীং মেয়েটার ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মেছে এবং কীভাবে তার খপ্পর থেকে মুক্তি পাবে সেই চিন্তায় সে বিনিদ্র। অথচ মেয়েটির সঙ্গে যা কিছু মালকড়ি ছিলো, সব সে ফুঁকে দিয়েছে। এখন বেঈমানী করলে মেয়েটার পথে নামা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মেয়েটি ছিলো ভালোই। কিন্তু চটক হারিয়ে ফেলেছে ইদানীং। ছবিও নাকি সে আঁকতো। অনেকে মনে করে, সে আঁকা আইরিশটার চেয়ে ভালো। কিন্তু মেয়েটি এ-কথা শুনলে রীতিমতো ক্ষেপে যায়। বলে, 'ও মানুষ হিসেবে যাচ্ছেতাই; কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পী। স্টুডিওর দেয়ালে মেয়েটির আঁকা কোনো ছবিই টাঙানো নেই। সব ওই আইরিশটার। মেয়েটার সব ছবি স্তূপ করে রাখা হয়েছে রান্নাঘরে। একবার একজন দেখতে চাইলো ওর আঁকা একটা ছবি।—আমি সেখানে হাজির ছিলাম।—ফলাফলটা হলো বেদনাদায়ক। একটা ছবির ওপর পা তুলে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সুইফট বললো, 'এই ফিগারটা দ্যাখো। একটা লোক দরজা খুলে বাইরে বেরুচ্ছে, তাই তো? কিন্তু লোকটা বেরুতে পারবে না কস্মিনকালেও। কেন? না, তার মুণ্ডুটা বসানো হয়েছে ভুলভাবে। ...এবার এই ন্যুডটার দিকে তাকাও: ...এটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু গোল বেঁধেছে যোনি রং করবার সময়। আমি জানিনা, এটা আঁকবার সময় ওর মনে

কি ছিলো। যাই হোক, যোনিটা এতো বড়ো হয়েছে যে, দৈবাৎ যদি ওর ব্রাশখানা ওই গর্তের মধ্যে পড়ে যেতো—তা উদ্ধার করা হতো অসম্ভব।'

ম্যুড কাকে বলে, সুইফট আমাদের নমুনা দেখালো তারও। চমৎকার দৃষ্টিনন্দন এই নগ্নিকা হলো ইহুদী মেয়েটিই। এঁকেছে এই ক্ষ্যাপা আইরিশটা। অপূর্ব ছবি। মনে হয়, অপরাধবোধে আক্রান্ত ওই নগ্ন নারীকে কী-হোলের ভেতর দিয়ে চুপে চুপে দেখে, তার অজান্তে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে। দরজা জানালাহীন ঘরের মধ্যে একখানা সোফার ওপর বসে আছে মেয়েটি। মনে হয় পাছা চুলকোচ্ছে আলতোভাবে। তার পেছনে পাক খেয়ে খেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে একটা ঘোরানো-সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপরে বিছানো রয়েছে এমন বিচিত্র সবুজ রঙের কার্পেট, যে-রকম সবুজ পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মুখখানা কাঁচা লাবণ্যে ভরপুর। যেন কোনো কুমারীর মুখ। সদ্য-নিক্ষিপ্ত বফের মতো টাটকা, টলটলে।...

বেচারা আর্টিস্ট। বেচারা সুইফট। যে কোনো কিছুই ভাবে না; কেবল আঁকে আর আঁকে। ফিলমোরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় ওর মাধ্যমেই। কূটনৈতিক-বিভাগের এই তরুণ চাকুরে কবে যেন এসে জুটে গেছে ক্রুগার আর সুইফটের এই আখড়ায়। সুইফট আমাকে বললো, 'তুমি এ-দুর্দিনে ওর সাহায্য নিতে পারো। টাকা কী ভাবে খরচ করতে হয়, ও তা জানে না।'

পকেটে অঢেল অর্থ। হাতে প্রচুর সময়। ওদিকে প্যারিসের কার্যকাল কবে ফুরিয়ে যায় তার কোনো ঠিক নেই। ফিলমোর তাই চায় প্যারিসের মজা লুটে নিতে। এ-অবস্থায় আমার মতো একটা বেকার তার সঙ্গী হিসেবে তো মানানসই হবেই। আর হলোও তাই। ও আমাকে লুফে নিলো।

সবাই বলতো, 'ছোকরাটা বাচাল!' কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু যাকে সঙ্গদান আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির সঙ্গে সরাসরি জড়িত তার বাক্য-স্রোতের মোকাবেলা না করে উপায় কি? ও যদি এর চেয়েও খারাপ হতো, আবার পিছু হটবার যো থাকতো না। আর নিজের কথা বলতে বলতে সে যখন তার প্রিয় লেখক আনাতোল ফ্রাঁস কিংবা যোসেফ কনরাডের প্রসঙ্গে পৌঁছতো—তখন আমার নেহাৎ খারাপ লাগতো না। বিশেষ করে সে নাচতে ভালোবাসতো; পছন্দ করতো ভালো মন্দ আর সুন্দরী মেয়ে মানুষ। পছন্দ করতো বায়রন এবং ভিক্টর হুগো-কেও! কিন্তু এ-জন্যে তাকে ক্ষমা করা চলে। কলেজ থেকে অল্প ক'বছর হলো বেরিয়েছে তো! আমি পছন্দ করেছিলাম ওর রোমাঞ্চ-প্রিয়তা।

ক্রুগারের আড্ডাতেই পরিচয় হলো কলিনসের সঙ্গে। সেও ফিলমোরের মতোই আমেরিকান। তবে নাবিক। আমরা তিন সাঙ্গাত প্রায়শ মিলিত হতাম রোতোদেঁর রাস্তায়। আমরা প্রচুর খেতাম—পান করতাম। বস্তুতঃ কলিনস যদ্দিন প্যারিসে ছিলো, আমি দিন কাটিয়েছি একটা ডিউকের মতো। যে-সব

সুখাদ্য আমার পেটে গেছে তখন, তার কথা জীবনে কল্পনা পর্যন্ত করতে পারিনি। এমন ঠাঁট আমার তখন, যে, স্বপ্নাতীত। বাদেন বাদেন, ভিসি, এমন কি আইলে বোঁয়াতে যাতায়াত করছি যখন তখন। ইতিমধ্যে আমার ঠাঁই হয়েছে ক্রুগারের স্টুডিওতে। মুশকিলটা ছিলো এই যে, দুপুরের আগে কোনো-দিন আমার ঘুম ভাঙতো না। কোনো কোনো দিন তিনটে ও বেজে যেতো।

একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি। অসুস্থ হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়—অনবরত সুখাদ্য গলধঃকরণের ফল। কুত্তার পেটে ঘি ভাত সইবে কেন? অসুখ এমন গুরুতর আকার ধারণ করলো যে, আমি বিছানা থেকেই উঠতে পারি না। শরীরে এক ফোঁটা বল পাই না। নিজের অবস্থা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। মনের সমস্ত সাহস যেন কর্পূরের মতো উড়ে যাবে আমার। আমার সেবা ও চিকিৎসা করছে ক্রুগারই। তার অবস্থা হয়েছে বোধ হয় আমার চেয়েও করুণ। কেননা শিগ-গীরই তার স্টুডিওত আছে একটা প্রদর্শনী। যেখানে ছবি দেখতে আসবেন বেশ ধনাঢ্য কয়েকজন সমঝদার—যাঁদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন পাবে ক্রুগার। অথচ আমার বিছানাটা তার স্টুডিওর ঠিক মধ্যিখানে। কেননা, এখানে আমাকে শোয়াবার মতো অন্য কোনো রুম নেই।

একজিবিশনের দিন সকালবেলায় ক্রুগারের মুখের দিকে যেন আর তাকানো যায় না। বেচারা মুষড়ে পড়েছে। যদি

আমার উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকতো, তবে সে নির্ঘাত আমার পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত করে এখান থেকে বের করে দিতো। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম, কিন্তু নড়বার ক্ষমতা নেই। সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে নেবার চেষ্টা করলো। উদ্দেশ্য, ওপরের রান্নাঘরে নিয়ে তালাবন্ধ করে রাখবে। আমি বুঝতে পারলাম, আমার জন্যে বেচারার ভরাডুবি হতে চলেছে। এখন যদি অতিথিরা পদার্পন করতে শুরু করেন, তাঁরা ছবি বা মূর্তি কিভাবে দেখবেন, যেখানে একজন মানুষ মরতে বসেছে। হঠাৎ ক্রুগারের মনে হলো, আমি মারা যাবোই। আমারও তাই ই ধারণা হলো। ফলে অনুশোচনার পরিবর্তে আমার মনে জেদ জাগলো যে, আমি এখানেই মরবো। সে হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে চাইলেও আমি গোঁ ধরলাম, আমেরিকান হাসপাতালের বেডে নয়—আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো এই স্টুডিওর ভেতরেই। মরতেই যখন বসেছি—তখন এর চেয়ে ভালো জায়গায় গিয়ে মরে লাভটা কি? কাজেই, আমারও আর এই শয্যাটি ছেড়ে উঠবার দরকার নেই!

আমার কথা শুনে ক্রুগারের তো পাগল হয়ে যাবার অবস্থা। এক্ষুণি স্টুডিওতে আসতে শুরু করবেন অভ্যাগতরা। চিত্রশালায় অসুস্থ মানুষ দেখে তাদের কী অবস্থা হবে! হয়তো বা একটা মরা মানুষই তারা দেখবেন এখানে এসে। ক্রুগারের আখের ঝরঝরে হবার চমৎকার পটভূমি। কিন্তু আমার মুখেও

এক রা। হাসপাতালে পাঠানো চলবে না আমাকে। এমন কি ডাক্তার ডাকাও চলবে না আমার জন্যে। মোট কথা আমার জন্যে কিছুই করতে হবে না। আমি তার সব প্রস্তাবই প্রত্যাখান করলাম।

সে ক্ষেপে গেলো এবার। জোর করে কাপড় পরাতে লাগলো। দুর্বল শরীরে তেমন একটা বাধা দিতেও পারছিলাম না আমি। কেবল—'শালা, শালা শুয়োরের বাচ্চা'—এই রকমের একটা চিঁ চিঁ আওয়াজ প্রতিবাদস্বরূপ উচ্চারিত হচ্ছিলো আমার মুখ থেকে। বাইরে চমৎকার উজ্জ্বল উষ্ণ দিন। অথচ আমি কাঁপছি একটা কুকুরের মতো। কাপড় পরিয়ে সে আমার ওপর এক রকম ছুঁড়ে দিলো একটা ওভারকোট। তারপর টেলিফোন করার জন্যে বাইরে গেলো। 'আমি যাবো না, আমি যাবো না।' আমার ক্ষীণ প্রতিবাদের মুখেও সে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে বাইরে ছুটে গেলো। ফিরে এলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে স্টুডিওর ভেতরে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সব কিছু গোছগাছ করতে লাগলো। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কিছুক্ষনের মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ফিলমোর এসেছে। কলিন্‌সও অপেক্ষা করছে নিচে।—ক্রুগার খবর দিলো আমাকে।

ফিলমোর আর ক্রুগার আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো। এলিভেটরে দাঁড়িয়ে ক্রুগার বললো, 'এ তোমার ভালোর জন্যেই।' বললো, 'আর আমার কথাটাও ভাবো

একবার। তুমি তো জানোই, গত ক'টা বছর ধরে কী রকম স্ট্রাগল করছি আমি।' কথা বলতে বলতে তার চোখে প্রায় পানি এসে যাওয়ার যোগাড়। ওর কথা শুনে এতো কষ্টের মধ্যেও আমি না হেসে পারলাম না। আমার চেয়ে বয়েস তার অনেক বেশী। শিল্পী হিসেবেও বাজে। অথচ সে-ও একটা ব্রেক চায়। জীবনে অন্ততঃ একবারের জন্যে একটা সুযোগ।

: আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছিনা —আমি বললাম—আমি সব বুঝি!

: তুমি জানো, আমি তোমাকে সব সময় পছন্দ করি'—জবাবে সে বললো—সুস্থ হলেই আবার এখানে চলে এসো।...থেকো তোমার যাতাদিন ইচ্ছে।

: নিশ্চয়ই, আমি তা জানি। ...তবে আমি আর গোঙাবো না!—বলতে বলতে বাইরে বেরুলাম আমি। যেই না কি নিচে আমি কলিনসকে দেখেছি বেশ জোর পেলাম যেন দেহমনে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সদানন্দ, সত্যিকার প্রাণবন্ত মানুষ এই কলিন্‌স। সে আমাকে পুতুলের মতো তুলে নিয়ে ক্যাবের সীটে বসিয়ে দিলো। —তবে অত্যন্ত নরম হাতে—ক্রুগারের মতো শক্ত হাতে নয়।

কলিনসের হোটেলের লবিতে আমি সোফায় বসে আছি। আর হোটেলের মালিককে পরিস্থিতি ব্যাখা করছে সে। বলছেঃ তেমন কিছু নয়। অসুখটা খুব সামান্য। দু'চার দিনের মধ্যেই

ঠিক হয়ে যাবে।' কথা বলতে বলতে সে কিছু টাকা গুঁজে দিলো লোকটার হাতে। তারপর আমার কাছে এসে বললো, 'ওঠো ওঠো; ও যেন কিছুতেই তোমার গোঙানি শুনতে না পায়।' কলিনসের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে আমি এগিয়ে গেলাম এলিভেটরের দিকে।

: ও যেন তোমার গোঙানি শুনতে না পায়! কথাটা কানে বাজছে। ঠিকই···সর্বসাধারণ্যে মরাটা যেন কী রকম। একটা লোক মরবে নিতান্তই ব্যক্তিগতভাবে—তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে। তার কথাগুলো প্রেরণাদায়ক নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার কাছে বাজে রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। ওপর-তলায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে ওরা আমাকে উলঙ্গ করলো এবং চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিলো।—'ব্যাস এখন তুমি মরতে পারো!' খুশি খুশি গলায় বললো কলিনস। বললো, 'আমাকে গর্তে ফেলে দিয়েছো হে!···তা ব্যাপার কি? সুখ সইছে না বুঝি? যীশু জানে, তোমার আবার সিফিলিস-টিফিলিস হয়েছে কিনা। যে জন্যে তুমি এমন বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছো!'

কলিনস আমাকে শোনাতে লাগলো ইয়াংসী নদীর কথা। সে আমাকে রোগ-যাতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে গল্প বললো। কী চমৎকার বলতে পারে সে। আমি যেন ঠিক শুনছিলাম না—বরং দেখছিলাম সেই দৃশ্য। নদীটার নোংরা

হলুদ মুখ আমার চোখের ওপর ভাসছে। দূরে দেখা যায় হ্যাংকাও শহরের আলো। হলুদ মুখের জন-সমুদ্র। ড্রাগনের নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে চলাচল করছে শাম্পানগুলো। কী দুর্দান্ত গল্প। কুলিরা জাহাজের চার পাশ ঘিরে হৈ-হল্লা করছে। জাহাজের ডেক থেকে ফেলে দেয়া আবর্জনা নিয়ে তাদের কী কাড়াকাড়ি! টম স্লাটারি তার মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে বসে দূরের আলোকোজ্জ্বল হ্যাংকাও নগরীর দিকে তাকিয়ে আছে। কতো চমৎকার মানুষ ছিলো এই ইউরেশীয়টা!···চীন যেন নিয়তির মতোই ঝুলে আছে আমাদের মাথার ওপর। চীন পচছে। আস্তে আস্তে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে যেন বিশাল ডাইনোসর। ঐশ্বর্যবান, ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, রহস্যময় কিংবদন্তীর দেশ!

কয়েক সপ্তাহ পরে কলিনসের দাওয়াত পেলাম আমরা। সে হার্ভেতে এসে পৌঁছেছে। ফিলমোর আর আমি ঠিক করলাম, রোববার ছুটির দিনটা আমরা কলিনসের সঙ্গেই গিয়ে কাটাবো। প্যারিসের বাইরে এই আমার প্রথম যাওয়া। কলিনস আমাদের একটা বারের ঠিকানা দিয়েছে, যেখানে সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। জিমির বার। যা লে-হার্ভের সবার কাছেই সুপরিচিত। আমরা দু'জন ট্রেনে চেপে বসলাম। চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গা লে-হার্ভে। বেশ খোলামেলা। চত্বরগুলো প্রশস্ত এবং কাফেগুলো বেশ উঁচু সিলিং দেয়া। যা কেবল প্রাদেশিক শহরগুলোতেই দেখা যায়। খুব ভালো লাগলো। শহরটা যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

পথেই দেখা হলো কলিনসের সঙ্গে। সে আমাদের খোঁজে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলো। ফিলমোর বললো, পারনদ টানা যাক একটুখানি। যদিও আমরা দু'জন সারা পথ আঁজু খেতে খেতে এসেছি। কিন্তু কলিনস তার পকেট থেকে বের করলো এক বোতল 'ভেনিসিয়েন'। নামটা খুব সম্ভব এ-রকমটাই হবে—যা নাবিকরা খায় চাঙা হবার জন্যে।

জিমির বারে যাবার আগে আমরা বসলাম এক রেস্তোরাঁয়। কিছু খেয়ে নিলে হয়। ধোঁয়াটে চেহারার বিশাল ট্যাভার্ন। আমরা একটা টেবিল বেছে নিয়ে সেখানে বসে কফি আর মদ খেলাম। কলিনস বলছিলো ব্যারণ দে চার্লুর কথা। দারুন মানুষ। বছরখানেক ধরে তিনি আছেন লে-হার্ভেতে। সৈনিক জীবনে যা সঞ্চয় করেছিলেন, তা ভেঙে ভেঙে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তিনি অল্পে তুষ্ট। খাদ্য, পানীয়, মহিলা আর বই।

ব্যারণ দে চার্লু সম্পর্কে কথা বলতে বলতে আমরা জিমির বারে এসে পৌঁছলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। বারের চেয়ারগুলো ভরে যেতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে। জিমি দোকানেই আছে। মুখখানা তার গাজরের মতো লাল। পাশেই বসে আছে তার সুন্দরী বউ। যার চোখ দুটো চকচকে। আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলো। পারনদের পাত্র এলো টেবিলে। গ্রামোফোন বাজছিলো উচ্চণ্ড আওয়াজে। তার ফাঁকে ফাঁকে কানে আসছে ইংরেজী, ফরাসী, ডাচ, নরওয়েজীয় আর

স্প্যানিশ কথাবার্তার মিলিত শব্দ। জিমি আর তার গিন্নি, থেকে থেকেই নিজেদের গ্লাস ঠোকাঠুকি করে নিচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। একটা আদিম পরিবেশ। মনে ইচ্ছে জাগে, এক্ষুনি প্যাণ্ট খুলে উদোম হয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিই। বারের মধ্যে মাছির মতোই ভীড় জমিয়েছে মেয়েরা। তাদের নজর বিশেষভাবে আমাদের দিকেই। তারা জিমিকে জানে বেশ ভালো-ভাবেই। আর যেহেতু আমরা তারই বন্ধু—আমরাই বা কম কি? জিমির মতো আমারাও নিশ্চয়ই শাঁসালো, মালদার পার্টি! আমরা পুরোনো কাপড় পরে আছি তাতে কী আসে যায়! আর অ্যালাইসরা তো এমন পোশাকই পরে থাকে। আমার পকেটে নেই একটা কপর্দকও। অথচ আমারই বা কী খাতির। দারুন দেখতে দুটো বেশ্যা আমার দু'হাত যেভাবে আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে চোখে সর্ষে ফুল দেখা ছাড়া আমার আর উপায় কি? তারা বারবার আমাকে তাড়া দিচ্ছে, 'কিছু খাওয়াও না মিনসে!'

গ্রামোফোনের বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করেছে ফিলমোর—একটা মুলাটো মেয়ের কোমর ধরে। মেয়েটা সাংঘাতিক সুন্দরী। তার পরণে আঁট সাট ভেলভেটের পোশাক। কলিনস আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'মাদাম' ওকে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছে। যদি তাকে চাও···পেতে পারো রাত্তিরে! মুলাটো মেয়েটা একজন সাবেক বারবণিতা। শহর-

তলীতে ওর বিরাট বাড়ি। এখন এক জাহাজী কাপ্তেনের রক্ষিতা। ব্যাটা এখন দূর সমুদ্রে। কাজেই—নাই নাই ভয়!—'যদি তোমাকে তার মনে লেগে যায়—তবে সে তোমাকে আমন্ত্রন জানাবে!' বললো কলিনস।

এটুকুই ছিলো আমার জন্যে যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে আমি মার্সে-লোর দিকে ঘুরে তার পাছায় চিমটি কেটে ইয়ার্কি মারতে শুরু করলাম। আমরা পরস্পরকে টিপতে আরম্ভ করছিলাম, যা দেখে দূর থেকে চোখ টিপে সম্মতির ইশারা দিলো জিমি। অন্য মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে আমরা দু'জন নিবিড়ভাবে আলাপ করছি—হঠাৎ শোনা গেলো, খাবার তৈরী!

টেবিলে খেতে বসেছি আমরা মোট কুড়িজন। আমি আর মার্সেলো বসেছিলাম মুখোমুখি। আমরা টেবিলের তলা দিয়ে হাত চালাচালি করলাম। যখন আমার কিছু বলবার পালা এলো, তখন ন্যাপকিনটা ফ্লাইয়ের সামনে রেখে বক্তৃতা দিতে হলো আমাকে। ঝামেলা আর কাকে বলে? যথা সম্ভব সংক্ষেপে আমি কথা শেষ করতে বাধ্য হলাম।

ডিনার শেষ হলো প্রায় মধ্যেরাতে। ইচ্ছে ছিলো, মার্সেলোকে নিয়ে ওপর তলায় চমৎকার একখানা ঘরে আমি ঘুমোবো। কিন্তু তা হবার নয় আপাতত। কেননা কলিনস বললো, 'অতো তাড়া কিসের? ফিরে যাবার আগে যথেষ্ট মওকা পাবে। ওকে থেকে যেতে বলো আপাতত। আমরা যতোক্ষন আছি, ততোক্ষন থাকতে বলবে।' শুনে খুব হতাশ হলো মার্সেলো, কিন্তু যখন

তাকে জনোনো হলো যে আমরা এখানে বেশ কয়েক দিন আছি —তখন আশ্বস্ত দেখা গেলো তাকে। আমরা বাইরে বেরুচ্ছি —হঠাৎ খুব শান্তভাবে আমাদের দু'জনের দুটি হাত তুলে নিয়ে ফিলমোর বললো—তার একটা ছোট্ট স্বীকারোক্তি দেবার আছে! তাকে খুব চিন্তিত, ফ্যাকাশে মনে হচ্ছিলো।

: বলো, কী বলবে,—বললো কলিনস। হাসতে হাসতে বললো সে—ঝেড়ে কাশো বাওয়া!—

: বুঝতে পেরেছি। ঝামেলা বাঁধিয়ে বসেছো।—কলিনস খুশিতে বাগবাগ হয়ে হাতের 'ভেনিসিয়েনে' উঁচু করে বললো—কিন্তু খবরদার, ডাক্তারের কাছে যাবে না। তারা একবার তোমাকে ফাঁদে ফেলতে পারলে তোমার হাড় মাংস খুলে নেবে। আর হ্যাঁ, এটা খেতে হবে—ভেনিসিয়েনে—দিনে অন্ততঃ দু'বার। খাবার আগে ভালোভাবে দু'বার ঝাঁকাতে হবে কিন্তু।...আর জানো তো, দুশ্চিন্তা জিনিষটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। বুঝতে পেরেছো? চলো চলো। কোনো চিন্তা নেই। আমি তোমাকে একটা সিরিঞ্জ আর কিছু পারমাঙ্গানেট দেবো ফিরে গিয়ে। চলো!'

লে-হার্লেভে আমরা ছিলাম প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে যা যা ঘটলো, তাতে মনে করা স্বাভাবিক যে আমরা এখানে কাটালাম অন্ততঃ একটি মাস। সোমবার ভোরেই আমাদের ফিরতে হবে। ফিলমোরের অফিস আছে। আর কলিন্‌স ভাবছে, একবার আইডাহোতে যেতেই

হয়। আট বছর যাবৎ সে ঘরছাড়া। মাঝরাত্রিতে আমি আর ফিলমোর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম ওপর তলায়। কিন্তু নিচের হৈ হল্লায় ঘুমোয় কার সাধ্য। বিশেষ করে ওই গ্রামোফোনের গর্জন। ভাগ্যিস হঠাৎ ঝড়-বাদলা শুরু হলো বাইরে। এবং ম্যাজিকের মতোই থেমে গেলো সরাইখানার মাতালদের চীৎকার। সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি, হোটেলটার বেশ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

ভোরবেলায় শহরটাকে কেমন অন্য রকম মনে হচ্ছে। আমরা স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলাম আইডাহো সম্পর্কে। আমরা তিন আমেরিকান। যদিও সে-দেশের আলাদা আলাদা জায়গা থেকে আমরা এসেছি—কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং সবশেষে আমরা তো আসলে একই রকম। দেশের কথা বলতে বলতে আমরা তিনজনই খুব আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আহা, কতোদিন হয়ে গেলো আমরা ঘরছাড়া। যেন এখন ট্রেন না এসে যদি একটা জাহাজ এসে স্টেশনে ভেড়ে, আমরা প্যারিসের দিকে না গিয়ে সোজা স্বদেশের পথে যাত্রা করবো। বলবো—বিদায় প্যারিস!

কিন্তু বেচারা কলিনস আর কখনো দেশে ফিরতে পারেনি। গরু, ঘোড়া, ফসল, বিশাল প্রান্তর আর পাহাড়ে ঘেরা খামার বাড়িতে আর ফেরা হয়নি তার। পরে সে খবর আমি যথারীতি পেয়েছিলাম। আর ফিলমোর ?···ফিলমোরকেও দিতে হয়েছিলো চরম মূল্য।··· আসলে আমেরিকা নামে কোনো দেশ নেই। এটা একটা ধারনা মাত্র। একটা বিমূর্ত ধারণা।···

১০

প্যারিস যেন একটা বারবনিতা। যাকে দূর থেকে অপরূপা মনে হলেও—কাছে গেলেই চিত্তির। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তুমি শূন্য, বিরক্ত এবং হতাশ।

আমার পকেটে কিছু টাকা আছে এখন। ট্রেনে ওঠার সময় কলিনস এক রকম জোর করেই গুঁজে দিয়েছে। তা, কয়েক শো ফ্রাঁ হবে। এতে একটা রুম নিয়ে অন্ততঃ এক সপ্তাহ ভালোভাবে খেয়ে দেয়ে কাটানো যাবে। সত্যি বলতে কি, বেশ ক'বছর যাবৎ এতো টাকা এক সঙ্গে আমার পকেটে উঠেনি। মনে হচ্ছিলো, একটা নতুন জীবন শুরু করতে চলেছি। অবশ্য হিশেব করে চলবার ইচ্ছেতেই রু দু সাতুর্ন এক বেকারির ওপর তলায় একটা শস্তা হোটেলে ঘর নেবো কিনা, ভাবছিলাম।

রাতে খেয়ে ফেললাম পনেরো ফ্রাঁ খরচ করে। অথচ মনে মনে স্থির করেছিলাম, এর অর্ধেকে কাজ সারবো। এই অপব্যয়ে আমি এতটা ঘাবড়ে গেলাম যে এক পেয়ালা কফি পর্যন্ত খেলাম না। এ হচ্ছে আমার জীবনের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এ-রকম প্রকৃতিই নয় আমার।

কিন্তু তবুও টাকার পরিমান দ্রুত হ্রাস পেতে থাকলো। বুলেভার রাসপাইলে হাঁটাহাঁটি করছি। হঠাৎ এক মহিলা এসে আমাকে থামালো। বৃষ্টি নেমেছে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টা বাজে?' আমি তাকে জানালাম, 'আমার ঘড়ি নেই।' সঙ্গে সঙ্গে যেন সে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো, 'ওগো আমার লক্ষ্মী সাহেব, আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?' আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মেয়েটি বললো, 'তাহলে বোধ হয় দয়ালু ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আমাকে একটা কাফেতে নিয়ে যাবেন? যা বিষ্টি নেমেছে গো। এদিকে আমার কাছে একটা পয়সাও নেই, যে কোথাও একটু বসি। লক্ষ্মী সাহেবটাকে দেখে যা দয়ালু মনে হচ্ছে—আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি, ইংরেজ না হয়ে যায় না।'

বিচিত্র, ম্লান হাসি মুখে ছড়িয়ে মেয়েটি বললো, 'তা ছাড়া একটুখানি বুদ্ধি-পরামর্শও নেয়া যাবেখন। আমার এ-দুনিয়ায় কেউ নেই। ঈশ্বর গো, টাকা পয়সা না থাকলে মানুষের যে কি অবস্থা হয়…।'

'লক্ষ্মী সাহেব', 'দয়ালু', 'ভালো মানুষ' ইত্যাদি ইত্যাদির সাঁড়াশি-আক্রমণে আমি যেন আচ্ছন্ন। ওর জন্যে আমার সত্যি দুঃখ হলো। কিন্তু আমি হাসলাম। হাসলো সে-ও—ক্ষ্যাপা, বিকারগ্রস্ত হাসি। আমি ওর হাত ধরে কাছাকাছি একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। সে তখনো বকবক করছিলো, 'লক্ষ্মী সাহেব, আপনি হয়তো মনে করছেন, আমি

মিথ্যে কথা বলছি। কিন্তু না, আমি ভালো মেয়ে। ভালো ফ্যামিলি থেকে এসেছি—কেবল'—আবার সেই খুচরো হাসি হেসে সে বললো,'—আমি এক হতভাগী, একটা বসার জায়গাও নেই!' এ-কথা শুনে আমি আবার হাসলাম। তার অদ্ভুত সংলাপ, বিচিত্র উচ্চারণভঙ্গি, বিদঘুটে হ্যাট ইত্যাদির জন্যে না হেসে থাকাও যায় না।

: শোনো।'—অমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কী জাত?'

: আমি ইংরেজ!'—সে জবাব দিলো।—'মানে আমার জন্ম পোল্যাণ্ডে। তবে কিনা বাবা আইরিশ!'

: অতএব তুমি ইংরেজ?

: হ্যাঁ!'—সে আবার বকবক করতে শুরু করলো।

: আমার মনে হয়, এমন একটা ছোট্ট সুন্দর হোটেলে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারো, যা তোমার চেনা!'—আমি বললাম। যদিও আমার আদপেই এরকম উদ্দেশ্য নেই। কথায় কথায় বললাম আরকি।

: ওগো, লক্ষ্মী সাহেব,।'—সে বললো—আপনি নিশ্চয় ওসব ব্যাপারে ইঙ্গিত করেননি। আমি বাপু অমন মেয়ে নই। আপনি বোধহয় রসিকতা করে ও কথা বলছেন। আমি শুনেই বুঝতে পেরেছি।···আপনি এতো ভালো; যা দয়ালু মনে হচ্ছে আপনাকে দেখে। আপনার সঙ্গে আমি কথা কইছি ঠিকই; কিন্তু একটা ফরাসীর সঙ্গে? কক্ষনো নয়। ওরা যা অপমান করে—"

আমি তার হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে একলা হয়ে পড়তে রাজী হয়না। তার ইচ্ছে, আমি তাকে তার হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। তাকে পনেরো কিংবা কুড়ি ফ্রাঁ ধার দিই।

ওকে ওর হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম আমি। আর ওর হাতে তুলে দিলাম পঞ্চাশ ফ্রাঁ। হয় মেয়েটি খুব চালাক অথবা যা—যা বলেছে তা সত্যি। যখন শুনলো, নোটটা ভাঙ্গাবার দরকার নেই, আমার হাত খানা তুলে নিয়ে তাতে চুমো খেলো। আমার এমন মায়া লাগলো যে মনে হলো, পকেটে যা আছে স-ব দিয়ে দিই। ভাবলাম, অন্ততঃ এরকম অভিজ্ঞতার জন্যেও মাঝে মাঝে ধনী হওয়া ভালো। কী আর এমন ক্ষতি হয়েছে আমার! মোটে পঞ্চাশটা ফ্রাঁই ই তো?

"জঙ্গলের" পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়লো, নাচের ফ্লোরে মেয়েদের উদোম পিঠে লাফিয়ে উঠছে মুক্তোর মালা। আমি বারে গিয়ে এক পেয়ালা শ্যাম্পেন দিতে বললাম। যন্ত্র-সঙ্গীত থেমে যাবার পর বারে এসে ঢুকলো এক স্বর্ন কুন্তলা সুন্দরী। মনে হলো, নর ওয়েজিয়ান। আমার পাশেই একটা চেয়ারে সে বসলো। খুব ভীড় নেই এখন। সবসুদ্ধ জনাবারো মেয়ে পুরুষ বসে বসে মদ খাচ্ছে আর গল্প করছে। এরা একটু অগেই পাশের ফ্লোরে নাচছিলো হয়তো। আমি আরো একটু সাহস অর্জনের জন্যে আর এক পাত্র শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলাম।

নাচ ঘরে আমি যখন ব্লণ্ড্ মেয়েটির সঙ্গে নাচছি—তখন ফ্লোরে আর কেউ নেই। অন্য সময়ে আমি যতোটা সচেতন থাকি, এখন তার ধারে কাছেও যেতে পারছি না। পেটে বেশ খানিকটা শ্যাম্পেন। মেয়েটি রীতিমতো আঁকড়ে ধরেছে আমাকে। তার ওপর মৃদু আলো আর সুরের ঝংকার। অনেক ক্ষন নাচবার পর আমরা বাক্যালাপে মগ্ন হলাম। হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করলো। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, বেশী বেশী মদ খাওয়ার জন্যেই মেয়েটা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার কান্নার কারন জানা গেলো অল্পক্ষনের মধ্যেই। তার বাচ্চাটা মারা গেছে অল্প ক'দিন হলো। সে নরওয়েজীয়ও নয়—ফরাসী। ভাবলাম, খানিকটা মদ খেলে শোক ভুলে থাকতে পারবে। বললাম, খাবে নাকি এক পাত্র?'—আমার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ ভারিক্কিভাবে অর্ডার দিলো একটা হুইস্কির। বললাম, আর এক পাত্র চলবে কি?'-মনে হলো, চলবে তো বটেই। উপরন্তু এক প্যাকেট ক্যামেল সিগারেট পেলেও মন্দ হয়না।—'না, এক মিনিট।' সে বললো, আমি বরং এক প্যাকেট 'পলমল'-ই আনাই!—আমি মনে মনে ভাবছি, যা খুশি তা আনাও—কিন্তু যীশুর দোহাই, কান্না থামাও। মুখে বললাম, 'তা এবার কোথায় যাবে?'

: ওই, যে কোনো জায়গায়। কথা বলবার মতো যে কোনো নিভৃত জায়গায়।'

আমি টয়লেটে ঢুকে আমার টাকাগুলো আবার গুনে দেখলাম। একশো ফ্রাঁর নোটখানা লুকিয়ে রাখলাম আলাদা জায়গায়। প্যাণ্টের পকেটে রেখে দিলাম পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট আর ভাংতি টাকা পয়সাগুলো। তারপর আবার ফিরে এলাম বারে।

কিন্তু মেয়েটির বিপদ বড়ো গুরুতর। তার বাচ্চাটাই কেবল মারা যায়নি। মা-টারও খুব অসুখ। ওষুধ কেনা আর ডাক্তারের ফি দিতে টাকার দরকার। ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর একটি কথাও বিশ্বাস হলো না আমার। একটা হোটেলও আমার ঠিক করতে হবে আজ। আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম, সে রাতটা এসে আমার সঙ্গেই কাটাতে পারে। কিন্তু সে আমাকে তার বাসাতেই নিয়ে যেতে চায়। কারণ ওর মা খুব অসুস্থ—যাকে দেখাশোনা করতে হয় ওরই। তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম, শস্তা হোটেলেও কিছু বাড়তি খরচ হবে। কিন্তু আমি যদি ওর অ্যাপার্টমেণ্টে যাই, সেই খরচটা অন্ততঃ বেঁচে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে যেতে। যাবার আগে মনে হলো, আগে আগেই আমার ক্ষমতার খবরটা ওকে জানিয়ে রাখা দরকার। যাতে পরে আবার কোনো গ্যাঞ্জাম না হয়। যখন সে আমার পকেটের সংবাদ শুনলো, মনে হলো, সে মুর্ছা যাবে। বললো 'মাত্র?' যেন অপমান আর রাগে সে আবার কাঁদতে শুরু করবে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে—তাহলে আমি যাই। বোধ-

হয় আমি ভুল করেছিলাম।'

: অবশ্যই ভুল করেছো।' সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো। কিন্তু আমার হাতটা ছাড়লো না। আবার বললো, তবে একটা বিবে চনা তোমার নিশ্চয়ই আছে?' একথা শুনে আমার মনে আত্ম-বিশ্বাস ফিরে এলো। ভাবলাম, এবার আমার বাড়তি কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ওকে। তাহলেই সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। বললাম, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে, তোমাকে খুশি করা যায় কিনা

: তখন তাহলে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে?'

: হ্যাঁ।'—আমি হেসে বললাম, 'এই একটু খানি মিথ্যে করে বলেছিলাম।' আমি টুপিটা মাথায় পরবার আগেই সে ট্যাক্সি ডাকলো। ড্রাইভারকে জানালো বুলে ভার দে ক্লিশির একটা ঠিকানা। আমি আঁতকে উঠে ভাবলাম, 'এ যে হোটেল ভাড়ার চাইতে বেশী?' যাই হোক, মেয়েটি খুব চমৎকার কথা বলতে পারে। এমনকি আঁারি বর্দো সম্পর্কেও সে বেশ জানে। একটা বেশ্যা বলছে আঁারি বর্দো সম্বন্ধে—এটা আমার কাছে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এমন একজন রুচিবান মহিলার সঙ্গেও দরকষাকষি করেছি—ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে এখন!

তার আপার্টমেন্টে পৌঁছে যখন তাকে হস্তগত করতে সক্ষম হলাম, তখন সে বারবার বলছিলো একটা কথাই, 'হা ঈশ্বর—নিচতলায় গিয়ে একবার মাকে দেখে এলে ভালো হতো না? আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'তুমি ইচ্ছে করলে গোসল করে

নিতে পারো! আমি এক্ষুনি আসছি!' দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে আবার জড়িয়ে ধরলাম আমি। আমার পরণে কেবল জাংগিয়া। উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে। মেয়েটি ওর মাকে দেখে আসবার জন্যে নীচে চলে গেলো। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতোই একটা আশঙ্কার কথা মনে এলো আমার। কোনো অঘটনের খপ্পড়ে পড়িনি তো; কোনো নাটকীয় ঘটনার? খবরের কাগজে যেরকম প্রায়ই থাকে? আমার চোখ দুটো দ্রুত ঘুরতে লাগলো ঘরটার চারদিকে। দুটো রুম। একটা বাথরুম। আসবাবপত্র মন্দ নেই। বরং কিছুটা ভালোই আছে বলতে হবে। দেয়ালে ঝোলানো আছে তার ডিপ্লোমাটি। "প্রথম শ্রেণী"—তারা সবাই যেমন পড়ে। ড্রেসারের ওপরে রয়েছে সুন্দর দেখতে একটা ছোট্ট শিশুর বাঁধানো ছবি। বাথরুমে আমি গোসল করার জন্যে পানি তুলেও, মত বদলে ফেললাম। আমি একদিকে গোসল করি আর ওদিকে যদি অন্য কিছু ঘটে যায়! আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আরো অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

সে ফিরে এলো যেন আরো বেশী উদভ্রান্ত অবস্থায়। বললোঃ 'সে মারা যাচ্ছে।...সে মারা যাচ্ছে।' মুষড়ে পড়লো মেয়েটা। আমি ভাবলাম, এবার আমার ফিরে যাবার পালা। নিচতলায় যখন কোনো মেয়ের মা মারা যাচ্ছে—তখন সেই মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গমরত হওয়া কতোটুকু বাস্তবতা সম্মত? আমি উঠে দাঁড়াতেই সে মৃদু কণ্ঠে মনে করিয়ে দিলো টাকাটার কথা। 'মায়ের, চিকিৎ-

সার জন্যে টাকাটার তার সত্যি দরকার এবং হঠাৎ সে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়েই কিমোনো উঁচু করলো। অগত্যা, আমাকেও তৎপর হতে হলো যথারীতি। যৌনলীলা চলছিলো—যে রকম চলে। অন্যান্য ফরাসী মেয়ের মতো এ মেয়েটাও আমাকে জড়িয়ে ধরেছে গভীর আবেগে। মুখে তার ফরাসী-চীৎকার। কিন্তু এ অবস্থাতেও আমি আমার টাকা গুলোর কথা ভুলিনি। বিছানার পাশে রাখা প্যান্টের পকেটে হাত বুলিয়ে বারবার তার নিরাপত্তা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হচ্ছিলো। অবশ্য মেয়েটির দৃষ্টি এড়িয়ে। লাগাবার সময় সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। এ ব্যবসায়ে এটি আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কাজেই আমাকে সতর্ক থাকতে হচ্ছিলো প্রতি মুহূর্তে।

মনে হচ্ছিলো, সারাটা রাত এভাবেই কেটে যাক। বিছানাটা খুবই নরম। যে কোনো গড়পরতা হোটেলের মতোই আরাম দায়ক আর পরিষ্কার। কেবল তার ওই যৌন-গুঞ্জনটা যদি না থাকতো? ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে, অন্তত এক মাস সে কোনো পুরুষের সঙ্গে শোয়নি। অ মিও অবশ্য এরকমই চাই। হুঁ হুঁ বাবা, একশো ফ্রাঁর চুক্তি! পুরোপুরি উশুল করে নিতে হবে না!

কিন্তু খেল খতম হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসলাম। মেয়েটি নিচের দিকে চলে গেলো তার মাকে দেখতে। আধঘণ্টা যায়। কিন্তু মেয়েটির পাত্তা নেই।

বিরক্তির এক শেষ। সময় যেন আর কাটেনা। ভেতরের ঘরে ঢুকলাম আমি। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা প্রেমপত্রখানা পড়লাম। বাথরুমটি সত্যি শৌখিন! কোনো জিনিষেরই ঘাটতি নেই শেলফের ওপর। আমি আশায় বসে আছি যে, সে শিগগীরই ফিরে এসে পঞ্চাশ ফ্রাঁ ফেরৎ দেবে আমাকে। কিন্তু সময়ের মতো সময় গড়িয়ে চললেও মেয়েটির কোনো খবর নেই। আমি সচেতন সতর্ক হয়ে গেলাম। কেউ কি তবে মায়া যাচ্ছে নীচ তলায়? ভাবতে ভাবতে কাপড় পরতে লাগলাম আমি। কোমরে বেল্ট পরতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেলো আমার। একশো ফ্রাঁর নোটখানা সে ভরে রেখেছে তার পার্সের মধ্যে। উত্তেজনার মুহূর্তে সে ব্যাগ খানা তাড়াহুড়ো করে রেখে দিয়েছে ওয়ার্ডরোবের ভেতরে। ঠিক ওই ওপরের তাকে। রাখবার সময় এক পলকে দেখে নিয়েছিলাম আমি।

ওয়ার্ড রোবের ভেতরে পার্সের অস্তিত্ব টের পেতে আমার সময় লাগলো এক মিনিট। ত্বরিৎ-হাতে পার্সের ভেতর থেকে বের করে নিলাম একশো ফ্রাঁর নোটখানা। তারপর পার্সখানা রেখে দিলাম আগের জায়গাতেই। ভেতরের খুচরো টাকা পয়সাও হাতিয়ে নিয়েছি আমি।

কাপড় চোপর পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কান খাড়া করলাম। না, কোথাও কোনো শব্দ নেই। মেয়েটি কোথায় গেছে,

তা সম্ভবত একমাত্র যীশুই বলতে পারেন। দরজাটা আলতো হাতে ভেজিয়ে দিয়ে নিচে—একেবারে রাস্তায় নেমে এলাম। তারপর যতো দ্রুত সম্ভব, হাঁটতে শুরু করলাম আমি।

কাফে বুঁদোর সামনে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতেই হলো। বেশ্যারা একটা হেঁৎকা লোককে নিয়ে বেশ মজাক্ করছে। লোকটা মাতাল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খাবারের প্লেটের ওপর। মাঝে মাঝে হুঁস হলে সে চপ্‌চপ্ করে খাবার চিবুচ্ছে পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ছে। এবং প্লেটের ওপর মুখ গুঁজেই। মজার ব্যাপার বটে।

আমি পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে গুনে দেখি, নেহাৎ মন্দ বাড়েনি আমার সঞ্চয়। আমি কি সত্যি তার দেয়ালে 'প্রথম শ্রেণী' লেখা ডিপ্লোমাটি দেখেছিলাম ? না কি দেখিনি ? কি মুশকিল বলো তো ! ওর মা টা কি মারা গেছে এতক্ষণে ? গোল্লায় যাক ওর মা ? ও যা-যা বলেছিলো, তা সত্যি হলে নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর ব্যাপার !

আমার কানে বাজছে একটা শীৎকার !···আর একটা ক্ষ্যাপা কণ্ঠস্বর 'লক্ষ্মী সাহেব ! ও গো, ভালো মানুষ—তোমাকে দেখতে কতো দয়ালু লাগছে !

ক্ষ্যাপা মেয়েটি যে-হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে কি সত্যি, সত্যি সে কোনো রুম ভাড়া নিয়াছে ? নিয়ে থাকলে সে-ও নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য ব্যাপার !

১১

গ্রীষ্মের ছুটিতে ফিলমোর আমাকে আমন্ত্রন জানালো তার কাছে গিয়ে থাকবার জন্যে। প্লেস ডু প্লের নিকটবর্তী অশ্বারোহী সৈন্যদের ব্যারাকের কাছেই তার ষ্টুডিও-অ্যাপার্টমেন্ট। লে-হার্ভেত সেই আনন্দময় আট—চল্লিশটি ঘণ্টা কাটিয়ে আসবার পর ফিলমোরের সঙ্গে আমার বেশ ক'বার দেখা হয়েছে। যাই হোক, ফিলমোর যদি আমাকে ওর কাছে গিয়ে থাকতে না বলতো, তাহলে আমি কোথায় কিভাবে থাকতাম, বলা দুস্কর। খুব সম্ভব আমি মারাই যেতাম।

: আমি তোমাকে অনেক আগেই নিয়ে আসতাম।'—সে বললো—'কিন্তু জ্যাকি কুত্তিটার জন্যেই পারিনি। ওর কবল থেকে মুক্তি পাবার উপায় ও আমার জানা ছিলো না।'

আমি হাসলাম। ফিলমোরটা চিরদিনই ওরকম। ঘরছাড়া কুত্তিগুলোকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিলো ওর অসাধারণ। যাই হোক, জ্যাকি নিজে থেকেই কেটে পড়েছে।

বর্ষা আসছে। স্যাঁত সেতে, প্যাচপেচে বিষন্ন দিন। ধোঁয়াশায় চারদিকে আচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে আছে হাড়-কনকনে শীত।

আমি আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, ঠাণ্ডা মোকাবেলার জন্যে ষ্টুডিওর মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটা ষ্টোভ। তবুও, জায়গাটা আরাম দায়ক। ষ্টুডিওর জানালা দিয়ে বাইরের যে দৃশ্যটুকু চোখে পড়ে, তা-ও অপূর্ব।

ভোরবেলা ফিলমোর এসে আমাকে ধাক্কিয়ে ঘুম থেকে ওঠাবার চেষ্টা করে। তারপর বালিসোর ওপর দশ ফ্রাঁর একখানা নোট রেখে অফিসে চলে যায়। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কোনো কোনোদিন দুপুর পার করে উঠি ঘুম থেকে। বইটা শেষ করা ছাড়া আর কোনো তাড়া নেই। তবে এটাও তো জানি, পাঠক বইটা নেবে না। ফলে এ বই শেষ করে ফেলার ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়িনা আমি। অবশ্য লেখাটি সম্পর্কে ফিলমোরের খুব উৎসাহ। বিকেলে যখন একটা বোতল নিয়ে সে ফিরে আসে—তখন তার প্রথম কাজটাই হলো টেবিলে গিয়ে লেখাটি সম্পর্কে তত্ত্ব তল্লাশ নেয়া। ক'পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে তা গুনে দেখা। প্রথম প্রথম তার এই আগ্রহে উদ্দীপিত হলেও পরে এ খুব বিরক্তিকর মনে হতো আমার কাছে। সে কি আমাকে পানির ট্যাপ পেয়েছে যে, অবিরল পানি ঝরতে থাকবে তার ভেতর থেকে! যখন ফিলমোরকে নতুন কোনো পৃষ্ঠা দেখাতে ব্যর্থ হতাম, তখন, নিজেকে মনে হতো সেই কুত্তিটার মতো—যাকে সে সদ্য বিদায় করেছে। ইস্, যাবার আগে জ্যাকি যদি আমাকে ওর পাছার একটা টুকরো দিয়ে যেতো!

তাহলে ওই টুকরোটা দেখিয়েই নতুন পৃষ্ঠা সম্পর্কে ফিল-মোরের আগ্রহকে আমি তৃপ্ত করতে পারতাম। নতুন নতুন পৃষ্ঠা দেখাবার চেয়ে এ কাজটা হতো অনেক সহজ।

অবশ্য ফিলমোর আমাকে সহজ স্বচ্ছন্দ রাখতে চেষ্টা করতো সব সময়। অঢেল খাবার, প্রচুর পামীয়! ওর আবার নাচর বাতিক ছিলো। প্রায়ই আমাকে সঙ্গী হবার জন্যে অনুরোধ করতো। রু দ ওদেসার নিগ্রো হেটেলগুলো ছিলো ওর খুব প্রিয়। ওখানকার বেশ ক'টা চটকদার মুলাটো মেয়ে মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় এসেও রাত কাটিয়ে যেতো। ফরাসী মাগিদের মধ্যে সে এমন কাউকেই পায়নি যে কাজকামের আগে খানিকটা গ্যাঁজাবে বা একটুখানি মদ খাবে। এটা ছিলো তার কাছে মহা বিরক্তিকর। তাছাড়া সে সব সময় নিজেকে শিল্পী ভাবতে ভালো বাসতো। যে লোকটার কাছ থেকে সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, সে একজন আর্টিস্ট। ফলে একটা অর্ধ—সমাপ্ত পরাবাস্তব ছবি ইজেল সহ বর্তমান তার স্টুডি-ওতে।' অন্যান্য ছবিও অনেক আছে ধারে কাছে। সে গুলোও বিমূর্ত ধরনের। যে সব ছবির স্বাদ নেবার বেলায় অথবা সমঝদারিত্বে একটা বেশ্যা কিংবা ক্যাবিনেট-মিনিস্টারের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। ফিলমোরের জন্যে এটা পরম স্বস্তির ব্যাপার যে, মার্ক সুইফট প্রায়ই এখানে নিয়মিত আসতো আমার পোর্ট্রেট আঁকতে। সুইফটের গভীর অনু-রাগী সে। তার মতে—সে একটা প্রতিভা! তবে মুশকিল

ছিলো এই, অঙ্কিত চিত্রে মানুষ রয়েছে না গরু রয়েছে—তা বোঝা চাট্টিখানি কথা ছিলো না।

সুইফটের অনুরোধেই আমি দাড়ি রাখতে শুরু করি। আমার খুলির যে সাইজ—তাতে নাকি দাড়ি রাখাটা আমার জন্যে ভালো। আমি জানালার কাছে বসেই পোজ দিতাম। পেছন থেকে দেখা যেতো আইফেল টাওয়ার। সুইফট আমাকে আঁকতে চায় ব্যাক গ্রাউণ্ডে আইফেল টাওয়ার রেখে। সে চাইতো, আমার পাশে একটা টাইপরাইটারও থাক। ক্রুগার ও বেছে বেছে ঠিক এই সময়টাতেই আসতো। সে খোঁচা দিয়ে বলতো,—'সুইফট আবার ছবি আঁকার কি জানে?' ক্রুগারের চোখে ধরা পড়েছিলো সুইফটের কাজে মাত্রা জ্ঞানের অভাব। ক্রুগার প্রকৃতির নিয়ম মানে। আর সুইফট আদপেই ধার ধারে না ওসব প্রকৃতি-ফ্রকৃতির। তার মাথায় যা আসে, সে তাইই আঁকে। যাই হোক, এখন আমার প্রকৃতিটি সুইফটের ইজেলের ওপর আঁটা। যদিও ছবিটাতে মাত্রা বা পরিপ্রেক্ষিত বলতে কিছু নেই, তবুও যে কোনো ক্যাবিনেট-মিনিষ্টারও ওটাকে একটা মানুষের ছবি, একটা দাড়িওয়ালা মানুষের ছবি বলেই বুঝতে পারবেন।

ফিলমোরের বাসার নিচেই শুরু হয়েছে উঁচু দেয়াল ঘেরা এক বিশাল মাঠ। অশ্বরোহী সৈন্যদের ব্যারাক। দেয়ালের বাইরে, রাস্তার ম্লান আলোর নিচে রোজই আমি এক জোড়া মেয়ে পুরুষকে দেখি। এমনকি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়েও তারা পর-

স্পরকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে। অদ্ভুত দৃশ্য। যেন বন্দীশালার বাইরে প্রণয় মত্ত প্রেমিকযুগল। আর দেয়ালের ভেতরে যা ঘটে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। একদিন বৃষ্টি নামলে আমি জানালায় দাঁড়িয়ে যা দেখি, তাকে আমার কাছে পৃথিবীর বাইরের কোনো ঘটনা বলেই মনে হয়েছিলো। সব কিছু ওখানে ঘটে কর্মসূচী অনুযায়ী। আর কর্মসূচীটি প্রণয়ন করেছে কোনো এক উন্মাদ। কাদার মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে তারা হামলা চালানোর মহড়া দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে বেজে উঠছে বিউগল। সব কিছু ঘটছে ওই চার দেয়ালের ভেতরে। এ এক ছায়া যুদ্ধ। সেখানে আমি দেখতে পেয়েছিলাম এক দল টিনের সৈনিককে, যারা অন্যকে হত্যা করা কিংবা নিজেদের জুতো চকচকে রাখা অথবা ঘোড়ার কেশর ঠিক ঠাক রাখবার টেনিং-এর ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী নয়। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বিদঘুটে বলে মনে হয়। যখন ওদের কোনো কুচকাওয়াজ না থাকে, তখন ওদেরকে মনে হয় আরো অপদার্থ। পকেটে হাত দিয়ে তারা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে; কিংবা আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সামনে কোনো অফিসারকে দেখলেই, তারা মাটিতে গোড়ালি ঠুকে স্যালুট লাগায়। ব্যারাকটাকে আমার কাছে একটা পাগলা-গারদ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এমন কি ঘোড়াগুলোকেও দেখতে কেমন যেন হাস্যকর লাগে। মাঝে মধ্যে সাঁজোয়া গাড়ির বহর

নিয়ে তারা প্যারেড করে যায় রাস্তা দিয়ে। লোকে তখন এদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে, 'বা ; কী সুন্দর পোশাক!' আমার কাছে অবশ্য পিছু হটে আসা সৈন্যদল ছাড়া ওদের আর কিছু মনে হয় না। আর ওদের পোশাক-আশাকও দেহের মাপ অনুযায়ী বেশ ঢোলা। দিনগুলো বয়ে যাচ্ছিলো মসৃণভাবেই। ক্লার্ক মাঝে মধ্যেই আমার জন্যে এক একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে আসে। পর্যটন-সম্পর্কিত নিবন্ধ লেখার ফরমাশ—যা লিখতে নাকি ওর ঘেন্না করে। আর এই লেখার জন্যে সম্মানী মেলে মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঁ। অবশ্য লেখা দাঁড় করাতে আমার খুব একটা কষ্ট হয়না। পর্যটন বিভাগের পুরোনো পুস্তিকার লেখার ওপর খানিকটা নতুন রঙ চড়িয়ে দিলেই হয়ে যায়।

একদিন বিকেলবেলা বাইরে খানিকটা বেড়িয়ে বাসায় ফিরেছি। দরজা খুলেই দেখি এক মহিলা। আমাকে দেখেই বিছানার ওপর দুলে উঠে সে বললো, 'ও, তাহলে তুমি সেই লেখক? কী সাংঘাতিক দাড়ি!— তোমরা এখানে সবাই দেখছি পাগল?'

: সে এক রাজকুমারী!' ফিলমোর পরিচয় দিলো মেয়েটির। আমার তো তাক লেগে যাবার মতো ব্যবস্থা। একে তো রাশিয়ান, তার ওপর রাজকুমারী। ফিলমোর এমন ভাবে তার পেছনে পেছনে ঘুরছে, যেন রাজ কন্যার কোনো অমর্যদা না-হয়। উত্তেজিত ভাবে সে আমাকে জানালো, 'এ পাঁচ ভাষায় কথা বলতে পারে!'

: নন্—ফোর !' মেয়েটি শুধরে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।
তা রাজকুমারী ঘাবড়ে গেছে। সে বারবার তার উরু চুলকোচ্ছে। নাক ঘষছে। ফিলমোরকে দেখিয়ে সে বললো।—'বড্ড বেশী বকবক করে। আর কী গলার আওয়াজ !'
জানা গেলো, সে নাকি নামকরা চিত্র নায়িকা। কে যেন তাকে প্রতারণা করেছে। সেই কথাই সে ভুলতে পারছে না। মেয়েটিকে আমি রুশ রেস্তোরাঁয় নাচতে দেখেছি ঠিক নিগ্রো মেয়েদের মতো। ফিলমোরকে নিয়ে বেড়াতে যাবার সময় সে আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। বললো—তোমাকে কিন্তু ওর চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। আমি আর একদিন ডিনারে আসবো, কেমন ?'
: চমৎকার হবে !' আমি বললাম—'সঙ্গে আর একজন রাজকন্যা এনো। অন্ততঃ একজন কাউন্টেস। আমরা প্রত্যেক শনিবার বিছানার চাদর বদলাই !'
ফিলমোর ফিরে এলো শেষ রাত্তিরের দিকে। একা। তার অবস্থা শোচনীয়। বললো, 'আমি এক্ষুনি শুয়ে পড়বো। সব কথা কাল বলবো।' কাপড় চোপর সুদ্ধ সে বিছানায় শুয়ে পড়লো সটান। বললো—'কী মেয়ে, বাপরে, মেয়ে বটে একটা ! আমি অবশ্য আগেই বুঝেছিলাম, এ একটা পাগল !'
শুয়ে পড়লেও ঘুম কোথায় ফিলমোরের। সে প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে আমাকে শুনিয়ে যাচ্ছে, সেই রাজকন্যার রূপ কথা। এখানে ওখানে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়ে, মদ খেয়ে, নেচে

কুঁদে মেয়েটি ফিলমোরের মতো সহিষ্ণু মানুষকেও ক্লান্ত করে ফেলেছে। সে নাকি অভিনয় করতো সিনেমায়। একজন চিত্র পরিচালকের সঙ্গে তার প্রেম হয়। কিন্তু চিত্র পরিচালক তাকে রেখে কেটে পড়লে সে আত্মহত্যা করবার জন্যে নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু কিছু লোক তাকে উদ্ধার করে। এ তো গেলো আগের কথা। আজ সন্ধে থেকে সে ফিলমোরকে যে রকম তুর্কি-নাচ নাচিয়েছে তাতে সে যে ঘোর উন্মাদিনী, তা বুঝতে কারো বাকী থাকেনা।

মেয়েটির নাম মাশা। মাশার সঙ্গে ফিলমোরের তামাশা তুঙ্গে উঠলেও শেষ কালে ছোকরার আমাশা হবার দশা। অনেক দিন নেচেকুঁদে, অনেক পাগলামো সহ্য করে বিস্তার ক্ষতি স্বীকারের পর শেষটায় পর্বতের মূষিক প্রসব। জানা গেলো, মেয়েটি একটি অকৃত্রিম লেসবিয়ান। সে মেয়ে হয়ে মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গম করতো বটেই। এমনকি পুরুষ সঙ্গীকেও মনে করতো মেয়ে। এবং সেখানেও সমকাম! বেচারা ফিলমোর!

১২

ক্রিসমাসের সূর্যোদয়ের অল্প আগে আমরা টেলিফোন-কোম্পানির এক জোড়া নিগ্রো মেয়েকে বগলদাবা করে বাসায় ফিরলাম। ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে গেছে। আমরা পোশাক-আশাক না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে যেটা শুয়েছে, সে যেন একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা মাদী চিতা। অন্ততঃ বিকেল বেলা আমার তাই মনে হয়েছিলো। কিন্তু এখন, এই শেষ রাতে বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে কাদা। আমি ওই অবস্থাতেই তাকে লাগালাম বার কয়েক। কিন্তু আমি যেন একটা ডুবো পাথরের ওপর নুনু ঘষছি। ধেৎ—এভাবে কি এসব জমে? দুত্তোর বলে শেষে আমিও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম।

ছুটির দিনের সকাল দুপুর সন্ধে—তিন বেলাই আমরা শ্যাম্পেন খেলাম। শস্তা, তবে ভালো শ্যাম্পেন। নতুন বছর পড়তেই, আমি চলে যাচ্ছি দাইজোঁ বলে একটা জায়গায়। সেখানে আমার একটা কাজ জুটেছে। ফরাসী ছাত্রদের ইংরেজি শেখার দায়িত্ব। ফিলমোরের চাকরিতে আছে উন্নতির আশা।

কিন্তু আমার আছে এক নরক থেকে আরেকটিতে স্থানান্তর। আমার কোনো ভবিষ্যত নেই। এমন কি বেতন পর্যন্ত নেই।

বিদায়ের আগের রাতটি ছিলো সত্যি চমৎকার। সকালের দিকে তুষার পাত শুরু হয়েছে। আমরা দু'জনেই কাপড় চোপর পরে বাইরে বেরুলাম। ফিলমোর আমাকে এগিয়ে দেবে। উঠিয়ে দেবে গাড়িতে।

ট্রেন থেকে নেমেই মনে হলো, বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছি। যেখানে নামতে হবে—জায়গাটা আরো খানিকটা এগিয়ে। আমি সদর রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। হালকা বরফ পড়ছে। গাছগুলোতে চক চক করছে তুষার কনা। জনহীন কাফেগুলো যেন ঝিমোচ্ছে এখন। এখানে সরষের তেল ছাড়া আর কিছুই হয়না। সরষের তেলের শহর।

গন্তব্য স্থলে পৌঁছেই কিন্তু আমি দমে গেছি। এ কোথায় এলাম? আমি কি ফিরে যাবো এখান থেকে? যেহেতু ফেরার টিকিট কেনার পয়সা নেই, তাই এগোতে হলো। হঠাৎ মনে হলো, ফিলমোরকে একটা টেলিগ্রাম করবো? কিন্তু কি বলবো তাকে? বলার তো কিছুই নেই। অগত্যা, চোখ মুখ বুঁজে ঢুকেই পড়লাম কলেজ-কম্পাউণ্ডে!

জানা গেলো, মসিয়েঁ লে প্রভিসিউর—অর্থাৎ অধ্যাপক—মহোদয় কলেজে নেই। আজ তাঁর ছুটি। একজন কুঁজো লোক—এগিয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলো আরেকটি

অফিসে। এ অফিসটা বেশ বড়ো এবং জনশূন্য। আমি একটা খট খটে কাঠের চেয়ারে বসে পড়লাম। কুঁজো লোকটা গেলো, অফিসে কে আছে, খোঁজ নিতে। পরিবেশটা অচেনা নয়। দেশে থাকতে বহুবার আমাকে এই ধরনের এক একটা জায়গায় বসে উটকো অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে।

একসময় দরজা খুলে গেলো। মসিঁয়ে লে সেন সুয়ের—অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভেতরে ঢুকলেন। ঠিক বোরিসের মতোই একটা ফ্রক-কোট তাঁর গায়ে চাপানো। তিনি আমার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। তিনি কোত্থেকে টান মেরে বের করলেন একটা কাগজ—যাতে লেখা আছে ছাত্রদের নাম। আর আছে কখন, কী কী ক্লাশ তার রুটিন। তারপর তিনি আমাকে বরাদ্দ করা কয়লা এবং কাঠের পরিমান জানালেন। সবশেষে জ্ঞাত করলেন, অবসর সময় আমি যা খুশি তাই করতে পারি। এই শেষ কথাটিই আমার কাছে তার প্রথম সুবাক্য বলে মনে হলো!

দরকারী কথা বার্তা শেষ হতে তিনি বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মসিঁয়ে লে ইকোনোমে—অর্থাৎ কিনা হিসাব রক্ষক সাহেবের অফিসে নিয়ে যাবার জন্যে কুজোঁর প্রবেশ। এখানকার পরিবেশ আবার খানিকটা অন্যরকম। বিল, রাবার স্ট্যাম্প ইত্যাদি চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো। প্রচুর ভোঁতা কলম গড়াগড়ি খাচ্ছে এখানে সেখানে। সর্বোপরি টেবিলের

ওপর শোয়ানো আছে এক চাউস হিসাবের খাতা। একটা ক্ষুদে ঠ্যালা-গাড়িতে বরাদ্দকৃত কয়লা আর কাঠ নিয়ে কুঁজোর সঙ্গে আমার বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হলাম।

আমার বাসস্থান নির্ধারিত হয়েছে ওপর তলায়। পিয়নদের পাশাপাশি। বিচিত্র ব্যবস্থা বটে। এর পরে আরো কি কি বিচিত্র ব্যবস্থা দেখতে হবে কে জানে? তা ঘরটা বেশ বড়োই বলতে হয়। জানালা দিয়ে নীচে দেখা যায় ফেরিওয়ালা, রুটিওয়ালা আর মুচিদের জন্যে তৈরী ছোট ছোট পাথরের ঘর। দুরের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ধাবমান একখানা ট্রেন তীব্র আওয়াজে হুইস্‌ল দিলো।

কুঁজোটা আগুন জ্বেলে দিয়ে গেলো ঘরের ভেতরে। আমার এখন চিন্তা, খাবো কি? খাবার কী ব্যবস্থা! অবশ্য ডিনারের সময় এখনো হয়নি। ওভার কোট গায়েই বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম আমি। এমনকি চাদরটাও টেনে দিলাম শরীরের ওপর। টেবিলের ওপর একটা ঘড়ি। সময় গুনতে থাকলাম আমি মনোযোগের সঙ্গে। সত্যি, এ এক বিচিত্র জীবন আমার কোনোদিন কয়লার আগুন জ্বালানো ঘরে ঘুমোইনি। কিংবা কখনো কাউকে পড়াইনি। অথবা বিনা বেতনে কখনো কোনো চাকরিও করিনি। আমি যেন একই সঙ্গে মুক্ত এবং শৃংঙ্খলাবদ্ধ। নিজেকে আমার মনে হলো একটা ভাড়াটে মানুষ; এক জন শিকারী, কোনো সবজান্তা, এবং কীটের মতো। বিনা মূল্যে খাবার টিকেট পাওয়া, আমি যেন এক গণতান্ত্রিক

জীব। যার কোনো শক্তি বা শব্দ নেই। যেন জলাধারে ঠিক্‌রে মরা জেলি-ফিশ। সর্বোপরি আমি ক্ষুধার্ত। চারদিকে কী ভয়াবহ নৈঃশব্দ! আগুন টিম টিম করে জ্বলছে। কিন্তু তাপ দেবার ক্ষমতা তার কমে আসছে দ্রুত। আমার ভয় হলো, রাতের খাওয়াটা বোধহয় পণ্ড হয়েই যাচ্ছে। অর্থাৎ সারারাত্রি নিরম্বু উপবাস। কী সর্বনাস।

হাঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি হলো। আর আমিও লাফিয়ে উঠলাম বিছানা থেকে। দরজায় লাগালাম তালা। তারপর নীচে নেমে গেলাম দ্রুতপায়ে। কিন্তু গোলক ধাঁধায় পড়ে যেন পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। একবার এদিকে যাই, আবার ওদিকে ছুটি। কিন্তু খাবার ঘর কোনদিকে—কিছুতেই খুঁজে পাই না। হঠাৎ দেখি, একদল ছোকরা সারবেঁধে যেন কোন্ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের যেন খেদিয়ে নিয়ে চলেছেন এক বয়স্ক লোক। সেই চটপটে ভদ্রলোককে আমি থামালাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, খাবার ঘরটা কোনদিকে! যাক বাবা। আমি যথার্থ লোককেই জিজ্ঞেস করেছি। ইনিই মসিয়েঁ লে প্রভিসিয়র স্বয়ং। মনে হলো, আমাকে এভাবে দেখে তিনি খুশিই হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনার থাকার ব্যবস্থা ঠিক মতো করে দেয়া হয়েছে তো! কোনো অসু-বিধে—'! আমি বললাম, 'সব ঠিক আছে। কেবল একটু ঠাণ্ডা!' তিনি নিশ্চয়তা দিলেন, 'এবার ঠাণ্ডাটা একটু বেশীই পড়েছে। তবে এটা সাময়িক!' যাই হোক তিনি আমার হাত ধরে খাবার

ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। ভদ্রলোককে আমার ভালোই লাগছে। বেশ চমৎকার মানুষ। এমনকি আমার এমন কথা ও মনে হলো, ইনি নিশ্চয়ই আমাকে নিজের বাসায় দাওয়াত করবেন।

হঠাৎ আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি বিদায় নিলেন! আমি তো হতভম্ব। এতোটাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম যে, শুভরাত্রি জানিয়ে, তাঁর টুপি খুলে বিদায় জানাবার জবাবে আমিও টুপি খুলে বিদায়ের ভঙ্গি করলাম। এ ছিলো এই জায়গাটার রীতি। পরে আমি তা জানতে পেরেছিলাম। তোমার সামনে যখনই প্রফেসর কিংবা অ্যাকাউন্টেন্ট, তুমি তখনই টুপি খুলে অভিবাদন জানাবে। হয়তো একই লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে দিনে বারো তেরো বার। এবং হ্যাঁ, প্রত্যেক বারই তোমাকে টুপি টেনে নামাতে হবে মাথা থেকে। জানাতে হবে সালামালেকুম।

যাই হোক, খাবার ঘর অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেলো। যেন কোনো ইস্ট—সাইড-ক্লিনিকের মধ্যে আমি ঢুকে পড়েছি। টাইল বসানো দেয়াল, খোলা আলো আর মার্বেল-টপ্ টেবিল। আর একটা ঢাউস চুল্লি তো আছেই—তাপ দেবার জন্যে। খাবার এখনো দেওয়া হয়নি। থালা বাসন কাঁটা চামচের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক কোনায় একদল যুবক গল্প করছে পুতুলের মতো। আমি তাদের সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তারা আমাকে সাদর সংবর্ধনা জানালো। খুবই

উষ্ণ আন্তরিক অভ্যর্থনা। এ আমার ধারনাতীত। ঘরটা আস্তে আস্তে ভরে যেতে শুরু করলো। আমাকে দ্রুত একজনের পর একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। এর-পর তারা আমাকে ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করলো। এবং গ্লাসগুলো মদে ভরে নিয়ে গাইতে শুরু করলো একটা গান। সালভাদোর কোয়াসিমোদোর লেখা। যেন কোয়াসিমোদোই নৈশভোজের ঘোষনা করলেন।

বেশ প্রাণবন্ত ছেলে এরা। ক্রেয়ো বলে ছোকরাটা সব সময় শূয়োরের মতো ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতো। ছিলো মসিয়ে লে প্রিন্স—। খেলাধুলোর বাতিক ছিলো তার। দেখতে ছিলো অনেকটা মেয়েদের মতো। সে কখনো মদ খেতো না। এমন কিছু পড়তো না যাতে তার মগজের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। তার পাশেই বসতো পেতিপল—সারাদিন যে ছেলেটা যোনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কথা চিন্তা করতে পারতো না। ডাইনে-বাঁয়ে ধার করে বেড়াতো মেডিসিনের ছাত্র পাসেলু। আমার উল্টোদিকে বসতো আহ্বায়ক মোলেস। মাংস কয়েক গ্রাম কম হয়েছে কি না, সে তা প্রমাণ করবার জন্যে যেন মুখিয়ে থাকতো। সে একলাই দখল করে রেখেছে আস্ত একটা রুম। তার সঙ্গে হিশেবরক্ষকের খুনসুটি লেগেই থাকতো অষ্ট পহর। মোলেসের সাঙাৎ ছিলো লে পেনিবল। বাজপাখির মতো এই ছেলেটি ছিলো হাড়কিপ্টে। সুদখোর হিশেবে তার

১৫—

খ্যাতি সারা তল্লাটে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আলবের দুরারের ভাস্কর্যের মতো দেখতে এই ছেলেটি ছিলো অবশ্যই ইহুদী। আমি এখানে আসবার অল্প দিনের মধ্যেই সে মারা যায়। সেই সঙ্গে নিয়ে যায় আমার তেইশ ফ্রাঁ ঋন পরিশোধের দুশ্চিন্তাও। আশেপাশে আরো যারা বসতো তাদের মধ্যে এক রেনোদ ছাড়া আর সবার স্মৃতিই আমার মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে। তার কারণ, নিছক শিক্ষার্থী ছাড়া আর তাদের অন্য কোনো পরিচয় ছিলো না। ছিলো না অন্য কোনো বিশেষত্ব। তারা দুনিয়ার প্রকৌশলী, স্থপতি, দন্ত-চিকিৎসক আর শিক্ষকদের পদ পূরণের জন্যেই তৈরী হচ্ছিলো। তাদের সুনিদ্রা হতো এবং কখনো তাদের কোনো রকম অভিযোগ ছিলো না। তারা সুখীও নয়। দান্তে যাদের জন্যে স্থান নির্ধারণ করেছিলেন নরকের বারান্দায়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই সবাই হাঁটাহাঁটি করতে যেতো শহরের দিকে। শহরের মাঝামাঝি জায়গায় কতগুলো কাফে। একটা কাফে ওরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলো। সেখানে কয়েকটা বেশ্যাও এসে বসতো কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে। আর কী বাজনা! এমন প্রচণ্ড শীতে, দাইজোঁর মতো একটা নোংরা গর্তে ফরাসী যন্ত্রসঙ্গীত শোনার চেয়ে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

আমার হাতে প্রচুর সময়। কিন্তু পকেটে একটি পয়সাও নেই। দিনে দু' থেকে তিন ঘণ্টা ছাত্র পড়াই। তারপর অখণ্ড

অবসর। এদের ইংরেজি শিখিয়ে কী লাভ হচ্ছিলো, তা বোঝা দুষ্কর। ক্লাশের শেষে যখন হাতে কোনো বই-টইও থাকতো না, তখন যেতাম অফিসের পিয়নদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। তারা দুনিয়ার কোনো খোঁজ খবরই রাখে না—বিশেষ করে শিল্প সম্পর্কে। অনেকটা ওই ছাত্রদের মতোই অজ্ঞ।

এখানে খাবার দাবারের ব্যবস্থা জঘন্য। সকালে মাখন ছাড়া রুটি এবং ময়লা মগে নীল কফি। দুপুরে ডাল আর সব্জী। মাঝে মধ্যে মাংসের কুচি। সবকিছু মেপে মেপে। কয়েদী আর পাথরভাঙা মজুরদের ঠিক এ-রকমটাই খেতে দেয়া হয়। এমন কি মদটাও দেয় বাজে।—'এ জন্যে দায়ী ওই ব্যাটা হিশেবরক্ষক!'—বলতো ওরা। আসলেও তাই। কারো অসুখ বিসুখ হলে লোকটা তার খোঁজ খবরটা পর্যন্ত নিতো না।

এমন খিদে পেতো যে মাঝে মধ্যে নিজেকে মনে হতো উন্মাদ। আমি ছাত্রদের খানা থেকে রুটির টুকরো উঠিয়ে নিতাম। চেয়ে নিতাম। আমাকে আগুন জ্বালাবার জন্যে এতো কম কাঠ দেয়া হতো যে, রাস্তায় গিয়ে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে হতো আমাকে।

আর অধ্যাপকগন। উফ্, ভাবা যায় না। এখানে আসার পর টুপি খুলে সালাম দিতে দিতে আর নিতে নিতে আমার অবস্থা রীতিমতো কাহিল। এরা সব মিলিয়ে এমন বিরক্তিকর—যে কাউকে দেখলেই মনে মনে আমি অভিশাপ দিতাম। গালা-গাল করতাম যাচ্ছেতাই ভাষায়। এ আমি কোথায় এলাম!

নাকি দুঃস্বপ্ন দেখছি।

নেহাৎ ভাগ্য ভালো তাই বসন্তের শুরুতেই ওই পাগলা-গারদ থেকে মুক্তি পেলাম আমি। কার্ল টেলিগ্রাম করেছে: 'ওপর দিককার একটা পদ খালি হয়েছে। তুমি যদি চাও, আমি গাড়ি ভাড়া পাঠাচ্ছি।' আমি সম্মতিসূচক জবাব দিলাম। তার-পর গাড়ি ভাড়ার টাকা হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সোজা হাঁটা দিলাম স্টেশনের দিকে। কাউকেই কিছু জানালাম না। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই ফরাসী ছুটি। প্যারিসে পৌঁছেই সোজা কার্লের ডেরায়। সে আমাকে দরজা খুলে দিলো ন্যাংটো অবস্থায়। বিছানায় ঘুমিয়ে আছে একটা মেয়েমানুষ। কার্ল বললো, 'বিব্রত হবার কিছুই নেই। ঘুমোচ্ছে মাগিটা। যদি চাও। এক রাউণ্ড লাগাতে পারো। মাল মন্দ নয়!' বলতে বলতে চাদর সরিয়ে সে মেয়েটিকে ভালো করে দেখালো আমাকে। কিন্তু আমি তখন লাগাবো কি! আমার অবস্থা সদ্য-কারামুক্ত বন্দীর মতো। মনে হচ্ছে, কতোদিন পর বিচরণ করছি মুক্ত আলো হাওয়ায়!

ঘরের দিকে ভালো মতোন ঠাহর করে আমি যেন বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যি আমি প্যারিসে এস পৌঁছেছি। হ্যাঁ, এটা কার্লের ঘর—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাঠবিড়ালীর খাঁচা আর পায়খানার সমন্বয়। টেবিলের ওপর টাইপ-রাইটার, খোলা ডিকশনারীটা পড়ে আছে সোনালি নকশা করে বাঁধানো 'ফাউস্ট'-এর ওপর। টোবাকো-পাউচটা সর্বক্ষন

তো আছেই। একটা টুপি, এক বোতল ভিঁ রুজ, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, পুরোনো খবরের কাগজ, জল-রং, টি পট, ময়লা মোজা, কনডম—ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোট টেবিলের ওপর অরেঞ্জ-পিল আর স্যাণ্ডউইচের ভুক্তাবশেষ।

: ওখানে কিছু খাবার আছে।—কার্ল বললো—বের করে খেতে হবে বাপু—খেয়ে নাও। আমি এই মাত্র একটা ইন-জেকশন নিচ্ছিলাম।

: গ্যেটে সম্পর্কে লেখা তোমার চিঠিটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো।—নোংরা মোজা দিয়ে নুনু মুছতে মুছতে কার্ল বললো।—আমি আমার বইয়ে ব্যাপারটা উল্লেখ করবো। তোমাকে নিয়ে ঝামেলা এই যে তুমি জার্মান নও। গ্যেটে বুঝতে চাইলে তোমাকে জার্মান হতে হবে।···যাই হোক, আমি একটা নতুন মাগি পেয়েছি। এর আগে যে মেয়েটা পেয়েছিলাম, সেটি ছিলো দারুন। জানি না, সে আর আমার কাছে কখনো ফিরে আসবে কিনা। তুমি যখন বাইরে ছিলে —সে তখন আমার সঙ্গেই। আমার সঙ্গেই থাকতো, ওর মা বাবা এসে ধরে নিয়ে গেলো। আমাকে তো পারলে গিলে খায়। ওদের মতে মেয়েটার বয়েস নাকি মাত্র পনেরো। বোঝো তাহলে আমার অবস্থাটা।···

আমি কার্লের কথায় হেসে উঠতেই সে বললো, 'আরে মিয়া, তুমি হাসছো। আমার জেল হয়ে যেতে পারতো নাবালিকা ফুসলে এনে যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অপরাধে। ভাগ্যিস

পেট বাঁধিয়ে ফেলিনি মেয়েটার। বলো তো, কে বাঁচালো আমাকে? ওই 'ফাউস্ট'। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বইখানাই। বুড়ো বইটা দেখেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি জার্মান জানি কি না। তা ছাড়া টেবিলের ওপর শেক্সপীয়ারও খোলা অবস্থায় পড়েছিলো। ওই দেখেই বুড়ো মজে গেলো। ভাবলো, ছেলেটা তাহলে যাচ্ছেতাই একটা কিছু নয়।'

: মেয়েটির তখন কি দশা। সে কি করলো?

: সে তো ভয়ে হার্টফেল করে আর কি। ওর হাতে এখানে আসার সময় একটা ঘড়ি ছিলো। ওর মা সেই ঘড়িটা না-দেখে সে কি তম্বি। বললো, মেয়ের ঘড়িটা কি করলে? ঘড়ি না-পেলে কিন্তু পুলিশে খবর দেবো। আমি সারাটা ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় সেই ঘড়ি। মা-টা তো রেগে আগুন। তবে হ্যাঁ, মহিলাটি দারুন সুন্দরী। মেয়েটার চেয়েও। মহিলার কাছে যে চিঠিখানা আমি লিখতে শুরু করেছিলাম—তা দেখাবো তোমাকে। আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি।

: মায়ের সঙ্গে?

: নিশ্চয়ই। কেন পড়বো না? আগে যদি আমি এই মা-টাকে দেখতাম, মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাতাম না। আমি কী করে জানবো যে মেয়েটার বয়েস মোটে পনেরো? তুমি যখন কাউকে লাগাও, তখন নিশ্চয়ই তার বয়েস জিজ্ঞেস করো না। করো কি?

: জো, গুলতাপ্পি মারছো না তো? আমার সন্দেহ হচ্ছে।
: আমি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো? এই যে দ্যাখো—বলতে বলতে সে একটা ছবি তুলে নিলো হাতে। জল-রঙে আঁকা একটা কাঁচা ছবি। বললো—মেয়েটা এঁকেছে! সে সত্যি আমাকে ভালোবেসেছিলো। একেবারে বাচ্চা মেয়ে, বুঝলে? দাঁত মাজা আর টুপি পরার কথা ওকে মনে করিয়ে দিতে হতো। এই যে—দ্যাখো এই ললিপপ-গুলো। রোজ রোজ তাকে কিনে দিতে হতো এই কাঠি-লজেন্স! খুব ভালোবাসতো সে।
: তারপর কি হলো?
: কী আর হবে। মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেলো। ও একটু কাঁদলো—ব্যাস এই মাত্র। আরে, একেবারে পুঁচকে মেয়ে তো। ...আমাকে ওর বাবা-মার কাছে শপথ করতে হলো, কখনো আর ওর সঙ্গে দেখা করবো না—চিঠিও লিখবো না।
এমন সময় বিছানায় শুয়ে থাকা মেয়েটি উঠে বসে চোখ কচ-লাতে লাগলো। এ-মেয়েটিও খুব কম বয়েসী। দেখতেও খারাপ নয়। কিন্তু বদ্ধ কালা। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি বলাবলি করছো গো?'
'সে এই হোটেলেই—চার তলায় থাকে।' কার্ল জিজ্ঞেস করলো, আমি একে এনজয় করতে চাই কিনা। সে ব্যবস্থা করে দেবে। কি জবাব দেবো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু কার্ল আবার যখন মেয়েটিকে ডলাই মলাই করতে শুরু করলো,

আমি আমার সম্মতির কথা জানিয়ে দিলাম ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটি খুব ক্লান্ত কি না। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। একটা বেশ্যা দু'পা ফাঁক করবার বেলায় কখ্খনো ক্লান্ত হয় না। অনেকে ঘুমের মধ্যেও শট্ নিতে অভ্যস্ত। যাই হোক, কথা-বার্তা ঠিক করে ওর রুমেই চলে গেলাম। পয়সাটা কাল আগেই মিটিয়ে দিয়েছি। সারা রাত ওর সঙ্গেই কাটাবো আজ।

পরদিন সকালে ফিলমোরের খবর পেয়েই চমকে উঠলাম আমি। সে নাকি হাসপাতালে আছে। যৌন-ব্যাধিতে ভুগছে সে এখন! মারাত্মক অসুখ। বুঝতে পারলাম, দাইজোঁতে আমি যখন দুঃস্বপ্নের রাত কাটাচ্ছি, ফিলমোর ঠিক সেই সময়েই বাঁধিয়ে বসেছে অমন কালান্তক ব্যাধি। ভ্যান নর্ডেনের কাছে খবর পেয়েই আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম।

আমি যখন হাসপাতালে পৌঁছলাম, ফিলমোর তখন গোসল সেরে বেরিয়েছে। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললো। বললো, 'সব শেষ হয়ে গেছে। ওরা বলছে, আমার মাথা নষ্ট হয়েছে! সিফিলিসও থাকতে পারে।' সে বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর ম্লান হাসলো ফিলমোর। বললো, 'ওরা আমাকে এতো ব্যয়বহুল রুমে রেখেছে কেন, বলো তো? আমাকে সাধারণ ওয়ার্ডে সরিয়ে নিলেই তো হতো? আমি যে আর খরচ কুলোতে পারছি না? আমার গাঁটে আর মাত্র পাঁচশো ডলার আছে!'

: সেজন্যই তোমাকে ওরা এখানে এনে রেখেছে।—আমি বললাম—ওই টাকাটা ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তোমাকে স্থানান্তর করবে। চিন্তার কিছু নেই!

আমার কথায় সে প্রভাবিত হয়েছে বলেই মনে হলো। আর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতঘড়ি, চেন, মানিব্যাগ ইত্যাদি তুলে দিলো আমার হাতে।—'এগুলো তোমার কাছে রাখো। বেজন্মারা আমার সব কিছু লুটে নেবে!' বলেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো ফিলমোর। সেই হাসিতে আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। তাহলে কি সত্যি—?

: জানি, তুমি আমাকে পাগল ঠাওরে বসে আছো। কিন্তু আসলে এ ভুল ধারণা। শোনো, আমি বিয়ে করতে চাই। বিশ্বাস করো, আমার অসুখের ব্যাপারটা আমি জানতাম না। তাই মেয়েমানুষটাকেও আমি দিয়ে ফেলেছি এই ব্যারামটা। আমি থোড়াই পরোয়া করি ওসব অসুখ-বিসুখের। মোদ্দা কথা, আমি তাকে বিয়ে করবোই—। সে অবশ্য বলেই চলেছে, আগে ভালো হয়ে নাও। আমি কি আর জানি না, আমার ভালো হওয়া শেষ। সবই শেষ?

ওর কথা শুনে আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। কী হয়েছে ফিলমোরের? কী ঘটেছে তার জীবনে! যাই হোক, আমি ওকে কথা দিলাম, মেয়েটির সঙ্গে আমি দেখা করবো এবং ওর সব কথাই তাকে খুলে বলবো। সে আরো

বললো, 'ওকে একটু দেখে রেখো। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?' আমি ওর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে সব কথাতেই সায় দিলাম। তাকে কিন্তু আমার কাছে ঠিক পাগল বলে মনে হলো না। পুরো ব্যাপারটা আঁচ করবার উদ্দেশ্যে আমি মনে মনে স্থির করলাম, মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

পরদিনই গেলাম মেয়েটির বাসায়। ল্যাটিন কোয়ার্টারে থাকে সে। আমার পরিচয় দিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। নাম তার জিনেট। বেশ বড়সড় আকার। সামনের একটা দাঁতের আধখানা ভাঙা। অনেকটা কিষানীদের মতো দেখতে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। চোখ দুটিতে রয়েছে যেন একটা চাপা আগুন। প্রথমে সে খানিকটা কাঁদলো। তারপর নিচে গিয়ে নিয়ে এলো ক'বোতল শাদা ওয়াইন। আমাকে রাতের খাবার খেয়ে ওখানেই থেকে যেতে হলো। কারণ তার হাত থেকে কিছুতেই ছাড়া পাওয়া গেলো না।

মদ টেনেছিলো সে অনেকখানি। তাই কোনো কথাই তাকে আমার জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না। গড়গড়িয়ে বলে গেলো নিজেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে ফিলমোর তার চাকরিটা ফিরে পাবে কিনা—এই দুশ্চিন্তায়ই জিনেট পাগল হয়ে উঠেছে। জানা গেলো, মেয়েটির মা বাবা থাকে অনেক দূরে; কিন্তু তারা মেয়ের ওপর রেগে গেছে। এ-বিয়েতে নাকি তাদের মত নেই। কেননা, ছেলে একে

তো আমেরিকান, তার ওপর ভদ্রতা জানে না। জিনেট আমার কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে চাইলো, ফিলমোর চাকরিটা ফিরে পাবে কি না। আমি বললাম, পাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বললো, 'তুমি আমাকে সত্যি করে বলো তো, ও আমাকে বিয়ে করবার ব্যাপারে কী বলেছে? জানো, ও তো আমাকে রোগের অংশীদার করেছেই; উপরন্তু ওর বাচ্চা আমার পেটে। এখন ও যদি আমাকে বিয়ে না করে, তবে আমার জীবনটাই বরবাদ। কোনো ফরাসী আর আমাকে বিয়ে করবে না। কি? ঠিক বলিনি?'

: সে আর বলতে!—আমি জবাব দিলাম। ততোক্ষনে সব-কিছুই আমার বোঝা হয়ে গেছে। অবশ্য একটা ব্যাপার বাদে। ফিলমোর এই মেয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়লো কীভাবে —আমার তো মাথায়ই আসে না। আর একটা সন্দেহ। সে কি সত্যি সত্যি সন্তান-সম্ভবা? নাকি চাল।

আমি যখন জিনেটের দেখাশোনা করছি তখন, ফিলমোরকে হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পল্লি চিকিৎসা কেন্দ্রে। কারণ ওর টাকাকড়ি শেষ। খবরটা জিনেটই এসে জানালো আমাকে। শুনলাম, হাতুড়েরা ফিলমোরের সবগুলো দাঁত উপড়ে ফেলেছে চিকিৎসার স্বার্থে। মাথার চুল পড়তে শুরু করেছে অবশ্য তার আপনাআপনিই। আশ্চর্য, তাকে অনেকটা সুস্থও নাকি মনে হয়। সে নাকি অবিলম্বে চিকিৎসা-কেন্দ্র

থেকে ছাড়া না পেলে সব উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। জিনেটকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তার পেটে বাচ্চাই থাক আর যাই থাক বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। এতে জিনেটের অবস্থা করুণ হয়ে দাঁড়ালেও, ডাক্তাররা বেশ আশান্বিত। তারা বলছে : এই পরিবর্তন তার সুস্থতারই লক্ষণ।

জিনেট অবশ্য মুষড়ে পড়েনি। তার ইচ্ছে, চিকিৎসা-কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেলেই ফিলমোরকে তাদের দেশের বাড়ি নিয়ে যাবে। সেখানকার উদার প্রকৃতি, নির্মল আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যোদ্ধারে সহায়ক হবে। খবর পেয়ে জিনেটের মা বাবাও এসে হাজির। ভাবী জামাতাকে দেখবার জন্যে তারা পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্রে যাবেন। তারা হয়তো বা ভেবেছেন, পাগল-ছাগল যাই হোক—মেয়েটা তো একটা বর পাচ্ছে! না হয় শ্বশুরের ফার্মেই জামাই যা হোক একটা কিছু করবে। শ্বশুর অবশ্য জানেন, ছোকরা মস্ত পরিবারের ছেলে। বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী!

দিন যায়। জিনেটরা দেশে গেছে। জিনেটের বান্ধবী ইভেটি কার্লের এখানে নিয়মিত আসে। তার ধারনা, কার্ল এই পত্রিকার সম্পাদক। একদিন খুব মদ টেনেছে সে। আর তাতেই তার দরজা টরজা সব খুলে গেলো। বললো—জিনেটের আদপেই পেট হয়নি। সে বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

: তাহলে ওর পেটটা এতো ভারী লাগে কেন?—জিজ্ঞাসা কার্লের। ইভেটি হেসে বললো, 'বোধ হয় সে বাইসিকেল-

পাম্প ব্যবহার করে।' একটু থেমে আবার সে বললো, 'আসলে এ-রকম হয়েছে মদ খায় বলে। যা ড্রিংক করে জিনেট! ওর অসুখটা হয়তো সত্য—কিন্তু ওসব গর্ভ-টর্ভ স্রেফ ধাপ্পা।'

: তাহলে সে ফিলমোরকে বিয়ে করতে চায় কেন? সে কি সত্যি ওকে ভালোবাসে?

: ভালোবাসে? ফুঃ! ওর আত্মা বলে কিছু আছে? ও চায় ওর পাশে কেউ একজন থাকুক। কোনো ফরাসী ওকে কোনো-দিন বিয়ে করবে না। কেননা ওর নামে পুলিশ-রেকর্ড আছে। ওর মা বাবাও ওকে ঘেন্না করে। যেই শুনেছে, ছোকরা ধনী-আমেরিকান, ব্যাস—অমনি সাত খুন মাফ। তোমরা ভেবেছো, সে ফিলমোরকে ভালোবাসে। ছাই ভালোবাসে। দু'জন যখন হোটেলে থাকতো—জিনেট অন্য লোকের সঙ্গে কতো শুয়েছে। ফিলমোর বাইরে গেলেই ওর রুমে লোক আসতে শুরু করতো। বলতো, ফিলমোর কঞ্জুস—ওকে একটা পয়সাও দেয় না। ফার কোটটা নাকি ওর বাবা কিনে দিয়েছে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি নিজের চোখে দেখেছি—ওর কাছে লোক এসেছে। একদিন দেখি, একটা বুড়ো এসেছে।—ওর তো নুনুই খাড়া হবে না।

এসব কথা আমি ফিলমোরকে এক্ষুনি জানাতে পারছি না এ-জন্যে যে—এতে ওর ক্ষতি হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়ে সে যখন প্যারিসে ফিরবে, খবরটা জানানো যায় কেবল তখনই। কিন্তু আমার সমস্ত সতর্কতাকে কাঁচকলা দেখিয়ে

ফিলমোর চলে গেলো জিনেটদের গাঁয়ের বাড়ি।

বেশ কিছুদিন পর জিনেটকে নিয়ে প্যারিস ফিরলো ফিলমোর। তার শরীর এখন অনেক সুস্থ। পকেট ভর্তি টাকা। পরনে নতুন পোশাক। তার চাকরি চলে গেছে। নিজের টাকা পয়সাও শেষ। এখন যা কিছু দরকার, দিচ্ছেন জিনেটের বাবা ওদের বিয়ে হয়ে যাবে শিগগীরই। শ্বশুরের ইচ্ছে, জামাইকে একটা স্টেশনারী দোকনে করে দেবেন। বেচাকেনা করবে জিনেটই। দোকানের পেছনে ছোট্ট কুঠরিতে বসে ফিলমোর লিখবে বা অন্য কিছু করবে। কিন্তু ফিলমোর এ-কথা শুনতেই পারে না। ভাবা যায়—ফিলমোর তার সারাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে একটা মনোহারী দোকানের পেছনে বসে বসে? তার চেয়ে যে সেই পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রই তার জন্যে ভালো ছিলো!

আমি তাকে বুদ্ধি দিলাম দেশে চলে যেতে। কিন্তু সে আমেরিকায় ফিরে যেতে রাজী নয়। সে বরং শহরের কোনো নিভৃত এলাকায় বাসা নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারলো, এটা অসম্ভব। আমেরিকার মতো ফরাসী দেশে লুকিয়ে থাকা যায় না কখনো।

: কিছুদিনের জন্যে বেলজিয়াম গেলে পারো!—আমি বললাম।

: কিন্তু করবো কি সেখানে গিয়ে? ওসব দেশে কি চাকরি বাকরি মেলে!—তার তৃরিৎ জবাব।

: তুমি ওকে বিয়ে করেই আবার সঙ্গে সঙ্গে তালাক দিয়ে দাও।
: আর এর মধ্যে যদি বাচ্চাটা হয়েই যায়? কে দেখবে ওটাকে?
: তুমি কি করে বুঝলে, ওর পেটে বাচ্চা আছে?—আমি জিজ্ঞেস করি।
: মানে?
আমি তখন ইভেটির কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত খবর শুনিয়ে দিলাম ফিলমোরকে। কিন্তু ফিলমোরও আমাকে চমক দিলো কম নয়। জানা গেলো, ওকে নিয়ে জিনেট আর ইভেটি কম কাড়াকাড়ি করেনি। শেষে সে যখন জিনেটকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিলো, ইভেটি ক্ষেপে আছে তখন থেকেই। হিংসায় জ্বলে পুড়ে সে এখন গড়ে তুলেছে এক কলা-কাহিনী। ফিলমোর বললো, 'ওরা দু'জন আমার দু'টি অণ্ডকোষ চেপে ধরে বসে আছে। আমার আর উপায় নেই।'
আমরা এই হোটেলে থাকি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি ওদের সঙ্গে খাই। খাবার সময় দু'জনের মধ্যে চলে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি। আমার তো ত্রিশঙ্ক অবস্থা যাকে বলে। আমি কখনো এ-পক্ষ নিই—কখনো আরেক পক্ষ। এই ঝগড়া এক-দিন প্রকাশ্য রাজপথে এমন বীভৎস আকার নিলো যা ভাবতে গেলেও হৃদকম্প হয়। কিন্তু সে এক বিরাট কাহিনী।

একদিন শুনলাম, আমেরিকা থেকে টাকা পাঠিয়েছেন ফিলমোরের মা। ফিলমোর একাই যাচ্ছিলো ব্যাংকে। কেননা জিনেট যেন কোথায় গেছে কি কাজে। আমি কথাটা শুনতেই একটা বুদ্ধি এঁটে ফেললাম। ভাবলাম, ফিলমোরের পালাবার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে। কথায় কথায় জানা গেলো, ফিলমোরকে আধঘণ্টা সময় দিয়েছে জিনেট। এর মধ্যে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে তার হোটেলে ফিরতে হবে। ফিলমোর আর আমি রু দে রিভোলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। চমৎকার ঝকমকে দিন। শুকনো আরামদায়ক আবহাওয়া। নির্মেঘ আকাশ। মৃদু বাতাস বইছিলো। ফিলমোরের মাথায় টুপি নেই। দেখতে সেই গড়পরতা আমেরিকান পর্যটকদের মতোই। স্বাস্থ্যবান। পকেটভর্তি টাকা।

: আমার মাথার কিছুই আসছে না।—ফিলমোর বললো—তুমি বলো কি করবো এখন আমি। আমাকে বুদ্ধি দাও। আমি বড়ো অসহায়। আমার হাতে সময় একদম নেই। তোর ফ্রান্সের নিকুচি করেছে। এর নাম ফরাসী দেশ—থুঃ। বইয়ের পাতায় ফ্রান্স আর বাস্তবের ফ্রান্সের কতো না তফাৎ। আমি এদের হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছি। বুঝলে। ওপর থেকে যেমন সুন্দর, ভেতরে তেমনি কদাকায়। এদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই। নেই বন্ধুত্বের মনোভাব। কেবল স্বার্থ আর স্বার্থ। পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বার্থপর এই ফরাসীরা। এরা টাকা ছাড়া আর কোনো কিছুর কথাই চিন্তা করে না। আমি এদের

ঘেন্না করি। এমন নিষ্কর্মা জাত আর কোথায় আছে! ভাবতে পারো, সব লোক সারাদিন বসে আছে কাফেতে। বসে বসে অবিশ্রান্ত আড্ডা মারছে। ভাবা যায়? আমি হচ্ছি আমেরিকান। বসে থাকা আমার ধাতে নেই। একটা লোক কি রাতারাতি ইউরোপীয় হয়ে যেতে পারে? অবশ্য তোমার কথা আলাদা। তুমি কিছুটা ব্যতিক্রমী আমেরিকান। আসলে এখানকার আবহাওয়াটাই এ-রকম। ওহ—অসহ্য!'

পথে অবিরাম বকবক করলো ফিলমোর। আমি একটা কথাও বলিনি। ভাবছিলাম, বলুক, ও-ই বলুক। বুকের ভার একটু হালকা করুক। ভাবছিলাম, বছরখানেক আগেও ফ্রান্স ছিলো ওর কাছে স্বপ্নের দেশ। বলতো, দুনিয়ার দেশের মধ্যে দেশ আছে তো এই একটাই। তখন কেউ ফ্রান্সের সমালোচনা করলে, ফিলমোর তার দিকে ঘুষি উঁচিয়ে তেড়ে যেতো। সেই মানুষের আজ কতো পরিবর্তন!

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেও ফিলমোর আর আমি একটা রেস্তোরাঁয় গলা ভেজাতে বসেছিলাম। ফিলমোর আমার দিকে যেন কী রকম একটা দৃষ্টি নিয়ে বারবার তাকাচ্ছিলো। হয়তো ভাবছিলো, তার সামনে বসে আছে তার জীবনের সর্বশেষ বন্ধু। আমি হঠাৎ বললাম, 'শোনো ফিলমোর! বলো তো তোমার মনের কথা কি? আসলে তুমি কী করতে চাও!'

ফিলমোর অশ্রু-সজল চোখ মেলে, ধরা গলায় বললো: আমি

আমার নিজের দেশে, নিজের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। ওহ, কতোদিন হয়ে গেলো, ইংরেজি কথাবার্তা কানে আসে না!—ওর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ওর কান্না দেখে আমার মনে হলো, এতো দিনে বুঝি বাঁধ ভেঙে গেছে। জীবনে একটিবারও যদি কেউ এ-রকম কাপুরুষ হয়ে পড়ে—তা-ও কতো সুন্দর! চমৎকার! চমৎকার! ওকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে আমার মনে হলো, আমি যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারি এখন।

: আমি এ-অবস্থায় এক্ষুনি দেশের পথে রওনা হতাম। মানে, আমি যদি তুমি হতাম। এমন কি কাউকে বিদায় জানাবারও দরকার মনে করতাম না!—আমি বললাম।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেবার সময় ফিলমোরকে খুবই সাহসী, খুবই প্রত্যয়ী মনে হচ্ছে। বেশ বেপরোয়াও। যেন সে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। সাঁতরে পাড়ি দিচ্ছে সে অথৈ দরিয়া।

: তোমার ব্যাংকে কতো টাকা আছে?—আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ টাকা কি তোমার, না ওই বুড়োর!

: এ টাকা আমার।—ফিলমোর বললো—আমার মা পাঠিয়েছে। আমি অন্যের টাকার ধার ধারি না!

: তাহলে আর ঝামেলা কিসের?—আমি ওকে বোঝাতে শুরু করলাম—একটা ক্যাব ভাড়া করে সোজা যাওয়া যাক ব্যাংকে। অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নাও। তারপর ব্রিটিশ

হাই-কমিশনে গিয়ে ভিসা যোগাড় করতে হবে। তারপর ট্রেনে চেপে সোজা লণ্ডন। সেখানে পৌঁছেই তোমাকে চাপতে হবে আমেরিকাগামী পয়লা জাহাজটিতে। এতে একটা সুবিধে হবে এই, কেউ তোমাকে অনুসরণ করতে পারছে না। খাণ্ডারনী মেয়েটা স্বপ্নেও ধারনা করতে পারবে না যে তুমি লণ্ডন হয়ে দেশে ফিরছো। সে যদি তোমাকে খুঁজতেই ছোটে তো হয় যাবে লে-হার্ভে অথবা শেরবুর্গে। এখন আর একটা কথা এই যে, তুমি আর আদপেই ফিরছো না তোমার আস্তানায়। তল্পিতল্পা যা আছে, সব ছেড়ে ছুঁড়েই যেতে হচ্ছে তোমাকে, বুঝলে? মাগিটাই সে-সব নিয়ে নিক। সে ভাবতেও পারবে না, বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ বলেই সে ভাবতে পারবে না, সবকিছু অমন করে ফেলে তুমি লম্বা দেবে!

: তুমি ঠিকই বলেছো!—ফিলমোর উল্লসিত হয়ে বললো—আমার মাথায় তো এটা আসেনি! তবে তাই হোক! বলতে বলতে সে তার মানিব্যাগটা তুলে দিলো আমার হাতে। বললো, 'যা যা করতে হবে, তুমি করো। আমি খুব ক্লান্ত!'

মানিব্যাগ ঝেড়েঝুড়ে টাকা পয়সা যা ছিলো, আমি নিয়ে নিলাম। তারপর আমরা চেপে বসলাম একটা ক্যাবে। চারটে নাগাদ একটা ট্রেন ছাড়বে গেয়ার দ্যুনর্দ থেকে। আমি মনে মনে হিশেব করলাম—ব্যাংক, কনস্যুলেট, আমেরিকান-এক্সপ্রেস, স্টেশন। চমৎকার!

আমি বললাম, 'ব্যাস, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তুমি পাড়ি দিচ্ছো ইংলিশ চ্যানেল। রাত্তিরেই তুমি হাঁটছো লণ্ডনের রাস্তায়। ইংরেজী বুকনি শুনতে শুনতে তোমার কান পচে যাবে। আর আগামীকাল? হ্যাঁ, আগামীকালই দিগন্তহীন মহাসাগরে তুমি ভাসছো আর ভাসছো। আর তারপর তুমি মুক্ত! নিউ-ইয়র্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজকের ঘটনাকে তোমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হবে কেবল!'

আমার কথায় সে এতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো, যে তার পা কাঁপছিলো রীতিমতো। মনে হচ্ছিলো ক্যাব থেকে লাফিয়ে পড়ে সে আরো দ্রুত ছুটে যাবে। ব্যাংকে পৌঁছে ওর হাত এতো কাঁপছিলো যে চেকে সই করতে অসুবিধে হলো। সম্ভব হতো, যদি চেকটাও সই করে দিতাম আমিই। কিন্তু তা তো চলবে না।

লাঞ্চ-আওয়ারের মুখে এসে ব্রিটিশ কনস্যুলেটে পৌঁছলাম আমরা। কিন্তু সবাই লাঞ্চে গেছে। তার মানে, দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। আমি চিন্তা করলাম, সময় নষ্ট না করে ফিলমোরকে পেট ভরে চারটে খাইয়ে দিই কোনো রেস্তোরাঁয়। দীর্ঘ সময় তো সে কিছুই খাবার সুযোগ পাবে না। যা ভাবা, সেই মতো কাজ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে বড়সড় খাবারের অর্ডার দিলাম। টেবিলে দিতে বললাম সবচেয়ে দামী মদ। ভাবনা কি? সব টাকা তো আমার পকেটেই। টাকার মালিক যেই হোক না কেন! তা প্রায় একশো ফ্রাঁর

ধাক্কা। নোটটা আলোর উল্টোদিকে ধরে জলছাপটা দেখলাম। ঝকঝকে জলছাপ। চমৎকার টাকা। ফরাসীর যে সব জিনিষ খুব রাজকীয়ভাবে বানায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই টাকা। শিল্পকুশলতা দিয়ে তৈরী। কী সৌন্দর্য, কী নৈপুন্য! চোখ জুড়িয়ে যায়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমরা গেলাম একটা কাফেতে। কেন যাবো না। কফি খেলাম দামী স্ন্যাকস সহযোগে। এখানে আমি ভাঙালাম একটা পাঁচশো ফ্রাঁর নোট। চক-চকে নতুন নোট। আমিই প্রথম ব্যবহার করছি। এ রকম টাকা নাড়াচাড়া করাও সুখ। কিন্তু ওয়েটার ওই টাকার যে ভাংতিগুলো ফেরৎ নিয়ে এলো, তা যেমন নোংরা, তেমনি কদাকার। পাঁচ আর দশ ফ্রাঁর নোটের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দুটি বাণ্ডিল। আর এক গাদা খুচরো। আমার পকেট যেন ছিঁড়ে পড়ে যাবে। যদি সত্যি সত্যি ছিঁড়ে যায়, তাহলে একটা কেলেঙ্কারী হবে না? জনসমক্ষে?

আমেরিকান এক্সপ্রেসে পৌঁছে দেখি, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ফটাফট চেক বই বের করে দিলো। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে চেকের ভুল জায়গায় স্বাক্ষর দিয়েছে ফিলমোর। আবার নতুন চেক নতুনভাবে সই দিতে হলো তাকে। আমার চোখ তখন ঘড়ির দিকে। সময় এক-দম নেই। এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে ব্যাংক। আমি তাড়াতাড়ি টাকাগুলো জমা দিয়ে দিলাম। কিন্তু টাকাগুলো জমা দেবার

পরও আমার পকেটে থেকে গেলো প্রায় আড়াই হাজার ফ্রাঁ। সত্যি বলতে কি, এখন আমি এক ফ্রাঁ, দুই ফ্রাঁ গুনছিই না। আমি গুনছি একশো দুশো পাঁচশো ফ্রাঁ। কতো টাকা তার ব্যাংকে ছিলো, ফিলমোর তা জানেই না। যেটা সে জানে, তা হলো জিনেটের জন্যে সে কতো টাকা রেখে যাবে ; সে সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তও নেই।

কিন্তু তাড়াহুড়োয় একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি আমরা। সব টাকা বদলে নেয়া হয়নি। ক্যাবে চড়ে বসেছি আমরা। আমাদের হাতে আর সময়ও নেই। ব্যাংক তো বন্ধ হয়েই গেছে। কী আর করা? খুচরো পয়সাগুলো গাড়ির জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ব্রিটিশ আর আমেরিকান টাকা রইলো ফিলমোরের পকেটে। আমার কাছে রইলো ফরাসী টাকাগুলো।

জিনেট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত। তাকে কতো টাকা দিতে হবে, কী বলতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর প্যাঁচালে আমার মাথা ধরে যাবার উপক্রম।

: তাকে কি বলতে হবে, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।—আমি বললাম—সব আমার ওপর ছেড়ে দাও তো! তা, ওকে কতো টাকা দিতে হবে? কেনই বা দিতে হবে?

যেন ওর পাছার নিচে বোমা ফাটলো এবার। কান্নায় ভেঙে পড়লো ফিলমোর। সে কি কান্না! যেন এক্ষনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে বাবা, ঠিক

আছে। ফরাসী যা আছে, তার সবটাই ওকে দিয়ে দেয়া যাবে না হয়। তাতে ওর বেশ কিছু দিন দিব্যি চলে যাবে।'

: কতো টাকা হবে ওখানে?—সে জিজ্ঞেস করলো।

: আমি জানি না—বোধহয় আড়াই হাজার ফ্রাঁ হবে। তার জন্যে অনেক।—আমি জবাব দিলাম।

: কী যে বলো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ওকে কী অসহায় অবস্থায় আমি ফেলে রেখে যাচ্ছি। এখন তো ওর বাবা মা-ও আর ওকে ঘরে ঠাঁই দেবে না। টাকাটা দিয়ে দিও। আমার জিনিসপত্র যা রইলো তা-ও সব দিয়ে দিও ওকে।—ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফিলমোর বললো। তারপর চোখ মুছতে মুছতে আবার বললো, 'মনে হচ্ছে ফিরে যাই। গিয়ে সামনে দাঁড়াই ওর। যদি কোনো অঘটন ওর ঘটে যায়—আমি নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবো না।'

আমরা যখন স্টেশনে এসে পৌছলাম, তখন ট্রেন ছাড়তে মাত্র বারো মিনিট বাকি। ওকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েও আমার দুশ্চিন্তা। যদি লাফিয়ে পড়ে? যাই হোক, গাড়ি ছাড়ার আগ পর্যন্ত আমি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে এলাম না।

জিনেটের কাছে দু'ছত্রের একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলো ফিলমোর। ল্যাম্প পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা পড়লাম আমি। তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। একটা ক্যাব দাঁড়িয়ে ছিলো রাস্তার একপাশে। উঠে বসলাম। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'

: যেখানে তোমার খুশি।—আমি জবাব দিলাম।—যেদিকে ইচ্ছে চালাও—আমার তাড়া নেই।

রঁদ পয়েঁতের কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সিটাকে অপেক্ষা করতে বলে আমি নেমে গেলাম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই আমার নজরে পড়লো না। ভেবেছিলাম টাট্‌কা একটা মেয়েকে কায়দা করবো। সে হতে পারে আলাস্কার কিংবা ভার্জিন আইল্যাণ্ডের। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এখানে ও-রকম কোনো কুমারীকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো আমার। পরক্ষনে মনকে সান্তনা দিলাম। আরে, অধৈর্য হবার কি আছে? সময় এলেই সব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে।

ক্যাব এসে থামলো আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফের কাছে। অচেনা সৈন্যদের মূর্তিগুলোকে দেখছে পর্যটকরা। বোঁয়া বরাবর এগিয়ে যাবার সময় দেখলাম, ধনী মহিলারা বসে আছে তাদের দামী দামী লিমুজিনের মধ্যে। মনে হয়, তারা যেন কোন মহাগন্তব্যের দিকে যাত্রা করেছে। আসলে কোথায় যাবে আর! বেরিয়েছে নিজেদের মহার্ঘ গাড়ি—নিজেদের ঐশ্বর্যের অহঙ্কার দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগাবার জন্যে। লিমুজিন ছাড়াও রাস্তায় ভীড় করে আছে কতো রোল্‌স রয়েস আর হিসপানো-সুইজে।

বীয়ার গার্ডেনে বসে গল্প করছে একদল সাইকেলচালক। আমি গাড়ি থেকে নেমে সেখানে গিয়ে একটা দেমির অর্ডার

দিলাম। জিনেটের কথা মনে হলো। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ফিলমোরকে তার গরুখোঁজা করার দৃশ্য। ভাবছি ফিলমোরের কথাও। সে এতক্ষনে বহু দুর চলে গেছে। সে শুনতে চায় ইংরেজি। ইংরেজী জবান। কী আইডিয়া!

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমিও তো আমেরিকায় চলে যেতে পারি। সে সুযোগ এসে গেছে। আমার পকেটে অনেক টাকা জাহাজ ভাড়া দিব্যি হয়ে যাবে। নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে বৎস্য—তুমি কি যাইবে?' কিন্তু কোনো উত্তর নেই। আমার মন চলে গেছে অনেক অনেক দূরে। স্কাইস্ক্র্যাপার-গুলো ঢাকা পড়েছে তুষারে। হার্লেম থেকে ব্যাটারি পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ছেয়ে গেছে বিষ-পিঁপড়েয়। এলিভেটরে মানুষের ধাক্কাধাক্কি। নাট্যশালাগুলো দ্রুত হয়ে পড়ছে জনশূন্য। মনে প্রশ্ন জাগলো, এ-অবস্থায় আমার স্ত্রী কোথায়, কী করছে?

চমক ভাঙতেই এক অনাস্বাদিত প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো আমার মন। সীন নদী বয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এতো ধীরে যে তার অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে ঠিকই বয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে। যেমন মানব-দেহের ধমনী। আমি যদি এখন কোনো উঁচু পাহাড়ের ওপর উঠে দেখতে পারতাম, তাহলে হয়তো এই অপরূপ নিসর্গের মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারতাম।

মানুষে মানুষে নির্মিত হয়েছে এক বিচিত্র আরণ্যক পৃথিবী।

দূর থেকে যাকে মনে হয় সুষমাময়। কিন্তু নিকটবর্তি হলেই তার কুৎসিত রূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ে। সে চায় তার চার-পাশে বজায় থাকুক শূন্যতা। সময় নয়—শূন্যতাই তার অন্বিষ্ট।

সূর্য ডুবছে। মনে হয়, নদীটা বয়ে চলেছে আমার ভিতর দিয়েই। আমিই যেন ধারণ করছি এ নদীর প্রাচীন মৃত্তিকা, এর অতীত—এর নিত্য-পরিবর্তনশীল আবহাওয়া। কিন্তু এ-নদীর গতিপথ সুনির্দিষ্ট। পাহাড়গুলো নম্রভাবে একে বেষ্টন করে আছে।

———